গান্ধীজীর দৃষ্টিতে

# বাংলা ও বাঙালী

সংকলন ও অনুবাদ

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ
মহাজাতি সদন
কলিকাতা ৭

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৬

তিন টাকা

গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে
মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও বিদ্যুৎ প্রিণ্টিং প্রেস ১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে
এস. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

# ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি যে সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতাব্দী উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছেন গান্ধী-সাহিত্য প্রচার তার অন্যতম। গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনার প্রকাশ, গান্ধীজী নির্দেশিত বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত পুস্তিকা তথা গান্ধীজীর জীবনী প্রকাশ এই প্রচেষ্টার অন্তর্গত। এ ছাড়াও সমিতি কয়েকটি বিশেষ পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি অনুরূপ একটি পুস্তক।

মহাত্মা গান্ধীকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে অনেকেই অভিহিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী অনাগত কালের মানুষদের জন্য যে বাণী রেখে গেছেন এবং নিজ-জীবনে সত্য ও প্রেমের যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা অনুপম—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুত তিনি ছিলেন দেশ ও কালের উর্দ্ধে। সে জন্য সকলের প্রতিই ছিল তাঁর সমান ভালবাসা।

'গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী' পুস্তক বাংলা দেশ ও বাঙালীদের প্রতি তাঁর অনুভূতির প্রকাশ। বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে এবং বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসে গান্ধীজী বাংলা ও বাঙালীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর সে জন্য বিভিন্ন সময়ে বাঙালীর প্রতি তিনি অকপটে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। লেখক বহু পরিশ্রম করে বিভিন্ন স্থান থেকে সেগুলি সংগ্রহ করেছেন এবং সাবলীল ভাষায় সেগুলির বঙ্গানুবাদ করেছেন। এরূপ তথ্যবহুল পুস্তক বাংলা ভাষায় আর নেই। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে গবেষণামূলক পুস্তকের ক্ষেত্রে এটা প্রথম সংযোজন।

আমরা আশা করি যে, পুস্তকটি রচনার বেলায় যে অনুরাগ পরিস্ফুট হয়েছে অনুরূপ অনুরাগের সঙ্গে বাংলা দেশের বিদগ্ধ পাঠকসমাজ এটিকে গ্রহণ করবেন।

**শংকরপ্রসাদ মিত্র**

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৯ — চেয়ারম্যান, গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি
পশ্চিমবঙ্গ

# মুখবন্ধ

পৃথিবীতে এমন লোক মাঝে মাঝে জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা তাঁদের চিন্তার দ্বারা এবং সাধনার দ্বারা দেশ ও কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে নিজেদের সর্ব দেশের ও সর্ব কালের আসনে অধিষ্ঠিত করে দেন। আধুনিক কালে এমন একজন মানুষ হলেন গান্ধীজী। প্রথম জীবনে তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, পরে তা সম্প্রসারিত হয় ভারতবর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন তিনি ভারতীয়দের অপমানকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে অভিনব উপায়ে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তেমনি ভারতবর্ষে পরশাসন-মুক্তি আন্দোলনের সংগঠক ও নেতাও ছিলেন তিনি। আর এই মুক্তি-সংগ্রামে ভাঙনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে অনাগত স্বরাজের বুনিয়াদ রচনার উদ্দেশ্যে গঠন-কাজেরও পথ-নির্দেশ এবং পরিচালনা করেছিলেন তিনি।

এই উভয়বিধ কাজের জন্য ভারতবর্ষের বহু গণ্যমান্য এবং তেমনি সাধারণ মানুষের সংসর্গে তাঁকে আসতে হয়েছে, বহু খ্যাত ও অখ্যাত স্থানে তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়েছে। তাঁর এই পরিচিতির এবং ভ্রমণের জগৎ থেকে বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজ বাদ যায়নি—বরং তার ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং ব্যাপক।

বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে কখন প্রসঙ্গত, কখন বা সুনির্দিষ্টভাবে বহু সময় বহু কথা গান্ধীজী বলেছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল নিরপেক্ষ। বাংলা দেশে জন্মালে যে বাঙালীসুলভ জাত্যাভিমান থাকা স্বাভাবিক তা যেমন তাঁর ছিল না, তেমনি শুদ্ধ সত্যের অনুসন্ধানী হওয়ায় কোন রকম ক্ষুদ্রতা ও খণ্ডতাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই বাঙালীর বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি বাঙালীর ত্রুটিগুলিও তাঁর চোখ এড়ায়নি। বাঙালীর মহত্ত্ব যেমন তাঁকে আনন্দ দিয়েছে বাঙালীর দুর্বলতায় তেমনি তিনি দুঃখ পেয়েছেন। বস্তুত বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে গান্ধীজী যেসব কথা বলেছেন এবং লিখেছেন তারই সংকলন হল এই গ্রন্থ।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয় কয়েক বছর আগে এই জাতীয় একটি গ্রন্থ সংকলনের প্রস্তাব করেন। সেই সময় তাঁর নির্দেশমত এই বিষয়ে কিছু কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। কিন্তু নানান কারণে

তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এখন গান্ধী-শতবার্ষিকীর সময় পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতি এই জাতীয় একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। তার ফলে আবার নতুন করে কাজ করবার সুযোগ হয় এবং নতুন পরিকল্পনায় ও বহু নতুন তথ্য সন্নিবিষ্ট করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে গান্ধীজীর লিখিত কয়েকটি চিঠি এবং আমার লেখা দুটি প্রাসঙ্গিক রচনা যুক্ত করেছি। এই লেখা দুটি যথাক্রমে 'ভূদানযজ্ঞ' ও 'সবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল।

কয়েকটি চিঠি এবং সব কটি ফটো বাংলা দেশের গান্ধী সংগ্রহালয় থেকে পেয়েছি। সংগ্রহালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীবৃন্দ এর জন্য যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁদের আমার ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটি প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী-শতবার্ষিকী সমিতি বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজের প্রভূত উপকার করলেন বলে আমার বিশ্বাস। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

২রা অক্টোবর ১৯৬৯

২৭।এ, লালা লাজপৎ রায় সরণি

কলিকাতা ২০

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সূচী

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে

# বাংলা ও বাঙালী

আমার এমন সমালোচক আছেন যাঁরা আমার প্রত্যেক কথায় এবং কাজে ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। কখন কখন তাঁদের সমালোচনায় আমি লাভবান হয়েছি। কিন্তু আমার এমন বন্ধু থাকার সৌভাগ্যও হয়েছে যাঁদের আমার গুণাবলীর অভিভাবক বলে অভিহিত করা যায়। তাঁরা চান যে, আমি সম্পূর্ণ দোষশূন্য মানুষ হই, আর তাই যখন তাঁরা মনে করেন যে, আমি কোন ভুল করেছি অথবা কোন কথা বা কাজের দ্বারা ভুল করতে চলেছি তখন তাঁরা বিক্ষুব্ধ হন। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৮-২৫)

সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে আমার নামের আগে 'মহাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করা নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল তা আমাকে খুবই দুঃখ দিয়েছে। আমার নামের সঙ্গে 'মহাত্মা' আখ্যা প্রয়োগ করার জন্য যাঁরা বুদ্ধিভ্রংশবশত অনিচ্ছুক ভদ্রলোককে চিৎকার করে থামিয়ে দিয়েছিলেন অথবা তার জন্য তাঁকে অনুনয়-বিনয় করছিলেন তাঁরা আমার অথবা আমার উদ্দেশ্যের কোন রকম সেবা করেননি। তাঁরা অহিংসার উদ্দেশ্যের ক্ষতি করেছেন এবং আমাকে দুঃখ দিয়েছেন।……চাপে পড়ে উপাধিটি ব্যবহার না করে সম্মেলন থেকে চলে যাবার সাহস দেখিয়েছেন বলে ভদ্রলোককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার মতে, আমার অন্ধ ভক্তদের চেয়ে তিনি আমার আদর্শের যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন।……আমি যে পরিকল্পনা তুলে ধরেছি নিজেদের জীবনে তাকে প্রয়োগ করেই অথবা তার প্রতি বিশ্বাস না থাকলে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করেই বন্ধুরা আমার প্রতি তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাতে পারেন। (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১২-৬-২৪)

# প্রস্তাবনা

"আমি যদি গান শুনতে চাই তবে অবশ্যই আমাকে বাংলা দেশে যেতে হবে, যদি আমি কবিতা শুনতে চাই তাহলেও আমাকে যেতে হবে বাংলা দেশে। বাংলা দেশের মধ্যেই ভারতবর্ষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু বাংলা দেশকে ভারতের অন্যত্র পাওয়া যাবে না। আমি কয়েকটি মারোয়াড়ী ছেলেকে গান গাইতে শুনেছিলাম। অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলার মত শোনাচ্ছিল সেই গান। আমি তাদের বাঙালীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম।"[১]

উনিশশো সতের সালের শেষ দিনটিতে অখিল ভারত সমাজকর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তিন বছর পরে ইয়ং ইণ্ডিয়ায় তিনি লিখলেন, "গোপনতার পাপ হল ভারতবর্ষের অন্যতম অভিশাপ। অজানিত পরিণামের ভয়ে আমরা চুপিচুপি কথা বলে থাকি। এই গোপনতা বাংলা দেশের চেয়ে বেশি উৎপীড়ন কোথাও আমাকে করেনি। প্রত্যেকেই তোমার সঙ্গে 'গোপনে' কথা বলতে চায়। মুখ খোলার আগে তাদের কথা তৃতীয় ব্যক্তি আড়ি পেতে শুনছে কিনা তা দেখার জন্য যুবকদের চারদিকে তাকানোর দৃশ্যটি আমাকে গভীরতম দুঃখ দিয়েছে।"[২]

বাঙালীরা সঙ্কীর্ণমনা, তাই বাঙালীদের দ্বারা গঠিত দেশবন্ধুর স্মৃতি-মন্দিরও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে—এই সন্দেহ দূর করতে গিয়ে 'চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে'র ভিত্তি স্থাপনার বক্তৃতায় গান্ধীজী বললেন, "বাংলা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করে নিলে আমি কিছু মনে করব না। কেন না তাহলে উত্তর প্রদেশের বৃদ্ধ পণ্ডিতজী এবং গুজরাটের এই বৃদ্ধ বেনিয়াকে কিছু বিশ্রাম নেবার জন্য মুক্তি দেওয়া হবে। যে-বাংলা রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম দিয়েছে—যে-বাংলা চৈতন্যের পূত পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র যে-বাংলাকে পবিত্র করে দিয়েছে, সেই বাংলা যদি সারা ভারতকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে তবে আমি কিছুই মনে করব না।"[৩]

স্বাধীনতা যখন আসন্ন, দেশ-বিভাগের করাল ছায়া যখন ধীরে ধীরে নেমে আসছে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, ভ্রাতৃহত্যার রক্তে যখন মানুষের হাত রাঙা, দুর্গতদের আর্তনাদে বাংলা দেশের বাতাস যখন করুণ, উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী তখন নোয়াখালির অখ্যাত গ্রাম শ্রীরামপুরে। কয়েকজন সাংবাদিক গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একজন প্রশ্ন করলেন, বাংলা দেশকে কি রাজনীতির পাশা খেলায় বোড়ে রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে না? গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "না, বাংলা দেশ আজ পুরোভাগে, কেন না বাংলা যে বাংলাই। এ হল সেই বাংলা যা রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম দিয়েছে। এইখানেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরেরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন; আমার চোখে তাঁদের কাজ যতই ভুল পথে পরিচালিত মনে হোক না কেন, আপনাদের এটি বুঝে নিতে হবে। বাংলা দেশ যদি ঠিক পথে চলে তবে সারা ভারতের সমস্যার সমাধান সে করে দেবে। আর তাই আমি নিজেকে একজন বাঙালী করে দিয়েছি।"[৪]

নিজেকে এমনিভাবে বিলীন করে দেবার পিছনে গান্ধীজীর দীর্ঘ এবং কর্মবহুল জীবনের একটি ইতিহাস পড়ে রয়েছে। সেই ইতিহাস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতবর্ষের নব-জাগৃতির ইতিহাস। সেই ইতিহাসের প্রধান নায়ক হলেন গান্ধীজী।

'হুগলী নদীর সৌন্দর্যে' মুগ্ধ হয়ে আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলা দেশের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন গান্ধীজী। বাংলা দেশ এবং বাঙালী সমাজ তখন তাঁর কাছে অপরিচিত। ঐ দিন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জাহাজযোগে তিনি কলকাতার বন্দরে অবতরণ করেন এবং সেই দিনই রেলপথে যাত্রা করেন বোম্বাইয়ের পথে।

এবার ছয় মাসের ছুটি নিয়ে গান্ধীজী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সচেতন করে তোলা ছিল তাঁর দেশে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই কাজ করেছিলেন তিনি। বাংলা দেশের নেতাদের কাছেও তিনি এলেন সেই উদ্দেশ্যে। উঠলেন কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। পরিচয় হল 'বাংলা দেশের প্রতিমূর্তি' রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁকে কোন আশার কথা শোনালেন না। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় লোকেরা আপনার কাজে উৎসাহ দেখাবে না। দেখতেই পাচ্ছেন যে, এখানে আমাদের সমস্যাও এমন কিছু কম নয়। তবে যতটা পারেন চেষ্টা করুন।"৫

গান্ধীজী চেষ্টা করলেন। দেখা করলেন অনেকের সঙ্গে। কিন্তু কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না। তারপর হঠাৎ চলে যেতে হল দক্ষিণ আফ্রিকায়।

পাঁচ বছর পরে গান্ধীজী আবার এলেন বাংলা দেশে, কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান করতে। উঠলেন তদানীন্তন রিপন কলেজে নেতৃ-আবাসে। এইবার তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল বাংলা দেশের নেতাদের সঙ্গে, বাঙালী চরিত্রের প্রথম পরিচয় পেলেন গান্ধীজী।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

## বাংলা দেশ ঃ বাঙালী চরিত্র

### আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয়

গোখেল ডঃ রায়ের সঙ্গে এইভাবে আমার পরিচয় করিয়ে দেন ঃ "ইনি হলেন প্রফেসর রায়। ইনি মাসে ৮০০ টাকা বেতন পান। মাত্র চল্লিশ টাকা নিজের খরচের জন্য রেখে বাকি সব টাকাই দেশের কাজে দিয়ে দেন। ইনি বিবাহ করেননি, করতে চানও না।"

আজকের ডঃ রায়ের সঙ্গে সেদিনকার ডঃ রায়ের কোন তফাৎই আমি দেখতে পাই না। আজকের মত তখনও তিনি এমনি সাদাসিধা পোশাক পরতেন। তবে তফাৎ হল এইটুকু যে, এখন তিনি খাদি ব্যবহার করেন আর তখন সেগুলি ছিল দেশী মিলে প্রস্তুত। গোখেল এবং ডঃ রায়ের বার্তালাপ শুনে আমার আশা মিটত না, কেননা তাঁরা দেশের কল্যাণের কথা, নয়ত শিক্ষামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো কখনো সেই আলোচনায় আমি ব্যথাও পেতাম। কারণ তাতে নেতাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকত। তার ফলে যাঁদের আমি রথী-মহারথী বলে জানতাম তাঁদের কেউ কেউ আমার কাছে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন।[৬]

### রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বার্তালাপ

দক্ষিণ আফ্রিকার খ্রীষ্টান বন্ধুদের আমি কথা দিয়েছিলাম যে, ভারতবর্ষে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করব এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে পরিচিত হব। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমি শুনেছিলাম এবং তাঁর প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কংগ্রেসের কাজে অগ্রণী ছিলেন। তাই সাধারণ খ্রীষ্টান যারা কংগ্রেস থেকে দূরে থাকত এবং হিন্দু-মুসলমানদের কাছ থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখত, তাদের যেমন আমি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতাম, তাঁকে সেইভাবে দেখতাম না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছার কথা গোখেলকে আমি বলি। তিনি বলেছিলেন, "তাঁর সঙ্গে দেখা করে কী হবে? তিনি খুব ভাল লোক, কিন্তু আমার মনে হয় না যে,

তিনি আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন। আমি তাঁকে খুব ভালভাবে জানি। যাই হোক, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।"

আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চাইলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সময় দিলেন। আমি যখন গেলাম তখন তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। তাঁর বাড়ি ছিল অনাড়ম্বর। কংগ্রেসে আমি তাঁকে কোট-পাতলুন পরিহিত দেখেছিলাম। কিন্তু ঘরে তাঁকে বাঙালীর ধুতি এবং শার্ট পরিহিত দেখে আমি খুশী হয়েছিলাম। যদিও তখন আমি নিজে পারসী কোট এবং পাতলুন পরতাম তবু তাঁর পোশাকের সাদাসিধা ধরণ আমার ভাল লাগল। বাক্যব্যয় না করে আমি আমার সমস্যার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, "আদি পাপের [ মানুষ পাপের বোঝা নিয়ে জন্মায়—ভ. প্র. চ. ] সিদ্ধান্ত কি আপনি মানেন?"

আমি বললাম, মানি।

তিনি বললেন, ভাল। কিন্তু হিন্দুধর্মে এই পাপ থেকে উদ্ধারের কোন পথ নেই। খ্রীষ্টধর্মে তা আছে। পাপের মূল্য মৃত্যু। তাই বাইবেল বলে যে, এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল যীশুর শরণ নেওয়া।

আমি ভগবদ্গীতার ভক্তিমার্গের কথা তাঁকে বললাম। কিন্তু কোন ফল হল না। তাঁর সৌজন্যতার জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে আমি লাভবান হয়েছিলাম।[৭]

### পশুবলি

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কালীমন্দিরের কথা বলেছিলেন। ঐ মন্দির দেখার প্রবল আগ্রহ আমার হয়। কেননা বইতেও আমি ওর বর্ণনা পড়েছিলাম। একদিন সেখানে গিয়েছিলাম। বিচারক মিত্রের বাড়িও ছিল ঐ অঞ্চলে। তাই যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেইদিন মন্দিরেও গিয়েছিলাম। কালীর কাছে বলি দেবার জন্য রাস্তায় পাঁঠার সারি যেতে আমি দেখলাম। মন্দিরে ঢোকার গলিতে ভিখারীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভিক্ষাজীবী বাবাজীর দলও সেখানে ছিল। সেই সময়েও আমি শক্ত-সামর্থ্য ভিখারীদের ভিক্ষা দেবার বিরোধী ছিলাম। তাদের এক দঙ্গল আমার পিছনে ধাওয়া করছিল। এইরকম এক বাবাজী বারান্দায় বসেছিল। সে আমাকে দাঁড়াতে বলে জিজ্ঞেস করল, "বাছা, তুই কোথায় চলেছিস।"

আমি উত্তর দিলাম।

সে আমাকে এবং আমার সঙ্গীকে বসতে বলল। আমরা বসলাম।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই যে পশুবলি হচ্ছে, একে কি আপনি ধর্ম বলে মনে করেন?"

সে বলল, "পশু-হত্যাকে কে ধর্ম বলবে?"

"তবে তার বিরুদ্ধে প্রচার করেন না কেন?"

"ও কাজ আমার নয়। আমাদের কাজ হল ভগবানের উপাসনা করা।"

"কিন্তু ভগবানকে ডাকবার আর কোন জায়গা কি আপনি খুঁজে পেলেন না?"

"আমাদের কাছে সব জায়গাই সমান। লোকেরা হল ভেড়ার পালের মত, নেতারা তাদের যেদিকে চালায় তারা সেই দিকে যায়। আমরা সাধু, এতে আমাদের মাথা গলাবার কিছু নেই।"

আমরা আর কথা বাড়ালাম না। মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে দেখলাম রক্তের স্রোত বহে যাচ্ছে। আমার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত হল। আমার মন আকুল হল, আমি অস্থিরতা বোধ করতে লাগলাম। এই দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারিনি।

সেই দিন রাত্রে বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে এক বন্ধুকে আমি ঈশ্বরোপাসনার এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "পাঁঠারা কিছু অনুভব করতে পারে না। সেখানকার চীৎকার আর ঢাক-ঢোলের শব্দ তাদের সব বোধশক্তিকে নিস্তেজ করে দেয়।"

আমি একে সমর্থন করতে পারিনি। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, পাঁঠারা যদি কথা বলতে পারত তবে অন্য কথা বলত। আমার মনে হয়েছিল যে, এই নিষ্ঠুর প্রথার একান্তই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধদেবের কথা আমার মনে পড়েছিল। এবং সেই সঙ্গে এই কথাও আমার মনে হয়েছিল যে, এই কাজ আমার সাধ্যের অতীত।

সেই দিন আমার যা মত ছিল আজও আমার তাই আছে। আমার কাছে একটি পাঁঠার জীবনের মূল্য একটি মানুষের জীবনের মূল্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। মানুষের দেহ বাঁচাতে পাঁঠার জীবননাশ করতে আমি রাজী নই। আমার বিশ্বাস যে, জীব যত বেশি অসহায় মানুষের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মানুষের আশ্রয়ের অধিকার তার তত বেশি। কিন্তু এই সেবার যোগ্যতা যিনি অর্জন করেননি তাঁর পক্ষে এই আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। পাঁঠাদের এই অপবিত্র বলি থেকে রক্ষা করবার আশা করার আগে আমার

আরও আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগ প্রয়োজন। আজ আমার মনে হয় যে, এই আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের কথা জপ করতে করতেই আমাকে মৃত্যুবরণ করে নিতে হবে। আমার নিত্য প্রার্থনা যে, ঈশ্বরীয় করুণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এমন একজন মহান পুরুষ অথবা নারী এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করুন যিনি আমাদের এই ঘোর পাপ থেকে মুক্ত করবেন, নিরীহ জীবগুলির প্রাণরক্ষা করবেন এবং মন্দিরগুলিকে পরিশুদ্ধ করবেন। যে বাংলায় জ্ঞান, বুদ্ধি, আত্মত্যাগ এবং ভাবপ্রবণতা এত বেশি সেই বাংলা এই পশুবলি কি করে সহ্য করে ?[৮]

এই দৃশ্য [ কালীঘাটে পাঁঠাবলি ] আমি চোখে দেখতে পারি না। ওখানে ধর্মের নামে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা চলে তার বিরুদ্ধে আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে ওঠে। আমার যদি শক্তি থাকত তবে আমি নিজেকে মন্দিরের দরজার সামনে স্থাপন করতাম এবং যাঁরা এর কর্মকর্তা তাঁদের বলতাম যে, একটিও অসহায় পশুকে বলি দেবার আগে তাঁরা যেন আমার গলাটাই কেটে ফেলেন। কিন্তু আমি জানি যে, আজ আমি যদি তা করতে যাই তবে তা হবে অবাস্তব এবং যান্ত্রিক কাজ।[৯]

## বিকারে পশুবলি

ভারতবর্ষে ফেরার অল্পদিন পরে গান্ধীজীর একবার অসুখ করে। তিনি তখন বোম্বাইয়ের মণিভবনে অবস্থান করছিলেন। একদিন জ্বর খুব বেশি হওয়ায় তিনি বিকারগ্রস্ত হন। তিনি মহাদেব দেশাইকে রাত্রে ঘুম থেকে তুলে বলেন, "মহাদেব, বাঙালীরা কলকাতায় কালীঘাটের মন্দিরে কালীর নামে পাঁঠাবলি দেয়। তাদের কি করে শেখানো যাবে যে এটা মোটেই ধর্ম নয়, বরং ঘোরতর অধর্ম ? চল, সেখানে গিয়ে আমরা সত্যাগ্রহ করি, তাদের থামাই। তাহলে ক্রুদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণেরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু এই পশুবলি বন্ধ করতে গিয়ে আমরা যদি আমাদের প্রাণ দেই তবে তাতে কী হবে ?"[১০]

## আতিথেয়তা

...এরপর ডাঃ মেহতার সঙ্গে [ ১৯১৫ সালে ডাঃ প্রাণজীবনদাস মেহতার সঙ্গে—ভ. প্র. চ. ] দেখা করার জন্ম আমি রেঙ্গুনে যাই। পথে কলিকাতায় আসি। আমি ছিলাম স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অতিথি। বাঙালী-আতিথিয়েতার

পরাকাষ্ঠা আমি এখানে লক্ষ্য করেছিলাম। আমি তখন ফলাহারী ছিলাম। তাই কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় এমন সব রকমের টাটকা ও শুকনো ফল আমার জন্ত যোগাড় করা হয়েছিল। বাড়ির মেয়েরা সারারাত জেগে শুকনো ফলগুলির খোসা ছাড়িয়েছিলেন। টাটকা ফলগুলিকেও ভারতীয় পদ্ধতিতে পরিবেশনের জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করা হয়েছিল। আমার সঙ্গীদের জন্ত, যার মধ্যে আমার ছেলে রামদাসও ছিল, বহু রকমের সুস্বাদু রান্না করা হয়েছিল। এই সস্নেহ আতিথেয়তা আমার খুবই ভাল লেগেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে দু-তিন জন অতিথির আপ্যায়নের জন্ত সারা বাড়ি ব্যস্ত থাকবে, এটিও আমার ভাল লাগেনি।[১১]

[এই ঘটনায় গান্ধীজী খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন। তাঁর সামনে যখন খাবার পরিবেশন করা হয় তখন তিনি বলে ওঠেন : করেছেন কী! আমি সাদাসিধা ভাব পছন্দ করি, আর আপনারা আমার জন্ত এত পরিশ্রম করেছেন!—এর কিছুদিন পরেই গান্ধীজী দিনে মাত্র পাঁচটি প্রকৃতিদত্ত মূল খাদ্য গ্রহণের ব্রত নেন।[১২]]

## স্বদেশী আন্দোলন

### বীর বাংলা

দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা দেশ এবার সত্যকার জেগে উঠেছে। প্রতি সপ্তাহে এই খবর আসছে যে, সরকার বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করতে যতই জেদ করছে বাঙালীরা তার বিরোধিতায় ততই দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছে। খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে সরকার যেদিন [১৬. ১০. ১৯০৫] নতুন ঢাকায় গভর্নরকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, বাঙালীরা সেদিন কলকাতায় হরতাল করলেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ করে একটি জনসভা করলেন। তাঁরা সেদিন ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপনা করলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের ঐক্য প্রদর্শন করলেন। কেবল স্বদেশী জিনিস কিনব এবং ব্যবহার করব এই আন্দোলনও দ্রুততার সঙ্গে জোরদার হচ্ছে।[১৩]

### যুবক ও ছাত্রদের প্রতি

জাতির আহ্বানে আপনারা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তার বিবরণ আমি এইমাত্র পড়লাম। এতে আপনাদের এবং বাংলা দেশের যশবৃদ্ধি হয়েছে। আমি এর কম আশা করিনি এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয় আরও বেশি আশা করব। বাংলা দেশের কাছে বিরাট বুদ্ধি আছে আর এর হৃদয় আরও মহৎ।

যে পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের জন্ত আমাদের দেশ বিশেষভাবে পরিচিত তাতেও বাংলা দেশের দান অন্তদের তুলনায় বেশি। ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশের চেয়ে বেশি কল্পনা, বেশি বিশ্বাস এবং বেশি ভাবনা আপনাদের কাছে আছে। ভীরুতার দুর্নাম আপনারা একাধিকবার মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। সুতরাং বাংলা দেশ আগে যেমন নেতৃত্ব করেছে এখনও সেইরকম ভাবে নেতৃত্ব না করার কোন কারণ নেই।[১৪]

অসহযোগের আহ্বানে কলকাতার কলেজের ছাত্রেরা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি আকস্মিকও বটে। ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত কলকাতা থেকে কোন সংবাদ না আসায় মনে করতে পারা যায়নি যে, এইসব বড় বড় ঘটনা সেখানে হতে চলেছে। আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায় রহস্যে আবৃত ছিল। কিন্তু দেশের ডাকে মিঃ সি. আর. দাশের বিশাল উপার্জন ত্যাগ করার ব্যাপারটি ঘটনাগুলিকে ত্বরান্বিত করে দেয়। ১৫ তারিখে ঘটনাটি হঠাৎ ঘটে গেল। মুষ্টিমেয় দ্বিধাগ্রস্ত ও বিরোধী ছাড়া বঙ্গবাসী কলেজের সমস্ত ছাত্র সেদিন দল বেঁধে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে রিপন কলেজের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানকার সতীর্থদের তারা কলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে অনুরোধ করে। তাদের আবেদন ব্যর্থ হয় না। সেখানেও মিলিতকণ্ঠে বন্দেমাতরম প্রতিধ্বনিত হয়। মৌমাছিরা যেমন মৌচাক ছেড়ে বেরিয়ে আসে, ছাত্রেরাও তেমনি ভাবে কলেজ থেকে চলে আসে এবং বাইরের ছেলেদের সঙ্গে যোগ দেয়।

* * *

এখন কলকাতায় প্রতিদিন যতগুলি করে সভা হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় সারা মাসেও অতগুলি সভা হত না। মিঃ সি. আর. দাশকে দিনে আটটি সভাতে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। সুতরাং এটা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, ছাত্রদের এই বিরাট সাড়া কলকাতার রাজনৈতিক জীবনকে নাড়া দিয়েছে। গত সপ্তাহে ৮০০ ছাত্র নিয়ে একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় নতুন ছাত্র তাতে যোগদান করছে। আন্দোলন এখানেই থেমে যায়নি। এটি জাতির জীবনকে নাড়া দিয়েছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোকের মনে কংগ্রেসের বাণী সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছে। সারা প্রদেশে এই রকম ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।……বাংলা দেশ আজ আগুনে পুড়ছে। আমরা

আশা করি যে, বাংলা পরিশুদ্ধ হবে। ছাত্রেরা সঙ্ঘবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভগবান তাদের বিজয়ী হবার শক্তি দিন।[১৫]

[ মির্জাপুর পার্কে ( বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ) অনুষ্ঠিত এক সভায় গান্ধীজী বললেন : ]

দেশের ডাকে বাংলা দেশের ছাত্রেরা যে বিরাটভাবে সাড়া দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি জানি যে, কলকাতার ছাত্রেরা আমার বন্ধু মিঃ সি. আর. দাশের নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই নেতৃত্ব তিনি দিয়েছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর বাংলা দেশের ছাত্র, আপনারা সেই নেতৃত্বকে অনুসরণ করেছেন বলে আপনাদেরও আমি অভিনন্দিত করছি। আমার মত আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁর এবং আপনাদেরও কাজ সবেমাত্র শুরু হল। আমরা নতুন জন্মদানের লগ্নে উপস্থিত আর তাই প্রসব-বেদনার সকল কষ্ট এবং যন্ত্রণা আমরা অনুভব করছি। আপনারা কলেজগুলি খালি করে দিয়েছেন, এইটিই তাঁর পক্ষে এবং ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে স্কুল-কলেজগুলি আপনারা পরিত্যাগ করেছেন সেগুলিতে আপনারা অবশ্যই ফিরে যাবেন না। এই পরীক্ষার সময়, এই আত্মশুদ্ধির সময় আপনারা কী কাজ করবেন, সেই কাজ তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে।

## একমাত্র পথ

যে কাজ আপনারা শুরু করেছেন তা সমাধা করার পথ এখন মিঃ সি. আর. দাশকে এবং আপনাদের খুঁজে বার করতে হবে। যেসব ছাত্র গভর্নমেন্ট থেকে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়গুলি থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু এই কাজ যাতে স্থায়ী থাকে ও ব্যাপ্তিলাভ করে এবং স্বরাজপ্রাপ্তির কাজে যাতে আপনাদের সেবা নিযুক্ত হতে পারে তার জন্য পথ অনুসন্ধান করা দরকার। যখন আমি দেখি যে, ছাত্রেরা এমন মহৎ ভাবে সাড়া দেওয়া সত্ত্বেও বাংলা দেশের মহান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অধ্যাপকেরা, শিক্ষাবিদেরা এবং ট্রাস্টীরা যে-নেতৃত্ব তাঁদের করা উচিত ছিল তা করছেন না, তখন আমি যে বেদনা পাই তার বর্ণনা আমি আপনাদের কাছে করতে পারব না। কেউ যেন মনে না করেন যে, এই কথা বলে আমি তাঁদের অথবা তাঁদের দেশপ্রীতির নিন্দা করছি। আমি জানি, আমার

দৃঢ়বিশ্বাস যে, তাঁরা মনে করেন, আপনারা ভুল করেছেন। আমি জানি, তাঁরা একথাও বিশ্বাস করেন যে, মিঃ দাশ আপনাদের বিবেকের আশ্রয় নিতে না বলে দেশের ডাকে সাড়া দেবার কথা বলে ভুল করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আমি দেশে অসহযোগের প্রস্তাব এনে ভীষণ ভুল করেছি। ছাত্রদের সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কট করতে বলে আমি আরও বেশি ভুল করেছি, এ কথাও তাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন।

যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি, যেসব কথা আমি শুনেছি এবং পড়েছি, আমাদের যাঁরা বড় এবং যাঁরা নেতা, তাঁদের প্রতি আমি যতই শ্রদ্ধা অর্পণ করি না কেন, সেই সব করা সত্ত্বেও আমি আপনাদের এই কথাই বলছি যে, দেশকে আমি যে পথ দেখিয়েছি তার অভ্রান্ততা সম্পর্কে আমি আগের চেয়েও বেশি নিশ্চিত। আমরা যদি আমাদের মনের মত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আমরা যদি ভারতবর্ষের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চাই, ইসলামের দোদুল্যমান সম্মানেরও যদি আমরা পুনরুদ্ধার করতে চাই তবে গভর্নমেণ্টকে আমাদের বলতেই হবে যে, আমাদের কাছ থেকে সে কোন সাহায্য পাবে না, আমরাও যে-গভর্নমেণ্ট আমাদের আস্থা হারিয়েছে তার কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য গ্রহণ করব না—এই বিশ্বাস আমার আগের চেয়েও বেশি দৃঢ়মূল হয়েছে। আমি জানি যে, আপনাদের মধ্যে যাঁরা সংশয়ী তাঁরা আমাকে বলবেন অথবা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবেন যে, এই রকম মঞ্চ থেকে এইসব কথা আপনারা বহুবার শুনেছেন। এ কথা সত্য। কিন্তু ম্যাক্সমুলার আমাদের বলেছেন, একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাব-প্রকাশ তিনি এইভাবে করেছেন যে, সত্য যতক্ষণ না সমর্থিত হচ্ছে ততক্ষণ বার বার তাকে উচ্চারণ করতে হয়। আমিও তেমনি এই সত্যকে আমার দেশবাসীর কাছে, আমাদের নেতাদের কাছে, যতক্ষণ না তাঁরা একে সমর্থন করছেন, এর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন, ততক্ষণ পুনরাবৃত্তি করতে থাকব। বহু মঞ্চ থেকে যেমন আমি বলেছি, এইখানেও আমি আবার বলছি যে, ভারতবর্ষ যতক্ষণ না অসহযোগের ডাকে সাড়া দিচ্ছে ততক্ষণ সে তার অতীত গৌরব, তার হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। আমরা যেভাবে গঠিত তাতে অন্য কোন ভাবে আমরা এই বিরাট গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারি না।

• • •

## আট মাসের মধ্যে স্বরাজ

এক বছরের চারটি মাস ইতিমধ্যে পার হয়ে গিয়েছে। আজ বাংলা দেশের যুবকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার বিশ্বাস যেমন ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তেমনিভাবে আগে কখনও হয়নি। অধিকতর আশা, অধিকতর সাহস এবং অধিকতর শক্তি আপনারা আমাকে দিয়েছেন। ভগবান সৌকত আলিকে, মহম্মদ আলিকে এবং আমাকে এই বছরের মধ্যেই স্বরাজের পতাকা উড্ডীন করবার জন্ত যেন বাঁচিয়ে রাখেন। কিন্তু ভগবানের যদি এই ইচ্ছা হয় যে, বছরের বাকি আট মাস শেষ হবার আগেই আমার ভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপিত হবে তবে এই বিশ্বাস নিয়ে আমি মরব যে, বছর শেষ হবার আগেই স্বরাজ লাভ করবার জন্ত আপনারা চেষ্টা করবেন। এই কাজকে আপনারা যত শক্ত বলে ভাবছেন তত শক্ত নয়। আসলে দুর্বলতা রয়েছে আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে। স্বরাজের শিক্ষা আমরা বিধানসভার মধ্যেই লাভ করব, আমাদের এই বিশ্বাসের ভিতর দুর্বলতা আছে। ষোল বছরের শিক্ষাক্রম অতিক্রম না করা পর্যন্ত আমরা স্বরাজ পাব না, আমাদের এই বিশ্বাসের মধ্যেও দুর্বলতা আছে। এইসব বিশ্বাস যদি আমাদের থাকে তবে আমি স্পষ্টই বলব যে, স্বরাজ পেতে আমাদের একশ বছর লেগে যাবে। কিন্তু যেহেতু আমার বিশ্বাস যে, আমাদের প্রয়োজন এইসব জিনিসের নয়, আমাদের প্রয়োজন বিশ্বাস, সাহস এবং শক্তির আর যেহেতু আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, এই সবই আজ জনগণের মধ্যে রয়েছে সেই হেতু আমি মনে করি যে, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করা সম্ভব।

## জনগণের ভারতবর্ষ

কংগ্রেসের আবেদন কথার অর্থ কী? কংগ্রেসের আবেদনের অর্থ হল, আপনার এবং আমার মত সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ, ভারতবর্ষের সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজ, যা নাকি ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ জনগণের কাছে সমুদ্রে বিন্দুর মত তারা এবং দেশের শিল্পী ও কৃষিজীবীরা এক পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাকে বিশ্বাস করুন, কংগ্রেস ভারতবর্ষকে পৃথক করে দেবে এবং রূঢ় হস্তের কাছ থেকে স্বরাজ কেড়ে নেবে এবং সম্ভব হলে আপনাদের সাহায্য নিয়ে আর প্রয়োজন হলে আপনাদের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করে দেবে। আজকের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ সীমিত নয়।

ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষিত মানুষ যদি সংশয়ী থাকে, তাদের যদি আশা, বিশ্বাস, সাহস এবং শক্তি না থাকে তবু ভারতবর্ষ তার আশা নিয়ে বেঁচে থাকবে। এই বিশ্বাস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তবু আমি আশা করি যে, যদি ছাত্র-জগৎ, যদি বাংলার ছাত্রেরা তাদের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকে তবে বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের অধ্যাপকেরা, ট্রাস্টীরা ও শিক্ষাবিদেরা আহ্বানে সাড়া দেবেন। তাঁদের অসন্তোষের অন্ধকার আপনাদের দ্বারা আলোয় রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

## হীন অনুকরণ নয়

আপনারা বাংলা দেশের ছাত্র। যে সিদ্ধান্ত আপনারা গ্রহণ করেছেন, যা কিছুই ঘটুক না কেন, তাতে অটল থাকতে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। আমি জানি যে, মিঃ সি. আর. দাশ তাঁর প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকবেন। একজন মহান বাঙালী এখনই দশ হাজার টাকা এবং পরে প্রতি বছর দশ হাজার করে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছেন। কলকাতার স্থায়ী বসবাসকারী মারোয়াড়ীরাও তাঁকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আরও প্রতিশ্রুতি তিনি পাবেন। কিন্তু টাকা-পয়সার সমস্যা মোটেই বড় নয়। কলেজের স্থাপনার জন্য জায়গা তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। ভাল ভাল অধ্যাপকও তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। আপনারা যাঁরা অসহযোগ করেছেন তাঁদের আমি বলব যে, তাঁরা যেন তাঁদের সামনে পুরাতন জীবন-মানের আদর্শ তুলে না ধরেন। এমন কি আমাদের স্বপ্নের স্বরাজও আজকের অবস্থার হীন অনুকরণ হবে না। সুতরাং আপনাদের দেখতে হবে যে, নতুন কলেজ রূপে আপনারা যা পেতে চলেছেন তা যেন আজকে আপনারা যা পাচ্ছেন তার হীন অনুকরণ হয়ে না ওঠে। আপনারা বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। প্রেরণার জন্য চেয়ার-বেঞ্চের দিকেও আপনারা তাকাবেন না। আপনারা দেখবেন চরিত্রের দিকে। প্রেরণার জন্য আপনারা তাকাবেন আপনাদের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদের বিশুদ্ধ চরিত্রের দিকে। উৎসাহ এবং উদ্দীপনার জন্য আপনারা নিজেদের সঙ্কল্পের দিকে তাকাবেন। আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তাহলে আপনারা হতাশ হবেন না। কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে, মিঃ দাশ আপনাদের বিরাট অট্টালিকা দেবেন, যে আরাম ও বিলাসিতায় আপনারা অভ্যস্ত তিনি তা আপনাদের জন্য এনে দেবেন, তবে আপনারা নিরাশ হবেন।

## নতুন সুসমাচার

আজ এই সন্ধ্যায় এক নতুন, এক শ্রেষ্ঠতর সুসমাচার আপনাদের কাছে তুলে ধরবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। বারো মাসের মধ্যে স্বরাজ লাভ করতে যদি আপনারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জন করে নেবার কাজে সাহায্য করতে যদি আপনারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন তবে আমি বলব যে, যে-উপদেশ আমি অপেনাদের দিতে চলেছি তা গ্রহণ করে স্বরাজ-সাধনায় উৎসর্গীকৃত মানুষদের জীবন আপনারা সহজতর এবং সুন্দরতর করে তুলুন। আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, আপনাদের পরিত্যক্ত বিদ্যালয়গুলি যেভাবে চলত সেইভাবেই আপনাদের স্কুল ও কলেজগুলি পরিচালিত হবে তবে আপনারা ভুল করবেন। পৃথিবীর কোন দেশ দুঃখ, যন্ত্রণা এবং আত্মত্যাগ ছাড়া মুক্তিলাভ করেনি, নতুন জন্ম দেখেনি। কী সেই আত্মত্যাগ? যুবা বয়সেই আমি আত্মত্যাগের সঠিক অর্থ শিখেছি। সেটি হল, নিজেকে পবিত্র করে তোলা, নিজেকে ধার্মিক করে তোলা। অসহযোগ এই পবিত্রকরণের কর্মসূচী, আর তাই এই পবিত্র করার কাজে যদি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হয় তবে তাই করতে হবে। বাংলা দেশকে যদি আমি চিনে থাকি তবে আমি জানি যে, আপনারা কর্তব্যচ্যুত হবেন না, আপনারা এই কাজে সাড়া দেবেন।

## সুতা কাটার কর্তব্য

আমাদের শিক্ষা দুটি দিক থেকে অসম্পূর্ণ। যাঁরা আমাদের শিক্ষার বিধি প্রস্তুত করেছেন তাঁরা দেহ ও আত্মার শিক্ষাকে অবহেলা করেছেন। অসহযোগের মাধ্যমে আপনারা আত্মিক শিক্ষা লাভ করছেন, কেননা সরকার যেসব অন্যায় করে চলেছে তা থেকে নিজেদের সরিয়ে আনাই হল অসহযোগ। তা এর বেশিও কিছু নয়, কমও নয়। আমরা যদি সচেতনভাবে এবং যত্নপূর্বক অন্যায় থেকে বিরত হই তবে তার অর্থ হল ঈশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করা। সেইটি আত্মিক শিক্ষার সমাপ্তি অথবা প্রারম্ভ। কিন্তু আমাদের দৈহিক শিক্ষাকে অবহেলিত হতে দেখে, চরখাকে ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষকে দাসত্ব বরণ করে নিতে দেখে এবং এক মুঠো খাবারের জন্য ভারতবর্ষকে নিজেকে বিক্রি করে দিতে দেখে আমার মনে হয়েছে যে, যতদূর সম্ভব বেশি পরিমাণ সূতা কাটা ও সূতা উৎপাদনের মধ্যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

সেইটিই হবে আপনাদের প্রস্তুতিকালের শিক্ষা। বাংলার যুবক, আপনাদের কাছে একথা বলতে আমি মোটেই ভীত নই। স্বরাজ লাভের পরেই আমাদের সাধারণ শিক্ষা শুরু হবে। বাংলার যুবক-যুবতীরা সুতা কাটায় তাদের সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করুক।[১৬]

কলকাতার কিছু ছাত্র 'উপবেশন ধর্ণা' রূপে প্রাচীন বর্বরতাকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন। সৌভাগ্যক্রমে এই কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়। যেসব সহপাঠী তাদের পরীক্ষার টাকা জমা দেবার জন্য অথবা শিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চেয়েছিল তাদের পথ তারা বন্ধ করে দেয়। আমি একে এই জন্যই বর্বরতা বলেছি যে, এটি হল পীড়নের এক অনিষ্ট পদ্ধতি। এটি কাপুরুষতাও এই জন্য যে, যে ধর্ণা দেবার জন্য বসে থাকে সে জানে যে তাকে মাড়িয়ে কেউ যাবে না। একে ঠিক হিংসা বলা যায় না, কিন্তু এ তার চেয়েও খারাপ। আমরা যদি বিরোধীর সঙ্গে মারামারি করি তবে তাকেও আমরা আঘাত করবার সুযোগ দেই। কিন্তু তাকে যখন আমরা আমাদের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবার জন্য চ্যালেঞ্জ করি তখন তাকে আমরা এক অস্বস্তিকর ও অপমানজনক অবস্থার মধ্যে ফেলে দেই। আমি জানি যে, যেসব অত্যুৎসাহী ছাত্র ধর্ণা দিয়েছিল তারা তাদের কাজের বর্বরতার দিকটি ভেবে দেখেনি। কিন্তু যাকে বিবেকের বাণী অনুসরণ করতে হবে এবং বিষম অবস্থায় একাকী দাঁড়াতে হবে সে অবিবেচক হতে পারে না। অসহযোগ যদি ব্যর্থ হয় তবে তা হবে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই। অসহযোগে পরাজয় নেই। এ কখনো ব্যর্থ হয় না। এর তথাকথিত প্রতিনিধিরা এর ভুল প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, তাতে দর্শকদের মনে হতে পারে যে, অসহযোগ বুঝি ব্যর্থ হল। সুতরাং অসহযোগীরা তাঁদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে সাবধান হবেন। কোন রকম অধৈর্য, বর্বরতা এবং অনুচিত পীড়ন যেন এতে না থাকে। আমরা যদি গণতন্ত্রের প্রকৃত আদর্শ অনুশীলন করতে চাই তবে আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। অধৈর্য উদ্দেশ্যর প্রতি যে বিশ্বাস তার সঙ্গে প্রতারণা করে।[১৭]

## বরিশাল

চট্টগ্রাম ত্যাগ করে আমরা বরিশালে গিয়েছিলাম। বরিশালের পথে চাঁদপুর নামে একটি জায়গা পড়ে। এখানে সেই জায়গাটি আমি দেখলাম

যেখানে গুর্খারা নির্দোষ কর্মীদের উপর আক্রমণ করেছিল। আমার হৃদয় মথিত হয়েছিল এবং মানুষের জ্বালা আমি অনুভব করেছিলাম। এরা সবাই গরীব শ্রমিক। তারা ধর্মঘট করেছিল বলে ভারতবর্ষ তাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছে। বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে মধ্যরাত্রিতে যাদের ঘর থেকে বার করে আনা হয়েছিল তারা যদি নামকরা লোক হত তবে সমস্ত দেশে আগুন জ্বলে উঠত। স্বরাজের অর্থ হল ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা। আমাদের স্বরাজে কি এই জিনিসের প্রতিষ্ঠা হবে? তা যদি না হয় তবে সেই স্বরাজ প্রকৃত স্বরাজ হবে না।

সুপরিচিত বর্ষীয়ান নেতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ি হল বরিশালে। এই অঞ্চলের মূল শস্য হল ধান। শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত চল্লিশ বছর আগে ৫০,০০০ টাকা খরচ করে এইখানে একটি বিরাট বিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন। আজ সেই বিদ্যালয় অসহযোগের শিবিরে যোগদান করেছে। শ্রীজগদীশবাবু হলেন এর অধ্যক্ষ। তিনি জীবনভোর ব্রহ্মচারী। এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের উপর। প্রত্যেকেই আমাকে বলেছেন যে, তিনি সৎ চরিত্রের শিক্ষিত মানুষ এবং অত্যন্ত বিনয়ী।

বলা যেতে পারে যে, বরিশালে স্বদেশীর কাজ মোটামুটি ভালভাবেই চলছে। পূর্বোল্লিখিত বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রেরা তাদের কাটা সুতা আমাকে দেখিয়েছিল; সেই সুতা খুবই সরু। তাছাড়া সেখানে প্রায় আশিটি তাঁত সম্বলিত একটি পৃথক বয়ন বিভাগ আছে। বর্তমানে তাঁতে প্রস্তুত ১৫০০০ টাকার মাল তাঁদের রয়েছে। এই বয়নশালায় যে পরিচ্ছন্নতা আমি লক্ষ করেছি, সুরাটে শ্রীযোশীর কারখানা ছাড়া আর কোথাও তা আমি দেখিনি। একটুকরো সুতা অথবা একটুখানি ময়লা আমি মেঝেতে দেখিনি। কাজও খুব পরিষ্কার। বয়ন বিদ্যালয়টি মাত্র এই বছর শুরু হয়েছে।

আমি দেখেছি যে, বরিশালে স্বেচ্ছাসেবকেরা এমন কি চট্টগ্রামের চেয়েও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত। বিরাট সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও চমৎকার শৃঙ্খলা বজায় ছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা আমাদের জন্য পথ করে রেখেছিলেন। আমরা দেখলাম যে, লোকেরা যাতে শ্রদ্ধায় আমাদের পদস্পর্শ করার চেষ্টা না করে তার জন্য অনুরোধ আগে থেকে বার বার ঘোষিত হওয়ায় আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।

বরিশাল সেই সব জায়গার অন্যতম যেখানে বঙ্গভঙ্গের সময় ভিন্নতা থাকা

সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানেরা সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেছিল। এর জন্য সকলেই বাবু অশ্বিনীকুমারকে সাধুবাদ দিয়েছেন।[১৮]

## মেদিনীপুরের সম্বর্ধনা

মেদিনীপুরে আমাকে যে সম্বর্ধনা করা হয় তার প্রকৃতি দেখে আমার নিজের মনে এই বিশ্বাস আমি জন্মাতে দিতে পারি না যে, বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজ আমাকে স্নেহচ্যুত করেছেন অথবা স্বরাজ অর্জনের জন্য আমার আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।[১৯]

## বাংলা

বাংলা বড় প্রদেশ এবং এই লেখায় বাংলা দেশের কাজকর্ম সম্পর্কে বেশি কথা বলা হলে পাঠক বিস্মিত হবেন না। ব্যক্তিগত আলোচনার সময় এই কথা বলতে আমার দ্বিধা হয়নি যে, স্বদেশীর কাজে বাংলার স্থান সকল প্রদেশের নিচে। বাংলার গ্রামে অথবা শহরে যে জনতা দেখা যায় তাদের পরনে স্বদেশীর ছাপ নেই। খাদির স্বাক্ষ্য বাংলা দেশে প্রায় নেই। তবে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণের অভাবও সেখানে নেই। অন্য জায়গার মত এখানে চরখা এখনও গভীরে প্রবেশ করেনি। কিন্তু সাধারণভাবে সেটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। শিলচর এবং শ্রীহট্টে ক্ষুদ্রাকৃতি চরখা আমি দেখেছি। এটি প্রায় খেলনার মত। সুতা কাটার পক্ষে এটি ভাল, কিন্তু এর উৎপাদন খুব কম। চট্টগ্রামে চরখার প্রচলন কিছু বেশি এবং সেগুলি কিছু ভাল। তারা এক ধরনের উৎপাদনক্ষম ছোট এবং হালকা চরখা আবিষ্কার করেছেন যেগুলি ছেলেমেয়েরা পছন্দ করে। এগুলি পরিপাটী, সুন্দর এবং সস্তা। কিন্তু শিলচরের মত এগুলি থেকেও আসল চরখার তুলনায় কম সুতা উৎপাদন হয়। পক্ষান্তরে, বরিশালে আমরা একটি চতুর পরিকল্পন দেখেছি। সেটির চাকাকে পায়ে করে ঘোরানো হয়। এই যন্ত্র থেকে কত সুতা কাটা যায় তার হিসাব তাঁরা আমাকে দিতে পারেননি। কিন্তু প্রাচীন চরখার সম-পরিমাণ সুতা যদি এতে কাটা যায় তবে তাতে আমি বিস্মিত হব না। এই সমস্ত আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে, চরখা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং তা স্থায়ী হবে। উপরন্তু বরিশালে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সরু এবং সমান সুতা কেটেছে দেখে আনন্দ হল। সুতার পরিমাণও নৈরাশ্যজনক নয়।

বরিশালের চরখাশালাটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত। তাঁতগুলিও শ্রীরামপুরের ধরনের মাকুবিশিষ্ট। সংগঠকদের অধীনে প্রায় আশিটি তাঁত আছে। পাশের একটি ঘরে তাঁরা পনের হাজার টাকার কাপড় মজুত করে রেখেছেন। টানা এবং পোড়েনের জন্য কেবল হাতে কাটা সুতা ব্যবহার করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা তাঁরা তখনও শিখতে পারেননি। আমি টানা এবং পোড়েন উভয় ক্ষেত্রেই হাতে কাটা সুতা ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করছি। ইতিমধ্যে মিশ্রিত জিনিস বাজারে চালু হয়ে গিয়েছে। সাধারণ ব্যবসায়ীরা যে কাজ করতে পারেন সে কাজ কংগ্রেস কর্মীদের করার প্রয়োজন নেই, করা উচিতও নয়।

অবশ্য এই তাঁতগুলি এবং যে-কটি চরখা আমি দেখেছি তা বাংলা দেশে প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করতে পারবে না। বাংলা দেশ যদি কাপড়ের জন্য বোম্বাই এবং আমেদাবাদের উপর নির্ভর করে তবে সে স্বরাজ-আন্দোলনে সাহায্য করতে পারবে না। যেমন একজন মানুষকে জোর করে ক্ষুধার্ত রেখে তাকে ঈশ্বরের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা যায় না তেমনি লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে জোর করে অর্ধ-অনশনে রাখলে তারা স্বরাজের কথা চিন্তা করতে অথবা উপলব্ধি করতে পারবে না। স্বরাজের প্রথম অপরিহার্য শর্ত হল এই যে, প্রত্যেক প্রদেশ খাদ্যে এবং বস্ত্রে স্বাবলম্বী হবে।

কিন্তু বাংলা দেশ যখন সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হবে তখন সে পিছিয়ে থাকবে না। তার সুন্দর কল্পনাশক্তি আছে। সেখানকার গ্রামবাসীরা সরলতা বজায় রেখেছেন। বাংলা দেশের ছেলেরা চালাক এবং উদ্যমশীল, মেয়েরা রমণীয়, সরল এবং লাবণ্যময়ী। পুরুষ এবং নারীরা গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ। তাঁদের বিশ্বাস উন্নত। চরখার স্মৃতি এখনও জাগ্রত রয়েছে। বাংলাকে কেবল উপলব্ধি করতে হবে যে, সে সূক্ষ্মতম সুতা উৎপাদন করেছিল এবং তা কেবল নিজের জন্য নয়, এমন কি কেবল ভারতবর্ষের জন্যও নয়, বহির্বিশ্বের জন্য এই সুতা সে উৎপাদন করেছিল এবং সেই গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসকে তাকে অতিক্রম করতে হবে। বাংলা দেশ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, তার লক্ষ লক্ষ মেয়েরা যখন সুতা কাটার কলা ভুলে গিয়েছে তখন অন্য কোন কাজ তার স্থলাভিষিক্ত হয়নি এবং তার তথা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের মূল কারণ হল

এখানকার কৃষকদের বাধ্যতামূলক আলস্য। আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করছি যে, বাংলা দেশ চরখার সম্পূর্ণ বাণী প্রায় বুঝে ফেলেছে এবং যখন সে তা বুঝবে তখন ভারতবর্ষে ঝড় বইয়ে দেবে।

একজন বন্ধু বলেছেন যে, বাংলা দেশকে অনেক কিছু ভুলতে হবে। আরও কয়েকটি প্রদেশের মত তারও সব কিছু নির্ভুল নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢাকাতে যে বিদেশী সুতার কাপড় বোনা হয় তা স্বদেশী, এ কথা তাকে ভুলতে হবে।[২০]

## বাংলা দেশের কর্তব্য

[ প্রিন্স অফ ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে সাধারণ ধর্মঘট আহুত হয়। কলকাতাতেও ২৪শে ডিসেম্বর ১৯২১ ধর্মঘট হবার কথা। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে গভর্নমেন্ট নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি চিত্তরঞ্জন সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করেন। এই গ্রেপ্তারের ফলে হরতাল পালন যে দেশবাসীর কর্তব্য হয়ে পড়েছে, গান্ধীজী একটি প্রবন্ধে সেই কথা উল্লেখ করেন। বাংলা দেশ থেকে যেসব নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গান্ধীজীর তালিকা অনুযায়ী তাঁরা হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীমান চিররঞ্জন দাশ, আক্রাম খাঁ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, পদ্মরাজ জৈন, মৌলনা আবদুল মুসাইর।]

বাংলা দেশের কর্তব্য সুস্পষ্ট। নির্বাচিত সভাপতি এবং অন্যান্য বাছা বাছা নেতাদের গ্রেপ্তারের যথোচিত উত্তর তাকে দিতে হবে। নির্বাচিত সভাপতির গ্রেপ্তারের মত মৌলনা আবুল কালাম আজাদের গ্রেপ্তারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। মৌলনা আবুল কালাম আজাদের ভারতব্যাপী খ্যাতি আছে, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে। তিনি একজন পরীক্ষিত সৈনিক এবং রাঁচীতে বহু বছর জেল খেটেছেন। ইসলামের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে তাঁর স্থান খুব উঁচুতে। তাঁর গ্রেপ্তার ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে গভীরভাবে নাড়া দেবে। বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান এর প্রত্যুত্তর কিভাবে দেবেন? কাজের উত্তর কাজ দিয়েই দিতে হবে। উত্তর কী হওয়া উচিত তা আমরা জানি। বাংলা দেশের হাজার হাজার হিন্দু এবং মুসলমান কি স্বেচ্ছাসেবকে নাম লেখাবেন এবং কারা-বরণ করবেন? নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি তাঁর মর্মস্পর্শী আবেদনে ছাত্রদের কাছে যা আশা করেছেন বাংলা দেশের ছাত্রেরা কি তাতে সাড়া দেবেন?

আমি নিশ্চিতরূপে ধরে নিয়েছি যে, বাংলা দেশের এবং বিশেষ করে কলকাতার হিন্দু ও মুসলমানেরা পরিপূর্ণ শান্তি বজায় রাখবেন।......আমাদের ইতিহাসের এই চরম সংকটকালে বাংলা দেশের তীব্র ভাবাবেগকে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্খলার শান্ত শক্তিতে পর্যবসিত করতে হবে। তর্জন-গর্জন নয়, হুজুগ নয়, বাহাদুরি প্রদর্শন নয়; প্রয়োজন হল, উদ্দেশ্যের প্রতি ধর্মীয় নিষ্ঠা এবং করব অথবা মরব, এই দৃঢ় পণ।[২১]

## ভাবাবেগের রূপায়ণ

[অসহযোগ আন্দোলনে বাংলা দেশের ছাত্রেরা দলে দলে যোগদান করেন। এই মর্মে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দুটি আবেদন প্রচার করেছিলেন। গান্ধীজী তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে নিচের কথাগুলি লেখেন।]

নিছক ভাবাবেগ মনে করে এই দুটি আবেদনের গুরুত্বকে কেউ যেন ছোট না করেন। এর পর থেকে বাংলার ভাবাবেগকে যেন তুচ্ছতাচ্ছিল্য অথবা অবজ্ঞা না করেন। দেশের ডাকে বাংলা দেশ যেভাবে সাড়া দিয়েছে, বাংলা দেশের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ততটা আমি আশা করিনি। এই সাড়া কেবল কলকাতাতেই সীমিত নয়, এমন কি চট্টগ্রামেও নয়, বাংলা দেশের যেখানে দমন হয়েছে সেখানেই বাঙালীরা তার জবাব দিয়েছেন। এটি কেবল বাহ্যিক জিনিস নয়। শূন্য আবেদনে অথবা নিছক ভাবাবেগে কেউ যন্ত্রণা বরণ করে নেয় না। বাংলা দেশ তার ভাবাবেগের দৃঢ়তা দেখিয়েছে।[২২]

## বাংলা দেশ কী অহিংস থাকবে ?

একজন বাঙালী আমাকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছেন যে, যে-বাংলা দেশ প্রচণ্ড নৈরাজ্যবাদীর দল প্রস্তুত করেছে সে কি শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকতে পারবে ? উপরে উধৃত* ঘোষণাপত্র এবং তাতে জনসাধারণের আত্মসংযমের যে-কথা বিবৃত হয়েছে তা আমার মনকে অবশ্যই আশায় ভরিয়ে দিয়েছে। নৈরাজ্যবাদীরাও দেশকে ভালবাসেন। অপৌরুষের মৃত্যুর প্রতি তাঁরা বিতৃষ্ণ। অল্প কিছুদিন আগেও তো আমরা এই মৃত্যুকে ভুল এবং অপমানজনক বলেছি।

---

* বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং খিলাফত কমিটির সহসভাপতি শ্রীহরদয়াল নাগ একটি বিবৃতিতে জনসভায় শান্ত থাকার জন্য কলকাতার নাগরিকদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং অহিংসার কার্যকারিতার উল্লেখ করেছিলেন।

'ভিক্ষাবৃত্তির পদ্ধতি'র প্রতি তাঁরা বিরক্ত। কিন্তু চারপাশে পুরুষ ও নারী, যুবক ও বৃদ্ধের অনুপম সাহসের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি দেখে প্রচণ্ড নৈরাজ্যবাদীর মনও গর্বে ভরে উঠবে। 'ভিক্ষাবৃত্তি'র স্থানাভিষিক্ত হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ আত্মশক্তি এবং শাসকের আইন অমান্য—যা উদ্ধত দমনের দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। বোধ হয় আর কোন পদ্ধতি দেশের প্রগতিকে এক ইঞ্চি অথবা এক মুহূর্ত বেশি ত্বরান্বিত করতে পারত না। সংগ্রামের সমাপ্তির জন্য আমাদের নিজেদের সক্ষম করে তুলতে আমাদের কম তো নয়ই, বরং আরও বেশি অহিংসার প্রয়োজন। এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আজও যদি এমন কেউ থাকেন যিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য হিংসার প্রয়োজন তবে তিনি বাংলা আজ যে-শান্ত সাহসের প্রদর্শন করছে তা দেখে আন্দোলিত না হয়ে পারবেন না।[২৩]

## বাংলা অদ্ভুত কাজ করেছে

বর্ষীয়ান এবং জাতির বিশ্বস্ত সেবক আমার একজন বন্ধু আছেন যিনি বাংলা দেশের দিগন্তে যখনই মেঘ জমা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই তিনি সেই সংবাদ আমাকে দিয়েছেন। এবারে তিনি সাধারণভাবে ট্যাক্স না দেওয়ার আন্দোলনের উৎসাহদান সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, অধিকাংশ নেতা জেলে বন্দী থাকার ফলে বাংলা দেশে অবিবেকী ঘটনা ঘটা সম্ভব। নেতাদের জেলে বন্দী করার জন্য কোন অভিযোগ আমি করছি না, কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথা না বলেও আমি পারছি না যে, জেলে নেতাদের বন্দী করা গভর্নমেন্টের পক্ষে অপরাধমূলক মূর্খতা। গভর্নমেন্ট শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের সঙ্গে শান্তি-ভঙ্গকারীদের মতই ব্যবহার করেছেন। গভর্নমেন্ট হিংসাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। তাঁরা যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দেশকে হিংসার জন্য প্রস্তুত করছেন। কিন্তু তার জন্যও আমি অভিযোগ করব না। আমি স্বীকার করছি যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এই জিনিস, এর চেয়েও বেশি আশা করেছিলাম। আর এই সিদ্ধান্তেও আমরা উপনীত হয়েছি যে, আমাদের সর্বতোভাবে সাহসী হতে হবে এবং নির্ভুলভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সেদিন যেমন ছিল তেমনি আজও আমাদের বিশ্বাস ভগবানের প্রতি রয়েছে।

কিন্তু আমি এও জানি যে, সম্ভাব্য সব রকমের সংকট এড়াবার জন্য

আমাদের প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সেইজন্যই আমি এই উপদেশ দিয়েছি এবং আবার দিচ্ছি যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে যে পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছি তার জন্য সমগ্র দেশের অপেক্ষা করার মত বিজ্ঞতা থাকা দরকার। বাংলা দেশ অনেক কিছু করেছে। সে বিস্ময়কর কাজ করেছে। সে অনেক দুঃখ ভোগ করেছে, আজও করছে। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট সংযমের পরিচয় সে দিয়েছে। বাংলার নেতাদের আমি আবেদন করব যে, তাঁরা যেন ধৈর্য ধারণ করেন এবং কোন রকম নতুন কাজে হাত না দেন। স্বাধীনভাবে কথা বলার এবং স্বাধীনভাবে মেলামেশা করার অধিকার তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে আদায় করে নিন। কিন্তু আজ আইন অমান্য অথবা তার একটি পর্যায় ট্যাক্স-প্রদান-বন্ধ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হবার কোন কারণ নেই। কর্মীদের উচিত এ বছরের দেয় খাজনা দিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়ে জনগণকে উন্নততর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া।[২৪]

## বাংলার অন্তরে স্থান পেতে চাই

গভীর আশা নিয়ে আমি বাংলা-ভ্রমণের দিকে তাকিয়ে আছি। সুন্দরতম কল্পনা আছে বাংলা দেশে। বাংলা দেশের যুবকেরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁরা আত্মত্যাগে প্রস্তুত। বাংলার সব জায়গা থেকে যেসব চিঠি আমি পাচ্ছি সেই সবগুলিই প্রলুব্ধকর। আমি আশা করি যে, এই ভ্রমণে যে দৈহিক শ্রম হবে তা সহন করার শক্তি যেন আমার থাকে। কাথিয়াওয়াড় ভ্রমণের ফলে আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। তাকে এখন বশ করে আনলেও আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমি আশা করি যে, যে-কয়দিন এখনও আমার হাতে আছে তার মধ্যে আমি শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারব। তবু উদ্যোক্তাদের আমি অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন আমার দৈনিক শ্রম যতদূর সম্ভব হাল্কা করে দেন। আমি আবার বলছি যে, সমগ্র ভ্রমণটি যেন প্রণালীবদ্ধ হয় এই আমার ইচ্ছা। বাংলা দেশ প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে না একথা বলা হয়ে থাকে। এই অভিযোগ যেন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তীক্ষ্ণ এবং কল্পনামূলক বুদ্ধির সঙ্গে প্রণালীবদ্ধ কাজ করার অভ্যাস যখন যুক্ত হয় তখন সেই সম্মিলন সামনে যা কিছু আসে তাকেই প্রবাহিত করে নিয়ে যায়। বাংলা যেন এই সম্মিলন দেখাতে পারে। প্রত্যেক স্থানে আমি পূর্ণ পরিসংখ্যানযুক্ত বিবরণ আশা করব। প্রত্যেকটি মানপত্রে বহুবিধ গুণপনার উল্লেখ না করে

যদি তাতে সেই জেলার বা শহরের তথ্যপূর্ণ বিবরণ থাকে তবে তা আমার কাছে কতই না শিক্ষাপ্রদ হবে! দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রত্যেকটি ভাষণে স্বয়ং-কাটুনী ও অন্যান্যদের সংখ্যা, চালু চরখার সংখ্যা, প্রত্যেক চরখার কর্মদক্ষতা, সুতো ও খাদির মাসিক উৎপাদন, খাদি কেন্দ্রের সংখ্যা এবং প্রত্যেকটিতে বিক্রয়ের বিবরণ প্রভৃতির বর্ণনা থাকতে পারে। ভাষণে জাতীয় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং কত ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে তার কথাও থাকতে পারে। অস্পৃশ্যদের মধ্যে যে-কাজ করা হচ্ছে এবং তাদের পূর্বেকার অবস্থা এবং সংগঠিতভাবে কাজ শুরু করার পরের অবস্থার বর্ণনাও তাতে যুক্ত হতে পারে। এই সব বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমানের অবস্থার বর্ণনা থাকবে এবং তা শেষ হবে মদ ও আফিমের ব্যবসার বর্ণনা দিয়ে। এত সব কথা বক্তৃতাগুলির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করার সময় যদি না থাকে তবে আলাদা কাগজে সংবাদগুলি লিখে আমাকে জানালে খুব ভাল হয়। আমি সবিনয়ে বলছি যে, মানপত্রগুলির জন্য মূল্যবান আধার বা ফ্রেম আমাকে দিলে অন্যায় করা হবে। হাতে তৈরী কাগজে অথবা এক টুকরো খদ্দরে হাতে লিখে মানপত্র আমাকে দিলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট হব। বাংলা দেশকে এ কথা বলার আমার দরকার নেই যে, দামী অথবা ভারী না করেও মানপত্রকে সুন্দর করা যায়। ত্রিবাঙ্কুরে এবং অন্যত্রও মানপত্রগুলি সূক্ষ্ম ছোট তালপত্রের উপর লেখা হয়েছিল। আমি ভারতবর্ষের মত বাংলাদেশের অন্তরে প্রবেশ করতে চাই। আর যখন হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কথা হয় তখন মূল্যবান জিনিস, এমন কি ভাল ভাল কথাও তাতে সাহায্য না করে বাধা সৃষ্টি করে। আমি কাজের জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে আছি, কথার জন্য নয়। সোনার অথবা রূপার ভারী ভারী থালার চেয়ে স্থূল খদ্দরের কাজ আমার কাছে প্রিয়তর।[২৫]

## বাঙালীরা পাগল

গুজরাট মনে করে যে, অন্য প্রদেশের তুলনায় সে আমার দেহের প্রতি বেশি যত্ন নিতে পারে। বাংলা দেশ অবশ্যই অন্য রকম চিন্তা করে। বাংলা দেশ বলে যে, আমাকে প্রথম শ্রেণীর সেলুনে ভ্রমণ করতেই হবে। আমাকে প্রথম শ্রেণীর সেলুনে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্পর্কে সতীশবাবুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, ফরিদপুরের অভ্যর্থনা সমিতি এর জন্য দায়ী। তিনি আরও যেসব কারণ দেখিয়েছিলেন তা হল, রাত্রিতে গাড়িবদল এড়াবার জন্য সারা পথের

উপযোগী সেলুন বন্দোবস্ত, সারা পথে যাবার উপযোগী কামরাগুলি প্রথম শ্রেণীর হয়ে থাকে আর রেল কর্তৃপক্ষ দয়া করে প্রথম শ্রেণীর আসনের জন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিয়েছিলেন। পাঠকেরা জেনে রাখুন যে, কামরাটির জন্ত দশটি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনের ভাড়া দিতে হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই সমস্তই আমার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। কেননা যতদিন আমি বাংলা দেশে আছি ততদিন উদ্যোক্তাদের ত্রুটির জন্ত কোন রকমেই যেন আমার স্বাস্থ্যকে বিপদগ্রস্ত করা না হয়।

আমার নিজের মত হল যে, এইভাবে আমাকে নরম তুলায় জড়িয়ে রাখলে আমার ভ্রমণের দ্বারা কোন ভাল ফল হবে না। লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ যেমনভাবে থাকে অথবা ভ্রমণ করে আমাকেও তেমনিভাবেই থাকতে হবে, নতুবা জনগণের স্বার্থে আমাকে ভ্রমণ বন্ধ করে দিতে হবে। সিমলার অগম্য উচ্চতা থেকে ভাইসরয় যেমনভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় শাসন করে থাকেন, দ্বিগুণ এমন কি পাঁচগুণ প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আমি আমার বাণী অধিকতর কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে পারব না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। একক দ্বিতীয় শ্রেণীকে তবু সহ্য করা যেতে পারে। জাঁকজমকে ভরা প্রথম শ্রেণীর কামরায় দেখে গরীবেরা আমাকে তাদের একজন বলে মনে করতে পারে না। তাই যখনই তারা এর কাছে এসেছে তখনই ভীতভাবে এর দিকে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে আমারও কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছে। আমার দেহ হয়ত এতে কিছু আরাম পেয়েছিল কিন্তু আমার আত্মার কষ্ট হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, গরীবদের সঙ্গে সমানভাবে কষ্ট যদি আমরা ভোগ না করি তবে তাদের হৃদয়ে আমরা প্রবেশ করতে পারব না। আমি সর্বদা জানি যে, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করার জন্ত যখন আমি দুর্বল হয়েছি অথবা দুর্বল হয়েছি বলে মনে করেছি তখনই গরীবদের সেবা করার যোগ্যতা আমার অর্ধেক কমে গিয়েছে। আমি যদি কখন তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ না করে থাকতাম তাহলে আমি গরীবের অনুভূতি এবং নিজেকে তাদেরই একজন বলে অনুভব করতে পারতাম না। আমার অভিজ্ঞতা-সমূহের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণকে আমি সব চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করি। সেইজন্ত আমি মনে করি যে, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর উপরে আমার কখনই যাওয়া উচিত নয়। আমার বন্ধুরাও যদি ভ্রমণের মাধ্যমে আমাকে দিয়ে দেশের সেবা করাতে চান তবে তাঁরা যেন আমাকে উচ্চতর শ্রেণীতে না নিয়ে

যান অথবা তার জন্ত আমাকে প্রলুব্ধ না করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতেও যখন আমি অক্ষম হয়ে পড়ব তখন ভ্রমণের মাধ্যমে সেবা আমাকে অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। ঈশ্বর সোজাসুজি নোটিশ দেন না। তিনি সংকেত পাঠান, যারা ইচ্ছা করে তারা তা পড়তে পারে। অভ্যর্থনা সমিতি বর্তমানে যেসব ব্যবস্থা করেছেন সেগুলি আমি একেবারে ভেঙে দিতে চাইছি না ; কিন্তু বন্ধুদের আমি এখনই সাবধান করে দিচ্ছি যে, ভালবাসার বাড়াবাড়ির দ্বারা তাঁরা যেন আমার শ্বাসরুদ্ধ করে না দেন। যথোচিত মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সব রকমের সাবধানতা তাঁরা অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের জন্তও তাঁদের কিছু ছেড়ে দিতে হবে। ঈশ্বর যদি না চান যে, আমি ভ্রমণ করি তবে কোন ব্যবস্থাই আমাকে বাঁচাতে পারবে না ; আর যতক্ষণ তিনি চাইবেন যে, ভ্রমণের মাধ্যমে আমি সেবা করে যাই ততক্ষণ সাবধানতার কোন অভাব আমাকে বিনাশ করতে পারবে না। আমি তাঁদের এই বিষয়েও নিশ্চিন্ত করতে পারি যে, দেহের যেসব চাহিদাকে আমি প্রয়োজন বলে মনে করি সেগুলি সম্পর্কে আমি খুবই সচেতন। কৃতজ্ঞচিত্তে এই কথাও আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলা দেশ আমার প্রতি যে-ভালবাসা দেখিয়েছে এত ভালবাসা অন্ত কোন প্রদেশ, এমন কি গুজরাটও দেখায়নি। আমার বড় সৌভাগ্য যে, কোন প্রদেশেই আমি নিজেকে বিদেশী বলে মনে করিনি, বাংলা দেশে তো তা কখনই মনে হয়নি।

অভ্যর্থনা সমিতি আমার সুখ-সুবিধার জন্ত যদিও আনুক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তবু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্ত রকম। ফরিদপুর থেকে যাবার সময় আমার সারারাত্রিব্যাপী বিশ্রাম প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই দর্শনপ্রার্থী জনতার চিৎকারে বিঘ্নিত হয়েছে। আমার সঙ্গীরা এই অন্ধ ভক্তদের শান্ত করতে পারেননি। আমার ক্লান্ত শরীরের বিশ্রামের জন্ত তাঁদের সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল। 'আলো', 'আলো'—অমুকের জয় এই সব চিৎকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করেছিল এবং ঘুমন্ত যাত্রীদের বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। জনতা তাদের কথাও চিন্তা করেনি। আমি কঠিন-হৃদয়ে বসে-ছিলাম। মহাত্মা-নাম হারাবার ভয় থাকা সত্ত্বেও আমি আমার বিছানা থেকে উঠিনি। এই জাতীয় বন্য ও অর্থহীন ভালবাসাকে সহায়তা করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করেছিলাম। আমাদের যে প্রচণ্ড শৃঙ্খলার প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তির প্রতি এবং দেশের প্রতি আমাদের প্রীতিকে

উন্নত করতে হবে। তাকে যদি সংযত করা না যায় তবে সেই প্রীতির অপচয় হবে এবং হয়ত বা কখন অনিচ্ছাকৃত বিস্ফোরণের ফলে ক্ষতিকরও হয়ে যাবে। প্রত্যেক গ্রামে প্রভাবশালী ও বুদ্ধিমান কর্মী থাকবে যারা জনগণকে তাদের ভালবাসাকে দেশের প্রকৃত শক্তিতে রূপান্তরিত করতে উদ্বোধিত করবে। 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। প্রকৃত ভালবাসা যেন মধ্যরাত্রের চিৎকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না হয়ে দেশের শান্ত কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। মধ্যবর্তী স্টেশনের লোকেরা আমাকে অথবা অন্য কোন শ্রদ্ধার পাত্রকে দেখতে পাবে না। কিন্তু সকলেই তাদের সাক্ষাৎকারের চেষ্টাকে অলসতা দূর করার কাজে এবং অধিকতর কাজ করায় লাগাতে পারে।

বাঙালীরা তো পাগল। দেশবন্ধু তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি জাতির কাজে ট্রাস্টীর হাতে দান করেছেন। আমি জানি যে, বাড়িটির জন্য কিছু দায় আছে। কিন্তু দেশবন্ধু যদি ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তাঁর বিরাট আইন-ব্যবসায়ে ফিরে গিয়ে এক বছরের মধ্যেই এই দায় চুকিয়ে দিতে পারতেন। আমি দুঃখবোধ এবং অশ্রুমোচন না করে এই বিশাল অট্টালিকায় প্রবেশ করতে পারিনি। একজন দার্শনিক হিসাবে আমি জানি যে, বাড়িটি ত্যাগ করে তিনি বোঝা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীতে বসবাসকারীরূপে এটিও আমি জানি যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রকম বোঝা বহন করতে খুশীই হবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিশাল বাড়িতে থাকতে আনন্দবোধ করবে। সেইজন্য যখন আমি এই বাড়িতে প্রবেশ করি এবং বিশেষ করে মাত্র কয়েকদিন আগেও যে ঘরটিতে এই মহান দেশসেবক থাকতেন সেই ঘরে উপস্থিত হই তখন আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি। কিন্তু সেইটুকুই তাঁর পাগলামির সীমা নয়। তিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছিল। খুব কষ্ট করে তিনি তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তবু তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন—এবং তা করেছিলেন লোকের হাততালির জন্য নয়, দেশের সেবা করার উদ্দেশ্যে। সাবজেক্ট কমিটির সভায় শেষ পর্যন্ত তিনি বসেছিলেন। তাঁর কাজের স্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা যাঁরা অনুভব করছিলেন না তাঁদের তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন।

আর তিনিই একমাত্র পাগল বাঙালী নন। মহান আচার্য রায় রয়েছেন। সম্পূর্ণ আত্মভোলা হয়ে তিনি মঞ্চের উপরেই একবার এই পা আবার অন্য পা

দুলিয়ে নৃত্য করে থাকেন। অপ্রয়োজনীয় হলেও গোটা বাঙালী শ্রোতার কাছে তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করে দেন। অন্যেরা তাঁর সম্বন্ধে কী ভাবছে সে কথা তিনি গ্রাহ্যই করেন না। তিনি তাঁর নিজের কথাতেই মগ্ন হয়ে থাকেন। যারা তাঁকে জানে না তারা বুঝতেই পারে না যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি একজন। এখনও তিনি তাঁর বিজ্ঞান কলেজকে ভালবাসেন। তিনিই এটিকে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তিনি খাদি-পাগল। তিনি তাঁর ভালবাসাকে বিজ্ঞান ও খদ্দরের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। অথবা তিনি হয়ত মনে করেন যে, খাদি হল বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রকৃত উৎপাদন। সে যাই হোক, প্রকৃতির গোপন তথ্য বার করবার জন্য সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তিনি যখন চরখা চালাতে বসেন তখন তাঁকে পাগল না বলে পারা যায় না। আমি এই রকম অসংখ্য পাগল বাঙালীর নাম বলতে পারি। কিন্তু পাঠকদের এই দুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ততেই সন্তুষ্ট হতে হবে।[২৬]

### বাঙালীর বাধা

যতই আমি বাঙালীর জীবন লক্ষ্য করছি ততই বিভিন্ন দিকে তার বিশাল সম্ভাবনার বিষয়টি আমি উপলব্ধি করতে পারছি। আধুনিককালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি বাংলা দেশ দিয়েছে। দিয়েছে দুজন বিজ্ঞানী যাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। এখানে গায়কেরা রয়েছেন যাঁদের হারানো শক্ত। এখানে শিল্পী রয়েছেন যাঁদের ছবি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হয়েছে। আত্মত্যাগের সম্পদ এর রয়েছে, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন কি মহারাষ্ট্রও করতে পারে না। বিপ্লবী বন্ধুর উত্তরে আমি যখন লিখেছিলাম তখন কর্মীরা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন নিয়ে ম্যালেরিয়াপীড়িত জেলাগুলিতে জনগণের মধ্যে যে কাজ করছিলেন তা নিজের চোখে দেখিনি। আমি ঠিক জানতাম না যে, চরম দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে যুবকেরা বাস করছেন এবং যে-ব্যাধি উপযুক্ত পুষ্টির অথবা স্বাস্থ্যকর বায়ু পরিবর্তনের অভাবে ঘটে থাকে তাকেই স্বাগত করছেন। এখন আমি সেই সব জায়গা এবং সেই সব মানুষ দেখেছি। বাংলা দেশের পুরুষ ও নারী উভয়েরই সুতাকাটার বিশেষ প্রতিভা আছে। আমি চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, মহাজনহাট, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ঢাকা এবং ময়মনসিং-এ এঁদের সুতা কাটতে দেখেছি। প্রত্যেক জায়গাতেই আমি লক্ষ্য করেছি যে, তাঁদের কাজ ভারতবর্ষের অন্যত্র আমি যা দেখেছি তার চেয়ে মোটামুটিভাবে

ভাল। সূতাকাটা এঁদের বৃত্তি নয়, এমন কি এঁদের সূতাকাটার অভ্যাসও নেই, অনেক জায়গাতেই এঁরা আমাকে খুশী করবার জন্ত অথবা আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত সূতা কাটতে এসেছিলেন, অবশ্ত যদি না আমাকে উপহাস করার জন্ত তাঁরা এসে থাকেন। তবু তাঁদের কাজকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু প্রয়োগ-বিভার অভাবে এই প্রতিভা এবং আত্মত্যাগ মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ চরখার প্রতিই যত্ন নেওয়া হয়নি। হয় সেগুলি ঠিকমত কাজ করছিল না, নয়ত সেগুলিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে তাদের কাজ কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল এবং টেকোগুলির আবর্ত সর্বাধিক না হয়ে ন্যূনতম হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের উৎপাদনও হয়েছিল কম। এই রকম এক চরখায় আমি পুরা ত্রিশ মিনিট কাজ করেছিলাম। আমি প্রতি আধ ঘণ্টায় ১৩০ গজ করে সূতা কাটি। এই বাংলা-চরখার সূতার পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ গজ। একটি ভাল চরখায় এর তিনগুণ সূতা কাটা যায়। প্রতি ঘণ্টায় উপার্জন তিনগুণ করা কোন ব্যক্তির কাছে অথবা জাতির কাছে কম লাভজনক নয়। বাংলা দেশে খুব ভাল এবং সুলভ চরখা আছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের কাছে এক সুন্দর চরখা আছে। এতে ভাল সূতা কাটা যায় এবং এর দাম দু টাকা আট আনা। আমি চাই যে, বাংলা দেশ প্রতিষ্ঠানের মডেলটি গ্রহণ করুক। যেসব জায়গায় চরখা চলে সেইসব জায়গায় একজন বিশেষজ্ঞের ঘুরে বেড়ানো দরকার। তিনি চরখাগুলি ঠিক করে দেবেন এবং যেগুলিকে সারানো যাবে না সেগুলিকে ফেলে দেবেন। যে চরখকে এই বিশেষজ্ঞ সুপারিশ করবেন সেটিকে তিনি চালিয়ে দেখাবেন। যেসব লোক এই কাজ জানেন এবং অন্ত সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই কাজে পূর্ণ সময় নিয়োগ করেন তাঁদের পক্ষেই এই কাজ করা সম্ভব। খাদি প্রতিষ্ঠান এই রকম একটি সংস্থা এবং সতীশবাবু, যিনি চরখার জন্ত সব কাজ ছেড়ে দিয়েছেন তিনি এই রকম একজন বিশেষজ্ঞ। তারপর, মিশ্রিত বা আধা খদ্দরের সঙ্গে শুদ্ধ খদ্দরের ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা সেখানে রয়েছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবের কোন মূল্য যদি কংগ্রেস কর্মীদের উপর থাকে তবে তাঁরা মিশ্রিত খাদির সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে পারেন না। সুতরাং আমি আশা করি যে, যেসব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আধা খদ্দর প্রস্তুত করেন অথবা সমর্থন করেন তাঁরা তা বন্ধ করে দেবেন। সাধারণত আধা খদ্দরে টানার সূতা মিলজাত হয়ে থাকে। কাপড়ের গুণ টানা-সূতা দিয়েই যাচাই করা হয়। সুতরাং টানায়

জন্য যদি আমরা মিলজাত সুতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তবে আমরা কখনই হাতে কাটা সুতার উন্নতি করতে পারব না। ফলে হাতেকাটা সুতাকে আমরা কখনই কুটির-শিল্পরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কাজেও আমরা সফল হতে পারব না।[২৭]

## বুদ্ধিমান বাঙালার প্রশ্ন

বাংলা দেশে ভ্রমণের সময় বুদ্ধিমান বাঙালীদের কাছ থেকে আমি চরখার বিরুদ্ধে সব রকমের নিপুণ যুক্তির সম্মুখীন হয়েছি। এই পত্রিকায় সেইগুলির অধিকাংশই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পাঠকেরা এই সব লেখায় যা পাঠ করেন তা মনে রাখেন না সেই হেতু সাংবাদিকদের পক্ষে বেশ কিছু পরে পরে সেই সব কথার পুনরুক্তি করা নিরাপদ। এই রকম একজন বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি কি রেলগাড়ির স্থানে দেশীয় গরুর গাড়ির পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই, আর তা যদি না চাই তবে মিলের বদলে চরখাকে বসাবার আশা আমি করি কেন! আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, গরুর গাড়িকে আমি রেলের স্থানাভিষিক্ত করতে চাই না, কেননা তা চাইলেও আমি তা পারব না। ত্রিশ কোটি গরুর গাড়ি দূরত্বের অপসারণ করতে পারে না। কিন্তু চরখাকে আমি মিলের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি। কেননা রেল গতির সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু মিলের সম্পর্ক উৎপাদনের সঙ্গে। ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে কাজ করবার লোকের সংখ্যা বেশি সেখানে চরখা সহজেই মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, একজন গ্রামবাসী যদি তার শ্রমের হিসাব না করে তবে সে মিলের চেয়েও সস্তায় তার নিজের মত যথেষ্ট কাপড় প্রস্তুত করে নিতে পারে। আর তার শ্রমের হিসাব করার প্রয়োজনও নেই, কেননা সুতাকাটা, এমন কি তাঁত বোনাও সে তার অবসর সময়ে করবে। মিথ্যা অথবা অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যগুলি কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তা লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে, একদিকে মিল ও রেলগাড়ি এবং অন্য দিকে চরখা ও গরুর গাড়ির মধ্যে পার্থক্য এতই দৃষ্টিগোচর যে তাদের সম্পর্কে তুলনা করা উচিত হয়নি। কিন্তু বন্ধুটি হয়ত মনে করছিলেন যে, সম্ভাব্য সব পরিস্থিতিতেই আমি যন্ত্রের বিরোধী। যদিও আমি বার বার উল্লেখ করেছি যে, 'হিন্দ স্বরাজ' বইতে আমি যেসব মৌলিক সমস্যা উত্থাপন

করেছিলাম তা নিয়ে আমি কাজ করছি না। তবু রেলওয়ে সম্পর্কে আমার আপত্তির কথা হয়ত তাঁর মনে ছিল।[২৮]

## বাংলা দেশের স্বরাজীরা

কংগ্রেসের লোকেরা অর্থাৎ স্বরাজ পার্টির লোকেরা বাংলা দেশে চরখার বিনাশ করেছেন, এই অভিযোগ আমি শুনেছি। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রথমত, বাংলা দেশে চরখার বিনাশ হয়নি। দ্বিতীয়ত, চরখার আন্দোলনে যেটুকু অন্তরায়ও সৃষ্টি হয়েছে তার জন্ম অন্য পার্টির লোকেদের চেয়ে স্বরাজ পার্টির লোকেরা বেশি দায়ী নয়। আমি এখানে স্বীকার করছি যে, প্রত্যেক জায়গাতেই চরখা প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত করতে স্বরাজীরা সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা এর সংগঠনে এবং সূতা কাটাতেও যোগদান করেছেন। কোন কোন স্বরাজী তাঁদের পুরা পরিবারসহ এই কাজে সম্পূর্ণরূপে উৎসাহী। ফরিদপুরে আমি যাঁর অতিথি ছিলাম তাঁর সম্পর্কে আমি আগেই লিখেছি। তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা চরখার ভক্ত। তাঁরা তাঁদের সংসারে খদ্দরের জন্য যত সূতা লাগে তা উৎপাদন করেন। বসন্তকুমার মজুমদারের স্ত্রীও খুব উৎসাহী। কুমিল্লায় তিনি এক বিরাট প্রদর্শনী সংগঠিত করেছিলেন। দিনাজপুরের যোগেশবাবুও নিয়মিত সূতা কাটেন। তাঁর সমগ্র পরিবার দক্ষতার সঙ্গে সূতা কাটেন, তা দেখতেও ভাল লাগে। আমি এরকম অনেক ঘটনার কথা বলতে পারি। আসল কথা হল যে, আমি যেমন চরখার উপরেই আমার সমস্ত বিশ্বাস স্থাপন করেছি স্বরাজীরা তা করেননি। এ সম্পর্কে কোন গোপনতাও তাঁরা রাখেননি। তাঁরা যদি গঠনকর্ম-পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে এবং একমাত্র বলে বিশ্বাস করতেন তবে কাউন্সিলে প্রবেশ করতেন না। তাঁদের অবস্থা অবিশ্বাস্য রকম সহজ। চরখাসহ গঠনকর্ম-পদ্ধতির প্রতি তাঁদের আস্থা আছে। এও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এছাড়া স্বরাজ অর্জন করা যাবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলি দখল করে নেওয়া প্রয়োজন, যেখান থেকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে। এ এক সৎ মনোভাব যার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উঠতে পারে না। যাই হোক না কেন, আমার মতে বাংলা দেশের স্বরাজীরা তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে আচরণ করছেন।[২৯]

## নৈতিক অবনতি

স্বরাজীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা যখন করছি তখন তাঁদের বিরুদ্ধে যে নৈতিক অবনতির অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই। কয়েকজন জননেতা আমার কাছে এসেছিলেন এবং স্বরাজীদের হাতে ক্রীড়নক হওয়া সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ করার জন্য তাঁরা আমাকে আমার প্রভাব বিস্তার করতে বলেন। আমি ভদ্রলোকদের বলি যে, তাঁরা যে-অভিযোগগুলি উত্থাপন করেছেন সেগুলি বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। আমি তাঁদের একথাও বলি যে, তাঁরা যদি এরূপ ঘটনাগুলি আমাকে জানান এবং সেগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন তবে আমি আনন্দের সঙ্গে সেগুলির অনুসন্ধান করব এবং সত্য প্রমাণিত হলে ঐ দলের প্রকাশ্য নিন্দা করতে দ্বিধা করব না। আমি তাঁদের একথাও বলি যে, এইসব অভিযোগ আমি আগেও শুনেছি এবং সেগুলি যখন আমি দেশবন্ধু দাশের গোচরে আনি তখন তিনি আমাকে জানান যে, এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই এবং আমার সংবাদদাতারা যদি যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁদের নাম ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলি জানান তবে তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সেগুলির অনুসন্ধান করবেন। ভদ্রলোকেরা আমাকে বলেন যে, নৈতিক অবনতিগুলি সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে কিন্তু আইনত সেগুলির প্রমাণ করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। আমি তাঁদের বলি যে, এক্ষেত্রে যা প্রমাণ করা যায় না তা বিশ্বাস না করার মধ্যপন্থা আমাদের অনুসরণ করা উচিত। আমরা যদি এই নিয়ম অনুসরণ না করি তবে কোন জননেতারই খ্যাতি সুরক্ষিত থাকবে না।

এই সাক্ষাতের পর অভিযোগগুলির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। যাই হোক, চাঁদপুরে হরদয়ালবাবু দ্বিগুণ প্রচণ্ডতার সঙ্গে এই অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তর করেছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রকাশ্য নিন্দাকে আমি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি। তিনিও আমার কাছে তা আশা করেন না। যদিও তিনি এবং আমি একই গোষ্ঠীর লোক তবু জননেতা ও তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। আমার অসহযোগের পিছনে প্রবলতম বিরোধীর সঙ্গেও সামান্যতম অছিলাতেই সহযোগিতার তীব্র ইচ্ছা থাকে। আমি নিজে এক জন খুবই ত্রুটিপূর্ণ নশ্বর মানুষ। আমি প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের করুণা বাঞ্ছা করি, আমার কাছে কোন মানুষই উদ্ধারের

বাইরে নয়। হরদয়ালবাবুর অসহযোগের পিছনে আছে তীব্র অবিশ্বাস এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফিরে আসার অনিচ্ছা। সহযোগিতার জন্ত তিনি চান শক্ত প্রমাণ আর আমার কাছে সামান্ত ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

কিন্তু এবার এক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে এই অভিযোগগুলি উত্থিত হয়েছিল। আমি আমার কান খাড়া করে শুনেছিলাম এবং একে কঠিনভাবে গ্রহণ করেছিলাম। অল্পস্বল্প অনুসন্ধানও আমি করেছি। কিন্তু কলিকাতা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ-পার্টির চীফ হুইপ বাবু নলিনী সরকার আমাকে এ থেকে উদ্ধার করেন। বাবু নির্মলচন্দ্র, বাবু কিরণশঙ্কর রায় এবং বাবু হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমার কাছে এসে আমি জিজ্ঞেস না করতেই জানান যে, যে কোন ব্যাপারেই স্বরাজ পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন থাকলে তাঁরা উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমি তখন যেসব অভিযোগ আমি শুনেছি তা তাঁদের বলি। তাঁরা তাঁদের সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা আমাকে আরও অনুসন্ধান করতে বলেন, এমন কি তাঁদের খাতাপত্রও পরীক্ষা করতে বলেন। আমি তাঁদের বলি যে, অভিযোগগুলি সম্পর্কে আরও প্রামাণিক তথ্য না পেলে আমার পক্ষে তাঁদের খাতাপত্র পরীক্ষা করা হয়ত সম্ভব হবে না। বর্তমানে অসমর্থিত অভিযোগ ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। তাঁরা আমাকে এই আশ্বাস দেন যে, উৎকোচ ও নৈতিক ব্যভিচারের অভিযোগে বিন্দুমাত্র সত্য নেই।

যাঁরা অভিযোগ উত্থাপন করতে প্রস্তুত তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন যে, তাঁদের বিপক্ষদের সম্পর্কে যে-গল্প তাঁরা শুনবেন সেগুলি বিশ্বাস করার বিষয়ে তাঁরা যেন সতর্ক থাকেন। আমরা কি জানি না যে, গভর্নমেন্ট তার সংবাদ-দাতাদের দ্বারা হীনভাবে বিক্রিত হয়ে গিয়েছে? তাঁরা কি জানেন না যে, এমন কি রানাডে ও গোখেলকেও দীর্ঘদিন ধরে হীনতার মধ্যে রাখা হয়েছিল! তাঁরা কি জানেন না যে, স্যার ফিরোজ শা, এমন কি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও কুৎসা রটনা করা হয়েছিল। এমন কি গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যানও * অপবাদের বাইরে যেতে পারেননি। লণ্ডনে একজন ভদ্রলোক তাঁর সম্পর্কে এমন বিশদ বর্ণনা করেন যে, শেষ পর্যন্ত এই মহান দেশপ্রেমী, যাঁকে আমি পূজা করতাম তাঁর কাছে আমাকে যেতে হয়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে

* দাদাভাই নৌরজী

আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হই। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসি। তাঁর প্রসন্ন মুখের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম এবং তাঁর পক্ষ সমর্থন করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, যে-কথা শোনা গিয়েছে তা সত্য হতে পারে কিনা। এই ঘটনা আমার আজও মনে আছে। তাঁর অফিস ছিল ব্রিষ্টলে। তিনি চিলেকোঠায় বসেছিলেন। এ দৃশ্য আমি কখনও ভুলব না। আমি এই কথা জেনেই এসেছিলাম যে, যে-অভিযোগগুলি তাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছে তা সাধারণ কুৎসা ছাড়া কিছু নয়। আলি ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁদের আমি নৈতিক ব্যভিচার ও বিশ্বাসঘাতকতার উর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করি তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থিত 'স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসভঙ্গে'র অভিযোগগুলি যদি আমি বিশ্বাস করতাম তাহলে কী হত! আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট বিভিন্নতা রয়েছে। সেই বিভেদকে বাড়াবার জন্য বিপক্ষদের বিরুদ্ধে আনীত প্রত্যেক নীচতার অভিযোগ বিশ্বাস করার জন্য আমরা এক পায়ে খাড়া থাকি কেন? প্রকৃত মতের অমিলকে আমি সমর্থন করে থাকি। সৎ উদ্দেশ্য এবং স্বদেশ-প্রেমের মনোভাবের জন্য আমরা বিরোধীদের সেই সম্মান প্রদর্শন করব যা আমরা নিজেদের জন্য দাবি করে থাকি। স্বরাজীদের তথাকথিত নৈতিক অবনতির কথা বলেছিলেন এমন একজন ভদ্রলোক অকপটে একথা অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, বাংলা দেশে চিত্তরঞ্জন দাশ ছাড়া আর কোন নেতা নেই। যেখানে সবাই সেবা করতে চান সেখানে হিংসার কোন স্থান থাকতে পারে না। আমি বিশ্বাস করার নীতিতে আস্থাবান। বিশ্বাস থেকেই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবিশ্বাস তিক্তকর এবং পুতিগন্ধময়। বিশ্বাস যে করে সে পৃথিবীতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সুতরাং অহিংসাকে যাঁরা ধর্মরূপে মেনেছেন তাঁরা বিশ্বাসীকে অবিশ্বাস করা সম্পর্কে সতর্ক হোন। হিংসা থেকেই অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। অহিংসার পক্ষে বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কোন লোকের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি অবশ্যই বিশ্বাস করতে অস্বীকার করব; বিশেষত যতক্ষণ না আমি সঠিক প্রমাণ পাচ্ছি ততক্ষণ আমি আমার সম্মানিত সহকর্মীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু হরদয়ালবাবু বলবেন, "আপনি কি আমাদের চোখ ও কানের প্রমাণকে অবিশ্বাস করবেন?" আমি বলব, হাঁ এবং না। আমি এমন লোক জানি যাঁদের চোখ ও কান তাঁদের প্রতারিত করেছে। যা তাঁরা দেখতে বা শুনতে চেয়েছেন সেই জিনিসই

তাঁরা দেখেছেন এবং শুনেছেন। এক্ষেত্রে আমি বলব, 'দেশসেবার অপক্ষপাত প্রমাণ যখন আপনাদের কাছে রয়েছে তখন নিজেদের চোখ এবং কানকেও আপনারা বিশ্বাস করবেন না।' কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁরা দেখেছেন, শুনেছেন এবং জেনেছেন তবে সত্য অন্তরের কাছে বিদিত করতে সমর্থ হননি। বিশ্ব তাঁদের বিরুদ্ধে গেলেও তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসে অটুট থাকেন। তাঁদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, আমার মতন যারা ঠিক তাঁদের মত করে শুদ্ধ সত্যকে দেখতে পায় না তাদের প্রতি তাঁরা যেন একটু সহিষ্ণু হন। আমি এখন পর্যন্ত স্বরাজীদের বিরুদ্ধে আরোপিত নৈতিক অবনতির কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। আর যাঁরা বিপরীত কথা বিশ্বাস করেন তাঁরা যতক্ষণ না আমার বিশ্বাস উৎপাদন করাতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা যেন আমার প্রতি ধৈর্য ধারণ করেন।[৩০]

## হিন্দুধর্মে ব্রাহ্ম-সমাজের অবদান

[১৯২৮ সালের ২০শে আগষ্ট ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।]

এই মহান উপলক্ষে কিছু বলার যোগ্য বলে আমি নিজেকে মনে করি না। কিন্তু আমি এইজন্যই স্বীকৃত হয়েছি যে, স্বর্গত রমণভাইয়ের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতাম এবং শ্রীমতী বিদ্যাগৌরীকে আমি নিরস্ত করতে পারিনি। অনেক কারণেই আমি আজ কিছু বলার অযোগ্য। রাজা রামমোহন রায়ের লেখা অথবা তাঁর সম্পর্কে কোন লেখা আমি পড়িনি। তাঁর সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি তা তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে শোনা। ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসও আমি পড়িনি। আমাদের গ্রন্থাগারে রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে যে পুস্তিকা আছে অন্তত তা থেকেও কিছু পড়বার জন্য আজ আমি মরীয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তার জন্য আমি এক মুহূর্তও সময় ব্যয় করতে পারিনি। সুতরাং দোষস্খালন করার জন্য ভগবান আমাকে সঠিক কথা জুগিয়ে দেবেন এই প্রার্থনাতেই আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়েছে।

যদিও ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস পড়ার দাবি আমি করতে পারি না তবু বহু বছর ধরে ব্রাহ্ম-সমাজের লোকদের সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্কের দাবি আমি করতে পারি। এই পরিচয় প্রথম আমি যখন কলিকাতায় গিয়েছিলাম সেই ১৮৯৬ সাল থেকে হয়েছে। ১৯০১ সালে গোখেল এবং ডঃ পি. সি. রায়ের

মাধ্যমে বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি প্রায়ই সমাজের মন্দিরে যেতাম এবং স্বর্গত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ধর্মোপদেশ শুনতাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমার মধ্যে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুধর্মের মহান সেবা করেছে এবং ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজকে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেছে। আমি সব সময়েই মনে করেছি যে, এই আন্দোলন মূলত শিক্ষিত সমাজের জন্য অভীপ্সিত। যদিও ভারতবর্ষে কখন কখন ধর্ম কুসংস্কার, অন্ধ বাহ্যানুষ্ঠান এবং মূর্ছাগ্রস্তের আকার ধারণ করেছে তবু ভারতবর্ষে কোন মানুষ বেশিদিন অবিশ্বাসী থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষিত মানুষের বিশ্বাস বিপন্ন হয়েছিল এবং তা থেকে উদ্ধার করেছিলেন রামমোহন রায়। আমি শুনেছি যে, তিনি ক্রিশ্চান মিশনারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাকা সাহেব আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি পার্শিয়ান ও আরবী ভাষায় গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও সর্বজনীনত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি হিন্দুধর্মের এবং বিশেষ করে বৈদিক ধর্মের গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তারপরে খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের মূল নীতিগুলির দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি দেখেছিলেন যে, কুসংস্কারের আগাছায় ভরা হিন্দুধর্মকে মুক্ত করতে হলে এক নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত করা ছাড়া তাঁর কোন পথ নেই। হিন্দুধর্মের নামে পশুবলি এবং সামাজিক অন্যায় বেড়ে চলেছিল। শিক্ষিত শ্রেণী তা কি করে সহ্য করবে? নিজে এই অন্যায় থেকে বিরত হয়ে রামমোহন রায় সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সংস্কারক। তিনি তাঁর অন্তরের আগুনকে ছাই-চাপা দিয়ে রাখতে পারেননি, জনসমক্ষে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি অনুগামী সংগ্রহ করেছিলেন এবং ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কিন্তু এই আন্দোলনও নিস্তেজ হয়ে যেত যদি না মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একজন আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন মানুষ এতে যোগ দিতেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাসকার বাংলা দেশের, ভারতবর্ষের, এমন কি বিশ্বের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ঠাকুর পরিবারের অবদানের হিসাব নিরূপণ করবেন। এই দিকে রবীন্দ্রনাথের অবদান বিশাল। যারা উপত্যকায় বাস করে তারা



পাশে :
গান্ধীজী
ও
রবীন্দ্রনাথ




কালীঘাট শ্মশানে অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতি সৌধের ভিত্তি স্থাপনা করছেন গান্ধীজী

যেমন তাদের আবাস-স্থানের উচ্চতা অনুভব করতে পারে না আমরাও তেমনি সঠিকভাবে এই অবদানের মূল্য নিরূপণ করতে পারি না। আর ঠাকুর পরিবারের লোকেরা ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ যুক্তিকে উদার করেছিলেন এবং বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট অবকাশ রেখেছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অথবা বৈদিক ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে বলে একবার সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মহর্ষির তপস্যা এবং প্রজ্ঞা ব্রাহ্ম-সমাজকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করেছিল। তাঁর জন্যই সমাজ হিন্দু ধর্মের অঙ্গ হয়ে থেকে যায়।

ব্রাহ্ম-সমাজের সমর্থকদের সংখ্যা দিয়ে তার অবদানের বিচার করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মদের সংখ্যা কম, কিন্তু তাঁদের প্রভাব বিরাট এবং সুন্দর। হিন্দু ধর্মকে উদার এবং যুক্তিসঙ্গত করার মধ্যেই ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা নিহিত। ব্রাহ্ম-সমাজ সব সময়েই অন্য মত এবং অন্য আন্দোলনের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব অনুশীলন করে এসেছে, ধর্মের উৎসকে পবিত্র রাখতে এবং পরম ব্রহ্মের শুদ্ধ উপাসনার আদর্শকে অবিচল রাখতে সমাজ চেষ্টা করেছে।

ব্রাহ্ম-সমাজের সমালোচনা করার কিছু যে নেই তা নয়, কিন্তু তা করার এটি উপযুক্ত সময় নয়। আমি চাই ব্রাহ্ম-সমাজের যা ভাল তা আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে। এই অনুষ্ঠান আপনাদের মধ্যে ধর্মের প্রবৃত্তি জাগ্রত করুক। প্রকৃত ধর্ম সংকীর্ণ মতবাদ নয়। ধর্ম বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম হল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বরীয় সত্তার মধ্যে অবস্থান। ধর্মের অর্থ ভবিষ্যৎ জীবন, সত্য এবং অহিংসার প্রতি বিশ্বাস। আজকাল আত্মার এই গুণাবলীর প্রতি একরকম অনীহা রয়েছে। আমাদের মন্দিরগুলি এখন যেন সাধারণ ও অজ্ঞ মানুষদের জন্যই রয়েছে। ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দিরে অল্প লোকই গিয়ে থাকেন। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা এইদিকে সংস্কারের কাজ গ্রহণ করুন।[৩১]

সন্ত্রাসবাদীদের প্রসঙ্গে

## দুষ্ট পদ্ধতি

গত সপ্তাহ অবিমিশ্র আনন্দের সপ্তাহ ছিল না। এই সময় কলকাতায় এবং করাচীতে হাঙ্গামা হয়েছে। এখন আবার চট্টগ্রাম থেকে দুঃখজনক খবর এসে পৌচেছে। দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র দেশে অহিংসার হৃদয়গ্রাহী প্রদর্শন হওয়া সত্ত্বেও বাতাসে হিংসা রয়েছে এবং শহরগুলি হয়েছে তার ভাণ্ডার।

কলকাতা এবং করাচীকে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করা যেতে পারে। প্রথম ছুটিকে সাময়িক বিস্ফোরণ বলে মনে হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের পিছনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে বলে মনে হয়। সে যাই থাক, সেগুলি খুবই দুঃখজনক। যে-আন্দোলন অবিশ্বাস্যরূপে ভাল এবং প্রতিদিন নতুন নতুন গতি লাভ করছে, চট্টগ্রামের ঘটনা তার প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। যাঁরা হিংসায় বিশ্বাস করেন তাঁদের আমি কেবল এই আবেদন করতে পারি যে, তাঁরা যেন অহিংসার অভিব্যক্তির গতিতে বাধা সৃষ্টি না করেন। তাঁরা এই আবেদন শুনুন অথবা নাই শুনুন, এই আন্দোলন এগিয়ে যাবেই। হিংসা স্বাধীনতার প্রগতিকে অবশ্যই বাধা দেবে। কিভাবে এই বাধা হবে তা প্রদর্শন করতে আমি অক্ষম। যাঁরা এই সংগ্রামের পর বেঁচে থাকবেন, তাঁরা তা দেখতে পাবেন।[৩২]

## আমার বিশ্বাস

[ ১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত করাচী কংগ্রেসে পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী শহীদ ভগৎ সিং সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। ফলে একজন বাঙালী পত্রলেখক গান্ধীজীকে অভিযোগ করেন যে, ভগৎ সিং-এর সময় তিনি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন একই উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গকারী বাঙালী শহীদ গোপীনাথ সাহার সময় তিনি সেই আগ্রহ দেখাননি। এর উল্লেখ করে গান্ধীজী যা লিখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উধৃত করা হল। ]

যে কোন বাঙালী যুবকের সম্পর্কে আমার মনোযোগকে আমি যদি আকৃষ্ট করতে পারতাম এবং তাঁদের বিশ্বাসমত নিজের মধ্যে সেই প্রভাব ধারণ করতে পারতাম তবে আমি সমান আগ্রহ নিয়ে তাঁদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কোন রকম প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব আমার মধ্যে থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। পাঞ্জাব আমার কাছে যেমন প্রিয়, বাংলা দেশও তেমনি প্রিয়। যৌবনে বাংলা দেশের কাছ থেকে আমি যে প্রেরণা পেয়েছিলাম তার জন্য এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। একথা সত্য যে, গোপীনাথ সাহা সম্পর্কীত প্রস্তাবে কোথায় জোর দেওয়া হবে তা নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার মত-পার্থক্য হয়েছিল।

গোপীনাথ সাহা সম্পর্কে আমার প্রস্তাবের সঙ্গে করাচী প্রস্তাবের মূলগত কোন পার্থক্য আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু পাঠকদের জানা উচিত যে, আমাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক দেশবন্ধু এবং আমার মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব ছিল। বস্তুত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষের দিকে আদর্শের ক্ষেত্রে এবং সেই আদর্শকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসেছিলাম।

সুতরাং বাংলা দেশে আমার বিরুদ্ধে কোন গোপন প্রচার চলেছে দেখতে পেলে আমি খুবই দুঃখিত হব। বাংলা দেশে আমার অনেক মূল্যবান সহকর্মী আছেন। আমি চাই যে, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। বাংলা দেশের যুবকদের সহযোগিতার মূল্য আমি জানি। সেই সহযোগিতা আমি চাই, চাই তাঁদের জন্য, যে-দেশকে তাঁরা এত ভালবাসেন সেই দেশের জন্য। কিন্তু হায়, তাঁদের এই ভালবাসা কখন কখন অন্ধভাবে অনুসৃত হয়। নিজেদের ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা যেন একজন প্রকৃত বন্ধুর সেবা অস্বীকার না করেন। দেশের যুবকদের প্রতি যদি আমার কোন প্রভাব থাকে তবে সেই সম্পদকে আমি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের কাজে ব্যবহার করতে চাই। সুতরাং পত্র-লেখক আমাকে আমার অবস্থা বর্ণনা করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু বাংলা দেশের অথবা অন্য কোন প্রদেশের যুবকদের প্রতি আমি আমার প্রভাব বজায় রাখতে পারি বা না-ই পারি, আমি আমার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করবই। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের মুক্তি কেবল সত্য ও অহিংসার পথেই অর্জিত হতে পারে।[৩৩]

## নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড

বাংলায় সংঘটিত বিচারকের হত্যা অপরাধী ব্যক্তিদের পক্ষেও লজ্জাকর। বিচারকটি নিজের স্থানে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন। কলকাতা এবং অন্যত্র ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়কে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে যে আন্দোলন তার জন্য আমরা বিস্ময় বোধ করি না। যাদের পছন্দ করেন না তাদের হত্যা করার মধ্যে যে-যুবক তৃপ্তিলাভ করেন তিনি যতই স্বদেশ প্রেমের মনোভাব নিয়ে সেই হত্যা করুন না কেন, তার দ্বারা যে-উদ্দেশ্যকে তিনি সমর্থন করেন বলে দাবি করেন তাকে মোটেই এগিয়ে নিয়ে যান না। আর গোপন সমিতিগুলির দ্বারা সংগঠিত হত্যা নিকট প্রতিবেশীকে সন্দেহজনক ব্যক্তিতে পরিণত করে দেয়। বস্তুত একজন ইউরোপীয়ান সরকারী কর্মচারীর হত্যা সমগ্র ভারত-বর্ষের পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে।[৩৪]

### সন্ত্রাসবাদ ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

এই সভায় কিছু সময় নেবার ঝুঁকি নিয়েও আমি আমার কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। কেননা এখানে আমি ভিন্ন প্রকার যুক্তি উপস্থাপিত

করছি এবং আমি একেবারেই চাই না যে, আমাকে লোকে ভুল বুঝুক। একটি দৃষ্টান্ত আমি তুলে ধরছি। বাংলা দেশকে আমি আমার দৃষ্টান্তের জন্ম গ্রহণ করছি। কেননা ভারতবর্ষের যেসব প্রদেশ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে বাংলা তার মধ্যে অন্যতম। আমি জানি যে, বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদীদের একটি দল সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় জেনেছেন যে, এই সন্ত্রাসবাদী দলের প্রতি আমার কোন রকম সহানুভূতি থাকতে পারে না। পূর্বের মত আজও আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, একজন সংস্কারকের পক্ষে সন্ত্রাসবাদ হল নিকৃষ্টতম কাজ। ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদ আরও খারাপ এইজন্ম যে, ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেসব ভারতীয় যুবক ভাল কাজ মনে করে তাঁদের জীবন এইভাবে বিসর্জন দিচ্ছেন তাঁরা শুধুই তাঁদের জীবন দিচ্ছেন, দেশকে লক্ষ্যের পথে এক ইঞ্চিও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন না। আমার তো মনে হয় যে এই লক্ষ্য আমাদের সকলেরই এক।

এই বিশ্বাস আমার রয়েছে। তবু ধরে নেওয়া গেল তাঁরা আমাকে তর্কে পরাভূত করলেন। তাহলে বাংলা দেশ যদি স্বায়ত্তশাসন লাভই করে তবে সে কী করবে? বাংলা দেশ অর্থাৎ এই স্বশাসিত বাংলা দেশ নিশ্চয় সন্ত্রাসবাদীদের ভস্মীভূত করবে না, সে তাদের কাছে যাবে এবং তাদের পরিবর্তিত করবে। আমিও পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাদের কাছে যাব এবং বাংলা দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদকে মুছে ফেলব।

কিন্তু আমার মধ্যে যে-সত্য আছে তা আরও পরিষ্কার করে উপস্থাপিত করছি। বাংলা দেশ যদি স্বশাসন লাভ করে তবে সেই স্বায়ত্ত-শাসনই বাংলা থেকে সন্ত্রাসবাদকে দূর করে দেবে। কেননা এই সন্ত্রাসবাদীরা নির্বোধের মত মনে করেন যে, তাঁদের কর্মধারাই হল স্বাধীনতা লাভের সহজতম পথ। কিন্তু একবার স্বাধীনতা অর্জিত হলে সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে যাবে।

এমন অনেক যুবক আজ আছেন যাঁদের সম্পর্কে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। হাজারখানেক যুবক, যাদের বিচার হয়নি, যারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়নি, তাদের প্রত্যেককে কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কলকাতার মেয়র, বাংলা দেশের বিধানসভার সদস্য এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এখানে রয়েছেন। তিনি চট্টগ্রাম সম্পর্কে বাংলা

দেশের সব দলের সদস্যদের সই করা একটি বিবরণ আমার কাছে উপস্থিত করেছেন। এই বিবরণটি পড়লে চোখে জল আসে। কিন্তু তার সারকথা হল চট্টগ্রামে ব্যাক ও ট্যানের* চেয়েও নিকৃষ্টতর অবস্থা বিদ্যমান—আর ভারতবর্ষের মানচিত্রে চট্টগ্রামের স্থান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সম্প্রতি পতাকা-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে কলকাতায় সমস্ত সামরিক শক্তিকে একত্র করা হয়েছিল এবং শোভাযাত্রাটিকে কলকাতার দশটি রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কার অর্থে এটি করা হল এবং তা করা হল কেন? এতে কি সন্ত্রাসবাদীরা ভীত? আমি শপথ করে বলতে পারি যে, এতে সন্ত্রাসবাদীরা মোটেই ভীত হবেন না। তবে কি এর ফলে কংগ্রেসীরা আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেবে? তা তাঁরা করবেন না। কংগ্রেস এই কাজের জন্য অঙ্গীকৃত। যন্ত্রণাই হল তাঁদের বিজয়-প্রতীক। যে-কোন রকমের কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং এর দ্বারা তাঁরা ভীত হবেন না। এই প্রদর্শনী দেখে আমাদের ছেলেমেয়েরা হেসে উঠবে। আর আমাদের উদ্দেশ্য হল ছেলেমেদের দেখানো যে, এর দ্বারা তারা যেন আতঙ্কিত না হয়, পদাতিক সেনা, কামান, বিমানবাহিনী এবং অনুরূপ অন্য কিছু দেখে তারা যেন ভয়গ্রস্ত না হয়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আমার কী ধারণা তা আপনারা দেখেছেন। এই সমস্ত জিনিস তখন অসম্ভব হয়ে যাবে। বাংলায় একজন সৈন্যকেও আমি তখন প্রবেশ করতে দেব না, যে-সৈন্যবাহিনীর উপর আমার কর্তৃত্ব থাকবে না তাকে রাখবার জন্য একটি পয়সাও আমি ব্যয় করব না। এই জাতীয় স্বায়ত্তশাসনে আপনারা বাংলা দেশে এমন অবস্থার কল্পনা করবেন না যেখানে সকল রাজবন্দীকে আমি মুক্ত করে দিতে পারব এবং সংবিধি পুস্তক (স্টাটিউট বুক) থেকে বেঙ্গল রেগুলেশনকে অপসারিত করতে পারব। এ যদি স্বায়ত্তশাসন হয় তবে নাটালে আমি যেমন ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হতে দেখেছি বাংলা দেশ মোটামুটিভাবে সেই রকম স্বাধীন হবে। তখনও কেন্দ্র থেকেই এই সমস্ত কাজ পরিচালিত হবে।[৩৫]

* আয়ারল্যাণ্ডের সাহায্যকারী পুলিসদল

## দেওয়ালের লিখন

যেসব কংগ্রেসী প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন আমি তাঁদের পক্ষাবলম্বন করি না। এই ঘটনা কংগ্রেসের গোচরীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ কলকাতার মেয়রের কাছ থেকে ঘটনার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন এবং একজন ভদ্রলোক রূপে মেয়র তখনও তাঁর ভুল স্বীকার করেছিলেন এবং তার সংস্কারের জন্য আইনত যতটা সম্ভব তা করেছিলেন। এই ঘটনার প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের সমাবেশকে আমি বেশিক্ষণ আটকে রাখতে চাই না। মেয়র একটি কবিতার উল্লেখ করেছিলেন যেটি কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত চল্লিশটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তি করেছিল বলে মনে করা হয়েছে। ঐ বক্তৃতায় আরও অনেক ভুল কথা বলা হয়েছিল, যার বিস্তৃত বিবরণ আমি দিতে পারি। কিন্তু তা আমি করব না। কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার জন্য এবং সত্যের প্রতি আমার নিষ্ঠার জন্য আর যারা আজ এখানে উপস্থিত নেই তাদের সমর্থনে আমি এই দুটি নির্লজ্জ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলাম। আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না যে, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে সেখানকার বিদ্যালয়-গুলিতে এই জিনিস শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমি জানি যে, গত বছরের ভয়াবহ দিনগুলিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার জন্য আমরা দুঃখ বোধ করেছি এবং তার সংস্কার-সাধনও আমরা করেছি।

মিঃ গৌজনভী যে কবিতা আবৃত্তি করেছেন সেটি যদি আমাদের কলকাতার ছেলেদের শেখানো হয়ে থাকে তবে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করব। কিন্তু আমাকে এটি প্রমাণ করে দিতে হবে যে, পৌর প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে এবং তার উৎসাহে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছেলেদের এটি শিখিয়েছেন।[৩৬]

## বাঙালী সন্ত্রাসবাদের পথ নিল কেন?

একজন বন্ধু বললেন, "আমার কাছে এটি খুবই দুর্বোধ্য মনে হয়েছে যে, বাঙালী যুবক যারা স্বভাবতই ভদ্র, তাদের মধ্যে হিংসার প্রবণতা দেখা যায় কি করে?"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "নিজের মনে এর সমাধান আমি করেছি। তারা মনে করে যে, অতীতে অন্যায়ভাবে তাদের খ্যাতি নষ্ট করা হয়েছে। লর্ড কার্জন তাদের কোমলতার উপর বার বার আঘাত করেছেন। এতে তারা অপ্রসন্ন হয়েছিল। সুতরাং তারা বলেছিল, 'আমরা ধনী না হতে পারি, কিন্তু তাই বলে আমরা নিশ্চয়ই হীনবল নই।' সুতরাং তারা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে এবং সাহসিকতার ক্ষেত্রে সব প্রদেশকে ছাড়িয়ে যায়। তারা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে, দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে, এমন কি জনমতকেও তারা গ্রাহ্য করে না। অনেক সন্ত্রাসবাদী ও নৈরাজ্যবাদীর সঙ্গে আমি হিংসার প্রশ্ন নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছি।"[৩৭]

## অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরম্পরা

[ ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হবার কিছুদিন পরে গান্ধীজী সেখানে যান। বিভিন্ন রকমের অত্যাচার সেখানে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন লোকেদের কাপুরুষতা দেখে। নিচে সেই প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। ]

সাক্ষাৎকারী বললেন, "গুণ্ডা কোন যুক্তির ধার ধারে না।"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "কিন্তু সে সাহস বোঝে। সে যদি দেখে যে, আপনি তার চেয়েও বেশি সাহসী তাহলে সে আপনাকে শ্রদ্ধা করবে। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, বর্তমান আলোচনার সময় আমি আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করার কথা বলছি না। আমি আপনাদের অস্ত্র দিতে পারি না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের লোকেদের অস্ত্র সরবরাহ করার কাজ আমার নয়। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের লোকদের পক্ষে সব চেয়ে বেশি দুঃখের কথা হল এই যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে পারেননি। তাঁদের সাহসিকতা ছিল একপেশে। তা তাঁরা অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারেননি।"

দলের আর একজন বললেন, "তা করতে না পারায় কোন আশ্চর্য নেই। তাঁদের নিন্দা করা হয়েছিল।"

"কে নিন্দা করেছিল? আমি হয়ত করে থাকব—কিন্তু সে তো অন্য কথা!"

"জনগণ করেছিল। আমি নিজে একজন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের লোক।"

"জনগণ তা করেনি। আপনি মোটেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের লোক নন, তা হলে একথা বলার জন্য এখানে আপনি উপস্থিত হতেন না। তাঁদের এতগুলি

লোক এখানে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার যে জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছেন, এটি আমার কাছে খুবই দুঃখজনক বলে মনে হয়েছে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় তাঁরা যে ভয়শূন্যতা ও সাহস দেখিয়েছিলেন এই সঙ্কটের সময়েও তাঁরা যদি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য তা দেখাতে পারতেন তবে ইতিহাসের পাতায় তাঁরা বীর বলে গণ্য হতেন। তাঁরা যা করেছিলেন তার ফলে তাঁরা এখন ইতিহাসের পাতায় শুধু পাদটীকা হয়েই রয়েছেন। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, যে-কথা আমি আগেও বলেছি যে, এখনই আমি আপনাদের অস্ত্রের ব্যবহার ভুলে যেতে বলছি না অথবা আমার ধরনের সাহসিকতা অনুসরণ করতেও বলছি না। বিকল্প যখন কেবল অসম্মান এবং অবমাননা তখন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ভয়শূন্য হয়ে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে—অন্যদের মধ্যে এই জিনিসটিই আপনাদের সংক্রামিত করতে হবে। তবেই হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে বসবাস করতে পারবে, তা না হলে পারবে না। মুসলমানরা আমাদের একই রক্ত-মাংসের মানুষ।[৩৮]

## সন্ত্রাসবাদীদের বাংলায় ভীরুতা কেন থাকবে ?

[ ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থানকালে একজন সাক্ষাৎকারী মন্তব্য করলেন যে, রাজনৈতিক দাবাখেলায় বাংলাকে বোড়ে রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার উত্তরে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি বলেছিলেন। ]

না, বাংলা আজ পুরোভাগে রয়েছে। তার কারণ বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য। এই বাংলা দেশেই রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমার দৃষ্টিতে যতই ভ্রান্ত হন না কেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীরেরা এই বাংলাতেই জন্মেছিলেন। আপনাদের এই কথা বুঝে নিতে হবে। বাংলা দেশ যদি ঠিক পথে চলে তবে সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যার সে সমাধান করে দেবে। আর সেই জন্যই আমি নিজেকে একজন বাঙালী করে দিয়েছি। এই জাতীয় লোকের বাংলায় ভীরুতা থাকবে কেন ?[৩৯]

## বাংলার দেশপ্রেমিক

দেশসেবার সাহসিকতার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাস বসু এবং তাঁর সহকর্মীদের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে বলে আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বহু বিভাগ এবং দলের দ্বারা বাংলা দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ কখনই ক্ষীণ হতে পারে না। যেভাবে দেশ এই কারাদণ্ডের

প্রত্যুত্তর করতে পারে তা হল জেলখানাগুলি ভর্তি করে দেওয়া যতক্ষণ না গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের বহু সংখ্যার ফলে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। সামান্য কয়েকটি মুক্তি আসল জিনিস থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে যায়। এই আসল জিনিসটি হল এই ধরনের গ্রেপ্তারকে অসম্ভব করে তোলা। এ তখনই হবে যখন হয় ব্রিটিশ-জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হবে, নয়ত আমরা জেলখানাগুলি সম্মানের সঙ্গে পূর্ণ করে তাদের বুঝিয়ে দেব যে, আরও লোককে বন্দী করে কোন লাভ নেই। শাস্তি যখন একজন লোককেও তথাকথিত অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না তখন আর গভর্নমেণ্ট জনগণকে বন্দী করে না।[৪০]

## রাজবন্দীদের প্রসঙ্গ

### কি করা যাবে ?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আমার কাছে শ্রীযুক্ত মতিলাল কোঠারীর মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছেন। বিনাবিচারে, এমন কি কী অপরাধ তাঁরা করেছেন তা পর্যন্ত না জানিয়ে যাঁদের আটক করে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে অপরাধীর মত ব্যবহার করা হচ্ছে, তাঁদের মুক্তির জন্য আমরা সকলে ও বিশেষ করে বাংলা দেশ কী করতে পারে সে-বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চেয়েছেন। শ্রীযুক্ত বসু তাঁদের মুক্তি এই উদ্দেশ্যে চান না যে, তার দ্বারা আমাদের দেশবাসীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি দর্শনীয়রূপে প্রকাশিত হবে। এই বীর দেশ-প্রেমিকদের বলপূর্বক অবরোধের ফলে বাংলার তথা ভারতবর্ষের সম্মান বিপন্ন হয়েছে বলে তাঁর মনে হয়েছে এবং তা ঠিকই মনে হয়েছে। আমি তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলাম তা নিচে উধৃত করলাম। এর চেয়ে কোন ভাল উত্তর আমার ছিল না। শ্রীযুক্ত বসুর ইচ্ছানুসারে এটি আমি প্রকাশ করলাম।

"মোতিলাল কোঠারী আপনার চিঠি আমাকে দিয়েছেন। উত্তরে উত্তেজনাকারী, সিদ্ধান্তমূলক এবং বেগবান কিছু দেবার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় সে-রকম কিছু আমার নেই। সভা-সমিতি এবং বিধান-পরিষদে প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গ্রহণ যথেষ্টই করা হয়েছে। আমাদের দর্শনীয় এমন কিছু করতে হবে যাতে আমরা আমাদের শক্তি অনুভব করতে পারি। সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বর্জন, যা খদ্দর গ্রহণ ছাড়া অসম্ভব তার কথা ছাড়া অন্য কথা আমি ভাবতে পারি না। তাই, এই ঘৃণ্য অবরোধ সহ সমস্ত অন্যায় সম্পর্কেই আমার কাছে চরখা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এটি

যে প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিকার তা আমি কি করে লোকেদের বোঝাব? যাই হোক, এর প্রতি আমার বিশ্বাস বিন্দুমাত্র কমেনি। দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জাতীয় সপ্তাহের সময় আমরা আশ্রমে সপ্তাহভোর দিনরাত্রি সুতা কাটার ব্যবস্থা করেছিলাম। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা তা করেছিলাম যে, একদিন চরখা সেই শক্তি অর্জন করবে যার ফলে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হব।

আমি জানি যে, চরখার একটি বিকল্প আছে, আর তা হল গুণ্ডামি। কিন্তু এতে আমি একেবারেই অনাবশ্যক, এবং আরও বড় কথা হল যে, এতে আমার কোন বিশ্বাস নেই। সুতরাং আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চরখার উপরেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি। জাতির বহুবিধ দুঃখের কথা শুনে যাঁরা বিচলিত হয়েছেন তাঁদের সকলকে আমি আমার এই প্রচেষ্টায় যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছি। বিশ্বাস করুন, তার জন্য আমাদের সাধ্যমত দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সংগঠনশক্তি এতে প্রয়োগ করা দরকার।

আশা করি, ফরওয়ার্ড কাগজ এবং স্মারক হাসপাতাল ভালভাবে চলছে।[৪১]

## রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রচেষ্টা

[১৯৩৭ সালে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের বহু রাজনৈতিক বন্দী মুক্তিলাভ করেন। গান্ধীজী এই সময় বাংলায় আসেন, বন্দীদের সঙ্গে জেলে সাক্ষাৎ করেন এবং সরকারপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে বাংলা গভর্নমেণ্ট নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করেন:]

"প্রাদেশিক আইন সভার গত অধিবেশনে বাংলা গভর্নমেণ্ট পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের ক্রমশ মুক্তি দেবার নীতি ঘোষণা করেছিলেন এবং এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, ভাল ব্যবহারের যথেষ্ট নিশ্চয়তা দেখতে পেলে তাঁরা বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কেও বিবেচনা করবেন। তখন যে-অবস্থা ছিল তাতে গভর্নমেণ্ট মনে করেছিলেন যে, একসঙ্গে ২০০০ বন্দীকে মুক্তি দিলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে এবং হিংসার পুনঃপ্রবেশ দেখা দিতে পারে। বন্দীদের ক্রমশ মুক্তি দেবার এই নীতিটি ৯ই আগস্ট আইন সভায় বিবৃত করা হয়েছিল এবং সভা তা গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতি অনুসারে ইতিমধ্যেই অনেক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আরও অনেককে পরিবর্তিত বাধা-নিষেধের মধ্যে রাখা হয়েছে।

এর পর থেকে সাধারণ পরিস্থিতির উন্নতির সুনিশ্চিত লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কতিপয় নেতার সাম্প্রতিক বিবৃতি থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, তারা হিংসার পদ্ধতির নিন্দা করেছেন। মিঃ গান্ধীও গভর্নমেণ্টকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর অহিংসার নীতি প্রচার করে এবং তার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। বন্দীরা ভবিষ্যতে যাতে সন্ত্রাসবাদ বা অন্য ধ্বংসাত্মক কাজে যোগ না দেন বা তাতে সাহায্য না করেন সেইজন্য তাদের প্ররোচিত করার উদ্দেশে জেলে তাঁদের সঙ্গে দেখার করার কথাও তিনি বলেছেন। এই অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে গভর্নমেণ্ট বন্দীমুক্তি অথবা তাঁদের উপর আরোপিত বাধা-নিষেধ অপসারণ করার কাজ ত্বরান্বিত করা স্থির করেছেন এবং এখনই প্রায় ১১০০ রাজবন্দীকে মুক্তি দেবার আদেশ দিয়েছেন। তবে যেক্ষেত্রে পরিবর্তিত ঠিকানা জানাবার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে হয়ত কিছু দেরি হতে পারে।

বাকী রাজবন্দীদের সম্পর্কে—যাঁরা সংখ্যায় ৪৫০এর বেশি নন এবং যাঁদের বেশির ভাগ জেল ও শিবিরে রয়েছেন তাঁদের সম্পর্কেও নিকট ভবিষ্যতে গভর্নমেণ্ট চিন্তা করার কথা মনস্থ করেছেন। মিঃ গান্ধী প্রত্যেক রাজবন্দীর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব করেছেন। এই কাজ তিনি প্রায় চার মাসের মধ্যে করে ফেলবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন এবং গভর্নমেণ্টও আনন্দের সঙ্গে তাঁকে সব রকমের সুযোগ দিতে প্রস্তুত। ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার পর মিঃ গান্ধী যাঁদের সম্পর্কে সন্তোষজনক আশ্বাস দিতে পারবেন, গভর্নমেণ্ট কেবল তখনই তাঁদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেবার অবস্থায় আসবেন। ইতিমধ্যে গভর্নমেণ্ট আলাদা আলাদা ভাবে রাজবন্দীদের বাধা-নিষেধ শিথিল করার কথা চিন্তা করবেন এবং সঙ্গত বোধ করলে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

আশা করা যাচ্ছে যে, যে-নীতির কথা উপরে বলা হল তার সঠিক অনুসরণের ফলে অবশেষে এই জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অবশ্য এর সাফল্য জনগণের সহযোগিতা ও জননেতাদের সেই পরিবেশ বজায় রাখা যাতে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন উৎসাহিত হবে না তার উপর নির্ভর করছে। গভর্নমেণ্ট যে বরাবর জনগণের নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজবন্দীদের যত দ্রুত সম্ভব মুক্তি দেবার জন্য আগ্রহান্বিত রয়েছেন—এই নীতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজে মিঃ গান্ধীর সহযোগিতার

প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন।"—এই বিবৃতির উত্তরে গান্ধীজী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন। ]

বাংলা গভর্নমেণ্ট রাজবন্দীদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার জন্ত তাঁরা অভিনন্দন দাবি করেন। কংগ্রেসীরা যদি কংগ্রেসের পরিমাপ দিয়ে এই ইস্তেহারকে বিচার করেন তবে তাঁরা ভুল করবেন। বাংলা দেশের মন্ত্রিসভা কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার মানতে বাধ্য নন। তাঁরা কংগ্রেসের আদর্শ স্বীকার করেন না। তবু অনেক দূর পর্যন্ত তাঁরা কংগ্রেসের পথে চলেছেন, একথা স্বীকার না করলে অন্যায় করা হবে। যদি প্রাপ্য হন তবে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষও সম্মান পাবার যোগ্য। আমার মতে যতটা আমি আশা করেছিলাম ততটা না হলেও বাংলা দেশের মন্ত্রিসভা কিছু পরিমাণ জনমতে সাড়া দিয়েছেন।

এই কাজে মহামান্য গভর্নরের সাহায্যের কথা উল্লেখ না করলে আমি অন্যায় করব। গভর্নরের সহযোগিতা না থাকলে মন্ত্রীরা তাঁদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে পারতেন না।

আমি এই ইস্তেহারকে ভবিষ্যতে আরও বেশি পাবার আন্তরিকতার লক্ষণ বলে গণ্য করি। ইস্তেহারে বর্ণিত এই অভিমতের সঙ্গে আমি একমত যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণের এবং যে ১১০০ রাজবন্দীদের সব রকমের বাধা-নিষেধ থেকে এখন অথবা কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে তাঁদের প্রতিক্রিয়ার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। পুলিসকে ঠিকানা পরিবর্তন জানাবার প্রয়োজনের ব্যাপারটি তাদের অনুগ্রহ দানের সুযোগ করে দিয়েছে। এর মধ্যে এক ভয়ের প্রদর্শন রয়েছে এবং আমার আশা যে, গভর্নমেণ্ট তার সুযোগ নেবেন না। আমি আশা করি যে, এই সাধারণ প্রথাটি নিয়ে বিশেষ কড়াকড়ি করা হবে না।

আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, অহিংসার পরিবেশকে যদি বিঘ্নিত করা না হয় তবে গভর্নমেণ্ট যে-পথ নিয়েছেন তাতে পুরাপুরি ভাল ফল পাওয়া যাবে। কংগ্রেসও অহিংসার অনুসরণে জোর দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি হল তার রাজনৈতিক ধর্ম। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা জানেন যে, অহিংসার পূর্ণত অনুসরণের উপরে তাঁদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। আমি আশা করি যে, মুক্তিলাভের পর রাজবন্দীরা অহিংস পরিবেশের নির্মাণ ও সংগঠনের জন্ত গুরুতররূপে কাজ

করবেন। শ্রীসুভাষ বসু স্বাস্থ্যের জন্ত ইউরোপ যাবার প্রাক্কালে তাঁর বাণীতে অহিংসার পরিবেশ সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছেন।

আমি এও আশা করি যে, মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা কোন রকম সর্বজনীন প্রদর্শনীতে নিজে থেকে যোগ দেবেন না এবং জনসাধারণও প্রয়োজনীয় সংযম পালন করবেন। মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁরা কোন জনসেবার কাজ গ্রহণ করুন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি যাঁদের চাকরি প্রয়োজন তাঁদের সাহায্য করবে। কলকাতার জেলগুলিতে আমি যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি তাঁদের অধিকাংশই আমাকে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেসের প্রদর্শিত পথে জনসেবার কাজ করার জন্তই তাঁরা মুক্তি পেতে চান। তাঁদের প্রত্যেকে আমাকে এই সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাঁদের মুক্তি আদায় করার জন্ত আমি যেন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন রকম চুক্তিতে আবদ্ধ না হই। গভর্নমেণ্টকে তাঁরা কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেবেন না। তাঁরা বলেছিলেন যে, আমাকে দেওয়া তাঁদের কথাকেই তাঁদের আন্তরিক উদ্দেশ্য বলে গণ্য করতে হবে। আমি তাঁদের বলেছিলাম যে, মুক্তির বিনিময়ে তাঁদের সম্মান অথবা আত্মমর্যাদা বিক্রি করে দেবার অপরাধে আমি অপরাধী হব না।

জনসাধারণের মনে পড়তে পারে যে, আলাপ-আলোচনার সময় প্রথমেই আমি আন্দামানের বন্দীদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে, স্বাধীনতা লাভের জন্ত হিংসাত্মক পদ্ধতিকে তাঁরা অস্বীকার করেন এই ধারণা নিয়ে আমি কাজ শুরু করতে পারি কিনা। তাঁদের কাছ থেকে এই কথা না পেলে আমি বন্দীমুক্তির কাজ করতে পারতাম না; অবশ্য তাঁদের এই কথাকেই বন্দীদের প্রকৃত মনোভাব বলে ধরে নিতে হয়েছে।

বাংলা দেশে আমি কাজ শেষ করতে পারিনি। বর্তমানে এর বেশি করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখন ইচ্ছা বন্দী ও রাজনৈতিক অন্তরীণদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়ার জন্ত, এবং তাও সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতি ছাড়াই, আমি বাংলা গভর্নমেণ্টের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার কথাবার্তা এখনও শেষ হয়নি। যেখানে আমি মাত্র দু-ঘণ্টা সময় দিতে পেরেছিলাম সেখানে হিজলীর বন্ধুরা আমার কাছ থেকে দু-তিনদিন সময় চেয়েছিলেন। তাও যখন তাঁরা আমার মুখ দেখে বুঝতে পারলেন যে, এই প্রাণান্ত আলোচনার চাপ সহ্য করার মত আমি সুস্থ নই। তাঁরা আমার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল

ছিলেন। আমি জানতাম যে, আমি অসুস্থ না থাকলে যতটা স্বাধীনভাবে তাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন ততটা সুযোগ দিতে না পারায় তাঁদের আমি অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে ফেলেছি। আমি আশা করি যে, আমার স্বাস্থ্য একটু ভাল হলেই আমি আবার বাংলায় যাব এবং যেসব রাজনৈতিক বন্দী ও অন্তরীণ কর্মী মুক্তি পাননি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করব।

আন্দামানের বন্দীদের সম্পর্কে ইস্তেহারে কিছু বলা হয়নি। আমি জানি যে, গভর্নমেণ্ট দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী ও বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মধ্যে একটি বড় সীমা-রেখা টেনেছেন। এই পার্থক্য করা ঠিকই হয়েছে। এই পথে নিঃসন্দেহে অসুবিধা আছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি যে, সব যদি ঠিকভাবে চলে এবং জনসাধারণ, বিশেষ করে বাংলার জনসাধাধণ এযাবৎ আমাকে যেভাবে সাহায্য করে এসেছেন তা করতে থাকেন তবে তাঁদের মুক্তির আশাও আমি করি।

ইস্তেহারের একটি বিবৃতি বিরক্তিকর। এতে বলা হয়েছে 'অবশ্য এর ( এই পদ্ধতির ) সাফল্য জনগণেব সহযোগিতা এবং জননেতাদের সেই পরিবেশ বজায় রাখা যাতে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন উৎসাহিত হবে না তার উপর নির্ভর করছে।'

'ধ্বংসাত্মক আন্দোলন' বলতে তাঁরা যদি কেবল হিংসাত্মক কার্যকলাপ বুঝিয়ে থাকেন তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না এবং কোন দ্বিমতও হবে না। কিন্তু এই কথার মধ্যে যদি তাঁরা অহিংস কার্যকলাপকে যুক্ত করে থাকেন, যা নিয়ে কংগ্রেস দাঁড়িয়ে আছে, যার মধ্যে আইন অমান্য নিহিত, তবে এ পর্যন্ত যে-মুক্তি দেওয়া হয়েছে তা ভুল করে দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও মুক্তি অসম্ভব হয়ে যাবে। মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার সময় বরাবর আমি একথা স্পষ্ট করে বলে এসেছি যে, আমি শুধু অহিংসা বজায় রাখতেই চেষ্টা করব। গভর্নমেণ্ট ও জনগণের মধ্যে অহিংসাই একমাত্র উপযুক্ত ও সম্মানীয় স্থান যেখানে উভয়ে মিলিত হতে পারে। অহিংসার বুনিয়াদ ছাড়া গণতন্ত্র ভারতবর্ষে স্বপ্ন মাত্র হয়ে থাকবে। আমার আশা এবং বিশ্বাস যে, 'ধ্বংসাত্মক আন্দোলন' কথাটিতে গভর্নমেণ্ট, যেসব কাজ নিজে থেকেই হিংসাত্মক অথবা আরও হিংসাকে জাগিয়ে তোলে তার অতিরিক্ত অন্য কিছুকে বোঝাতে চাননি।[৪২]

## শরৎ বসুকে লেখা চিঠি

[ ১৯৩৯ সালের ৩১শে মে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজীকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে বাংলা গভর্নমেণ্ট রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছিলেন এবং কী বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি এবং শ্রীললিতচন্দ্র দাস বন্দীমুক্তি উপদেষ্টা সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তার কথা লেখেন। এই চিঠিটি উধৃত করে গান্ধীজী লিখেছিলেন : ]

খুবই দুঃখের কথা যে, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও ললিতচন্দ্র দাসকে বন্দীমুক্তি উপদেষ্টা সমিতি থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। যখন তাঁরা দেখলেন যে, এই কাজকে তাঁরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না এবং তাঁদের অভিমতের সঙ্গে তাঁদের সহকর্মী ও গভর্নমেণ্টের অভিমতের কোন মিল নেই তখনই তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া তাঁদের কোন গত্যন্তর ছিল না। যখন এই সমিতি গঠিত হয় তখন আমি আশা করেছিলাম যে, এই সমিতি সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এবং দলনিরপেক্ষ ভাবে বন্দীমুক্তি সমস্যার সমাধানের জন্য একটি সম্মিলিত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারবেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই ভারতব্যাপী সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তিকে সূচিত করে, বিশেষ করে যখন তাঁদের বহুলাংশ, সকলে যদি নাই হন, অহিংসার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে যেসব রাজবন্দীর মুক্তি দেওয়া হয়েছে তা থেকে এ জিনিস প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, দেশে যে ধরনের সন্ত্রাসবাদ ছিল তার পুনঃপ্রচলনের কোন বিপদ নেই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও ললিতচন্দ্র দাসকে সমিতিতে যোগদানের জন্য আবার আমন্ত্রণ জানানো হোক এবং তাঁদের অভিমতকে কার্যকর করার উপায় বার করা হোক। যে-জিনিসকে পারস্পরিক প্রচেষ্টায় মানিয়ে নেওয়া যায় এবং যার জন্য কোন আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না, তার জন্য আবার প্রবল আন্দোলন শুরু করা খুবই দুঃখের বিষয় হবে। বাংলা গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রদানের অত্যন্ত গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা পরিত্যাগ না করার জন্য তাঁদের প্রতি আমার এই আবেদন ব্যর্থ হবে না বলে আমি আশা করি। বন্দীরা যে অহিংসার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছেন সেইটিকে গভর্নমেণ্টের যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা উচিত। আমি আশা করি যে, বন্দীরা অধৈর্য হবেন না এবং অনশন ধর্মঘট অথবা ঐ জাতীয় কোন কাজের দ্বারা বন্ধুত্বপুর্ণ প্রচেষ্টার সার্থকতায় বাধা সৃষ্টি করবেন না। যে মর্যাদাপুর্ণ সংযম তাঁরা এযাবৎ জ্ঞানপুর্বক অনুসরণ করেছেন সেটিকে বজায় রাখতে আমি তাঁদের অনুরোধ করছি।[৪৩]

## বাংলার রাজনৈতিক বন্দী

আমি লক্ষ্য করছি যে, দমদম ও আলিপুর জেলে নীত বাংলার রাজনৈতিক বন্দীরা বিনা শর্তে মুক্তির জন্য অনশন ধর্মঘট করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁরা যেন এ কাজ না করেন। আমি নিশ্চিত যে, শরৎবাবু, যিনি একাজে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তিনিও অনুরূপ চিন্তা করেন। বন্দীদের আমি অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন শরৎবাবুর দ্বারা চালিত হন।[৪৪]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন সম্পর্কে টেলিগ্রাম ও চিঠির দ্বারা কয়েকজন মহিলা আমাকে প্লাবিত করে দিয়েছেন। একটি টেলিগ্রামে অনশনে যোগদান করে আমার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আমাকে সরাসরি অনুরোধ জানানো হয়েছে। আর একটি টেলিগ্রামে এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে। তাঁর যুক্তি হল এই যে, বন্দীরা আমার কথাতেই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছিলেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথাযথ উত্তর আমি প্রদান করেছি। কিন্তু বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্যক্তিগত উত্তরের মধ্যে তাকে সীমিত রাখা যায় না। আমার ভয় হয় যে, আমার পত্রলেখকেরা যা আমি করতে পারি না আমার কাছে তা আশা করে যে বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করছেন তারই ক্ষতিসাধন করেছেন। অনশন ধর্মঘটকে উৎসাহ দান করেও তাঁরা এর ক্ষতি করছেন। অনশন ধর্মঘট যে ভুল তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কোন ব্যক্তির পক্ষে খাদ্যগ্রহণে অস্বীকার করে মুক্তিলাভ করা উচিত নয়। যেসব মহিলা আমাকে পত্র লিখেছেন এবং যাঁরা বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করছেন তাঁদের উচিত অনশন ধর্মঘটীদের উপবাস ত্যাগ করতে প্ররোচিত করা। জনমতের চাপ সৃষ্টি করা হল বৈধানিক পদ্ধতি এবং তা বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। তা অবশ্যই কার্যকর হবে। আজকাল কোন গভর্নমেণ্টই জনপ্রিয় অভিমত সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। সুতরাং যাঁরা জনমত সৃষ্টির কাজ করছেন তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন যে, তাঁরা অনশন ধর্মঘটীদের ধর্মঘট ত্যাগ করতে রাজী করান এবং আমার পক্ষে যা অসম্ভব তার কথা বলে জনগণকে যেন বিভ্রান্ত না করেন।

এই সঙ্গে বাংলা গভর্নমেণ্টকেও অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন বন্দীদের

মুক্তিদান করে এই বিশেষ আন্দোলনটির অবসান ঘটান, যদিও আমি স্বীকার করেছি যে, বন্দীরা অনশন ধর্মঘটে প্রবৃত্ত হয়ে অন্যায় করেছেন। অনেক দিন আগেই মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। ঠিকভাবেই হোক অথবা ভুল করেই হোক, এবং আমি মনে করি ঠিকভাবেই জনগণ আশা করেছিল যে, দায়িত্বশীল বিধানসভার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীরা মুক্তিলাভ করবে। সেই আশা অনেক দিন আগেই পূর্ণ করা উচিত ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যাপারে জনমতের চাপ মেনে নিলে গভর্নমেণ্ট কিছুই হারাবেন না, কিন্তু অনেক কিছু লাভ করবেন।

পত্রিকায় আমি দেখলাম যে, অনশন-ধর্মঘটকারী বন্দীরা আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এবং জনগণের কাছেও আবেদন করেছেন। জনগণের সুদৃঢ় অভিমত তাঁদের পিছনে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের প্রতি আমার নিবেদন যে, তাঁরা এই পৃষ্ঠপোষকতায় সন্তুষ্ট থাকুন এবং অনশন-ধর্মঘট পরিত্যাগ করুন। তাঁরা বীর। তাঁদের প্রতি আমার বক্তব্য যে, এই অনশন-ধর্মঘট ভুলভাবে করা হয়েছে এবং তা তাঁদের সাহসিকতার অঙ্গ নয়। যতক্ষণ না জনমত গভর্নমেণ্টকে তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য করছে ততক্ষণ তাঁরা সাহসের সঙ্গে কষ্টকে স্বীকার করে নিন। সম্মানীয় শর্তে তাঁদের মুক্তিলাভের জন্য আমি যা করতে পারি তার জন্য তাঁরা আমার প্রতি আস্থাস্থাপন করতে পারেন।[৪৫]

দমদমের অনশনব্রতী বন্দীরা শ্রীমহাদেব দেশাইয়ের হাতে আমার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। আমার উত্তরগুলি যদি আমি সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করি তবে উদ্দেশ্যটি ভালভাবে সাধিত হবে। তাঁদের মুক্তির কোন দিন আমি নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না, অথবা অন্য কোন রকম অঙ্গীকারও আমি করতে পারি না। তার জন্য আমি দুঃখিত: আমার ক্ষমতা থাকলে আমি তা করতাম। যেটুকু আমি করতে পারি তা হল আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁদের পক্ষ সমর্থন করা। কিন্তু অনশন-ধর্মঘট চালিয়ে গিয়ে তাঁরা তার কোন রকম সুযোগ আমাকে দেননি। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার যে লক্ষ্যটুকু এর মধ্যে ছিল সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গিয়েছে। এখন অনশন আরও বেশি দিন চালিয়ে গেলে উদ্দেশ্যের ক্ষতি করা হবে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলে তাঁদের মুক্তির জন্য

সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবেন। আমি খুব গভীরভাবে অনুভব করি যে, এই অনশন ন্যায়সঙ্গত নয়। ধর্মঘটীরা তাঁদের মতন অবস্থায় পতিত অন্যদের কাছে ভুল নেতৃত্ব উপস্থিত করেছেন। ব্যাপকভাবে যদি এই অনশন ধর্মঘট অনুসৃত হতে থাকে তবে সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত গভর্নমেণ্টের অবস্থিতি অসম্ভব করে তুলবে। বন্দীদের বক্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাঁরা তাঁদের জিদের বশবর্তী হয়ে একে দুর্বল করে তুলেছেন। আমি নিজেকে অনশনের একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করি এবং রাজনৈতিক বন্দীত্বের বিজ্ঞান আমার জানা আছে। সেজন্য তাঁদের আমিও অনুরোধ করব যে, তাঁরা এই দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন এবং আমার পরামর্শ শুনুন। যাঁকে তাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ পক্ষ সমর্থনকারী বলে মনে করেন, তাঁর কাজে তাঁরা যেন বাধাসৃষ্টি না করেন। আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, ভাগ্য তাঁদের এবং আমার প্রতিকুল না হলে ১৩ই এপ্রিলের আগে তাঁরা অবশ্যই মুক্ত হবেন। কিন্তু অতীত ঘটনার মধ্যে আমি যেতে বলি না। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করলে তাঁদের মুক্তি আদায় করে নেবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যেটুকু কাজও করতে চান না কেন তাকে বিব্রত করা হবে।[৪৬]

অন্তত দু-মাসের জন্য হলেও এবং বন্দীমুক্তির জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে সক্রিয় করে তোলার অঙ্গীকার দিয়েও অনশন-ধর্মঘটীদের উপবাস স্থগিত রাখতে রাজী করাতে পারার জন্য আমি শ্রীসুভাষবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আলিপুরের বন্দীদের কাছ থেকেও আমি একটি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাতে তাঁরা আমাকে অনশন স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছেন এবং আমার প্রচেষ্টা আবার আরম্ভ করতে বলেছেন। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁদের মুক্তির জন্য আমি যতটুকু করতে পারি তা করব। আমি বলতে পারি যে, অনশন স্থগিত করার ফলে আমার আশা হচ্ছে যে, আমার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আমি এও আশা করি যে, বাংলা গভর্নমেণ্ট এই সুযোগকে তাঁদের সহৃদয়তা প্রকাশের জন্য এবং এই মানসিক উদ্বেগ দূর করার কাজে ব্যবহার করবেন।[৪৭]

## বাংলা দেশের দুর্দশা

বাংলা দেশ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কষ্ট সহ্য করেছে, দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে এবং এখন সে জাপানী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

সামরিক প্রস্তুতি অবশ্যম্ভাবী। এর অর্থ হল গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ। সতীশবাবু চিতাপুরের কাছে উচ্ছেদের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তেত্রিশটি গ্রাম থেকে লোকেদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের তারিখ ছিল ১লা এপ্রিল, ২রা এপ্রিল তা লাগানো হয়েছে এবং ৪ তারিখের মধ্যেই গ্রামবাসীদের চলে যেতে হয়েছে। সৈন্য ৪ তারিখে প্রবেশ করে। একটি গ্রামে সৈন্যরা যেদিন প্রবেশ করে সেই দিনই গ্রামবাসীরা বিজ্ঞাপনটি পেয়েছিলেন। বাস্তত্যাগীদের ইউনিয়নকে দেয় তাঁদের ট্যাক্সের অনুপাতে ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকা অপসারণ মূল্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এর পর ক্ষতিপুরণের হিসাব করা হবে এবং তা দেওয়া হবে। বাস্তত্যাগের যে-নিয়ম রচনা করা হয়েছে তা ব্যাপক এবং যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। কিন্তু তা যতই যুক্তিসঙ্গত হোক হঠাৎ বাস্তত্যাগ করতে বললে মানুষ কষ্ট পাবেই। উপরন্তু অনিবার্যভাবে ছোট ছোট ও বহু অফিসারদের হাতে তার প্রয়োগের ভার দিলে ন্যায় সুনিশ্চিত করতে পারা যায় না। এই অবস্থায় সতীশবাবুর মত কর্মীরা যা করতে পারেন তা হল জনগণকে উৎসাহিত করা। গ্রামবাসীদের শান্তভাবে এবং সাহসের সঙ্গে এই অবশ্যম্ভাবী কষ্টের সম্মুখীন হতে এবং তার মধ্য থেকেই সান্ত্বনা পেতে তাঁরা শিক্ষা দেবেন। সেইটিই হবে তাঁদের কাজের অবদান।[৪৮]

বঙ্গ-পরিক্রমা

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশ সব চেয়ে বেশি ঝটিকাসঙ্কুল। জীবনের স্পন্দন এখানে রয়েছে। এখনকার দলাদলিগুলি এখানকার বিরাট জাগৃতির প্রকাশ। বাংলা যদি ঠিক পথে সাড়া দেয় তবে অন্য সমস্ত প্রদেশকে সে ছাড়িয়ে যাবে। স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মত্যাগের জন্য বাংলা যা দাবি করতে পারে, আমি জানি না যে, অন্য কোন প্রদেশ এমন কি মহারাষ্ট্রও তা দাবি করতে পারে কিনা। এর ভাবাবেগ যদি দুর্বলতার লক্ষণ হয় তবে তা তার শ্রেষ্ঠ শক্তিরও প্রকাশ। অহিংসার প্রতি অসংযত উচ্ছ্বাস এর আছে, অবশ্য কথাটির প্রয়োগ যদি অনুমোদনযোগ্য হয়। ছাত্রদের সভায় সংঘটিত প্রচণ্ড আক্রমণের প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যা করেছেন তাতে উপরে বর্ণিত মনোভাবটির সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যদের দণ্ডাদেশ, বাংলার ছাত্রেরা যা করতে পারতেন এবং তার উত্তরে পুলিস যে বর্বরোচিত

আচরণ করত, সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। আমি জানি যে, এই লেখা দেখলে কলকাতার পুলিস কমিশনার কী বলবেন। আমি শুনতে পাচ্ছি তিনি বলছেন, 'কিন্তু আপনি আমার বাংলাকে চেনেন না'। তিনি যা কখন জানতে পারবেন না তার চেয়ে বেশি আমি বাংলাকে জানি। তাঁর বাংলা গভর্নমেণ্টের সৃষ্টি। গভর্নমেণ্ট যদি বাংলাকে উৎপীড়ন করা বন্ধ করেন এবং ভারতবর্ষকে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে না রাখেন তবে বাংলা দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভব্য প্রদেশে পরিণত হয়ে যাবে। বাংলা দেশ যদি হিংসার ভাব নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে তবে তার কারণ হল তার যন্ত্রণাভোগ।

তবে আমি আশা করি যে, বাংলার কল্পনাশক্তি তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং অহিংসাই যে রঙের তুরুপ তা তাকে বুঝিয়ে দেবে। সমস্ত যন্ত্রণাভোগ অহিংসার দেবীকে নিবেদিত করতে হবে।[৪৯]

বিদায়

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি বাংলা দেশ ত্যাগ করে যাচ্ছি। আমি প্রায় বাংলা দেশের অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলাম। বাসন্তী দেবীর কাছে আমার প্রতিদিনের তীর্থযাত্রা আমি হারাব। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন যে অসংখ্য গ্রাহক আমার কাছে আসতো তাঁদের আনন্দময় হাসি মুখও আমি হারাব। আমি জানি, দশ লক্ষ টাকা আমরা যে তুলতে পারিনি* তার কারণ দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি আমাদের ভক্তির অভাব নয় অথবা বাঙালীদের ইচ্ছার অভাবও নয়। তার কারণ সর্বজনস্বীকৃত দুর্বল সংগঠন, যার জন্য আমরা দায়ী। বাংলা দেশের প্রতিটি গ্রামে যদি আমরা প্রচার করতে পারতাম তবে অনেক আগেই আমরা পুরা টাকা তুলে ফেলতে পারতাম। তা সত্ত্বেও মোট ৭, ৭৪, ১৬৫ ॥৵৫২ পাই বাংলা দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়নি। আমি একটি মোটামুটি হিসেব করেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, মারোয়াড়ী বাসিন্দারা ১, ৪০, ০০০৲ টাকা দিয়েছেন, স্থানীয় গুজরাটীরা দিয়েছেন ৬০,০০০ টাকা আর বাকিটা বাংলা দেশের এবং বাংলার বাইরের বাঙালীরা দিয়েছেন। অন্য প্রদেশের সামান্য টাকাও এতে যুক্ত।[৫০]

* দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# খাদি : সংস্থা ও কর্মী

## চরখা প্রসঙ্গে ডঃ রায়

চরখার উপর লিখিত একটি বাংলা পুস্তিকার শ্রীপি. সি. রায় কৃত খুবই যুক্তিসঙ্গত ভূমিকার সম্পূর্ণ অনুবাদ নিচে প্রকাশ করতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তাঁর বিস্ময়কর রাসায়নিক গবেষণাগুলি এবং তাঁর সৃষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি যেমন মুল্যবান তেমনি তাঁর সুতা কাটার সংগঠনটি যে আরও মূল্যবান ও বিস্ময়কর হয়ে উঠবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তাঁর রাসায়নিক গবেষণা ভারতবর্ষে যশ বহন করে এনেছে, যে শিল্পগুলির সঙ্গে তিনি অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত সেগুলি বাংলা দেশে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছে এবং মেধাবী বাঙালীদের কাজের যোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু ঘরে ঘরে সুতা কাটার প্রবর্তনের অর্থ হল বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ ঘর থেকে অনশন অথবা অর্ধ-অনশন এবং অপমানকে বিতাড়িত করা, দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত ব্যাধিগুলিকে অপসারিত করা এবং এই সব ঘরে আহারে পরিতৃপ্ত মানুষের মুখে যে হাসির ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় তার প্রতিষ্ঠা করা। ডঃ রায়ের এই অভিমতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ম্যাঞ্চেস্টার অথবা জাপানের পরিবর্তে বোম্বাই অথবা আমেদাবাদ থেকে কাপড় এনে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশ কিছুই লাভ করেনি। স্বদেশীর সম্পূর্ণ এবং প্রত্যক্ষ লাভ পেতে হলে চারিদিকে ছড়ানো লক্ষ লক্ষ ঘরগুলিতে আমাদের সুতা ও কাপড় প্রস্তুত করে নিতে হবে। একমাত্র স্বদেশীই তাদের একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে, আর কিছু তা করতে পারে না।[৩১]

## কলিকাতার অপ্রস্তুতি

[একজন পত্রলেখক জানিয়েছেন যে, স্বদেশী ও খাদি আন্দোলনে বাংলা বিহারের তুলনায় খুব পিছিয়ে আছে, কলিকাতায় এ সম্পর্কে কিছুই কাজ হয়নি। গান্ধীজী চিঠির সামান্য অংশ তুলে দিয়ে নিচের কথাগুলি লেখেন।]

পত্রলেখকের চিঠি থেকে সামান্য অংশ আমি তুলে দিয়েছি। তিনি একথাও বলেছেন যে, কলিকাতার অপ্রস্তুতি যদি বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে

ছড়িয়ে পড়ে তবে সত্যাগ্রহের লড়াই জেতা যাবে না। আরও কয়েকটি চিঠি এই কথার সমর্থন করেছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে আমি রাজী নই যে, এমন কি কলিকাতাতেও খদ্দর আন্দোলনের কোন প্রগতি হয়নি। সেই সঙ্গে এই ভয়ও আমার আছে যে, কলিকাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ মূলত সত্য। কলিকাতায় খদ্দর পরিধান যেন একটি ব্যতিক্রম, তা সাধারণ নিয়ম নয়। এ বিষয়ে কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, প্রাথমিক শর্ত পুরাপুরি পালিত না হলে সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহ অসম্ভব হয়ে যাবে। শান্তিময় স্বরাজ যদি আমাদের লক্ষ্য হয়—শান্তিপূর্ণ উপায়ে লব্ধ স্বরাজ তো শান্তিময় হবেই—তবে ধ্বংসাত্মক কাজে আমাদের যেমন প্রস্তুত দেখা যায় গঠনকর্মেও তেমনিভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা যদি মধ্যবর্তীকালে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা এবং অন্তর্যুদ্ধ এড়াতে চাই তবে বয়কট ও নির্মাণ, বর্জন ও গ্রহণ, অমান্য ও বাধ্যতা একই সঙ্গে চালানো দরকার। খাদি আন্দোলন গঠনকর্মের বৃহত্তম অংশ। শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকতে হলে একে আমাদের অবহেলা করা চলবে না।[৫২]

শক্তির অপচয় ?

আচার্য রায় কোকোনাডায় খাদি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন মিঃ এম. এন. রায় গত মে মাসের 'ওয়েলফেয়ার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তার সমালোচনা করেছেন—জনৈক বন্ধু এটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর প্রতিলিপিটি পুরা দুমাস আমার কাগজের মধ্যে পড়েছিল। এর আগে আমি এটি পড়ার সময় করতে পারিনি বলে দুঃখিত। পড়ার পর আমি দেখলাম যে, ডঃ রায়ের বক্তব্যের যে সমালোচনা মিঃ রায় করেছেন তার উত্তর অনেকবার এই পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পাঠকদের স্মৃতি দুর্বল সেই হেতু আমার যুক্তিগুলিকে সংহত করে এখানে পুনরায় উপস্থিত করা যেতে পারে। ডঃ রায়ের সমালোচক মনে করেন যে, চরখার জন্য যে চেষ্টা করা হয়েছে তাতে শক্তির অপচয় হয়েছে। ডঃ রায়ের বক্তব্যের মূল কথা হল এই যে, কৃষকদের কাছে চরখার একটি বিশেষ বাণী আছে। তা হল, চরখা তাদের অলস সময়কে কাজে লাগাতে সক্ষম করে। সমালোচকের বক্তব্য হল যে, কৃষকদের কাছে কাজে লাগাবার মত অলস সময় নেই। যে অবকাশ তারা পায় তা তাদের প্রয়োজন। কৃষকেরা যদি চার মাস অলস থাকে তবে তার কারণ হল যে তারা আট মাস অতি পরিশ্রম করে এবং এই

চার মাসে যদি তাদের চরখা নিয়ে বসতে হয় তবে বাকি আট মাস তাদের কাজ করবার যোগ্যতা বছরের পর বছর কমতে থাকবে। অন্যভাবে বললে, সমালোচকের মতে চরখা নিয়ে বসবার মত অবকাশ জাতির নেই।

আমার মনে হয়েছে যে, ভারতবর্ষের কৃষকদের জীবনের কোন অভিজ্ঞতা সমালোচকের নেই, যদি বা থাকে তাও খুব সামান্য। চরখা ভবিষ্যতে কী করবে এবং প্রকৃতপক্ষে এখন কী করছে সে সম্পর্কেও তিনি কোন ছবি তুলে ধরতে পারেননি। কৃষকেরা চরখার দাসে পরিণত হবে না। চরখা কঠিন পরিশ্রমের পর সুখকর বৈচিত্র্য ও শান্তি-বিনোদন এনে দেয়। মেয়েদের কাছে এটি স্থায়ী কাজরূপে উপস্থিত থাকবে। বাড়তি সময়ে তারা সুতা কাটবে। শ্রমিকেরা যদি গড়ে দিনে আধ ঘণ্টা করে সুতা কাটেন তবে তাঁরা নিজেদের জন্য যথেষ্ট সুতা কেটে নিতে পারবেন এবং অপরকেও কিছু দিতে পারবেন।···

সমগ্র পৃথিবীর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, কৃষকদের একটি পরিপুরক কাজের প্রয়োজন যাতে করে তারা অতিরিক্ত কিছু উপার্জন করতে পারে অথবা তাদের অবকাশকে কাজে লাগাতে পারে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, অল্প কিছুদিন আগেও ভারতবর্ষের মেয়েরা উদ্বৃত্ত সময়ে সুতা কেটে তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় করে নিতেন। সুতা কাটার পুনঃপ্রবর্তন খুবই আকর্ষণীয়ভাবে বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে কর্মীরাই আংশিকরূপে বিফল হয়েছেন। কিন্তু যেখানে তাঁরা ভালভাবে কাজ করেছেন সেখানে চরখা চলেছে। একথা সত্য যে, চরখা এখনও স্থায়িত্ব অর্জন করেনি। তার কারণ হল অসম্পূর্ণ সংগঠন এবং কাটুনীদের স্থায়ী কাজে নিযুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা বোধের অভাব। আমি মিঃ রায়কে পাঞ্জাব, কর্ণাটক, অন্ধ্র এবং তামিলনাদের কয়েকটি জায়গার অবস্থা অধ্যয়ন করতে আমন্ত্রণ করছি। তাহলে তিনি নিজেই সুতা কাটার সম্ভাবনা দেখতে পাবেন।

* * *

শক্তির অপচয়ের কোন প্রশ্ন ওঠে না। ডঃ রায় আগে যে হাজার হাজার বোনকে বিনামূল্যে ডোল দিতেন এবং এখন সম্মানজনক কাজ দিচ্ছেন, যার ফলে এই বোনেরা আংশিক অথবা পূর্ণত স্ব-নির্ভর হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা কি তাঁদের শক্তির অপচয় করেছেন? ভিক্ষা করা অথবা উপবাস থাকা ছাড়া

তাঁদের আর কোন কাজ ছিল না। যুবকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া, গ্রামবাসীদের অভাবগুলি অধ্যয়ন করা, তাদের কষ্ট অনুভব করা এবং এগিয়ে গিয়ে তাদের সহায়তা করা—এটি কি শক্তির অপচয়? হাজার হাজার সম্পতিপন্ন পুরুষ ও নারীর পক্ষে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও অর্ধ-অনশনক্লিষ্ট মানুষদের কথা চিন্তা করা এবং তাদের কথা ভেবে ধর্মভাবে আধঘণ্টা সুতা কাটা কি শক্তির অপচয়? যে পুরুষ বা নারীর কোন কাজ নেই সে যদি সুতা কেটে কয়েকটি পয়সা উপার্জন করে তবে সেইটিই তার লাভ, একটি পুরুষ বা নারীও যদি আত্মত্যাগের প্রতীকরূপে সুতা কাটে তবে সেটুকুও লাভ। যদি এমন কাজ থাকে যাতে সবটাই লাভ, একটুও ক্ষতি নয়, তবে তা হল চরখায় সুতা কাটা।[৫৩]

## চরখা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ

পাঠকেরা জানেন যে, আমার প্রতি বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুর্বলতা আছে। আমি যা কিছু বলি বা করি সবই গভীরভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং আমার আদর্শ ও পরিকল্পনার প্রতি তাঁর সমর্থনের যুক্তিগুলি থেকে কিছু বাদ দেবার অধিকার পাঠকদের আছে। কিন্তু তাঁরা দেশের প্রতি বড় দাদার আগ্রহ ও নিষ্ঠা—যা তাঁকে আমাদের রাজনীতির সাম্প্রতিক চিন্তার সঙ্গেও পরিচিত করে রেখেছে—তার প্রশংসা না করে পারেন না। চরখা প্রসঙ্গে তাঁর শেষ চিঠিটি নিচে দেওয়া হল :

"নিজেদের যাঁরা খুব প্রয়োজনীয় লোক বলে মনে করেন তাঁদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তগতভাবে না হলেও কার্যত যা তাঁদের কাছে সম্ভাবনাহীন বলে মনে হয় তাকেই অসম্ভব মনে করেন আর যা তাঁদের সম্ভবপর বলে মনে হয় তাকেই যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য করেন। নেপোলিয়নের শত্রুরা একবার ভেবেছিলেন যে, শীতের সময় আল্প্‌স্ পর্বত অতিক্রম করা বেলুনের সাহায্যে চাঁদে পাড়ি দেবার মতই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু নেপোলিয়ন তা মনে করেননি। তাঁর দূরদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল যে, ইটালীতে প্রবেশ করতে হলে আল্প্‌স্‌কে অতিক্রম করাই হল একমাত্র সম্ভাব্য পথ।

"অনুরূপভাবে আমাদের দেশবাসীর অধিকাংশ মনে করেন যে, চরখা কাটার মত সাধারণ জিনিসের দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যদি নাও হয়, প্রগতি একেবারে অসম্ভব; অন্যদিকে মহাত্মাজী মনে করেন যে, আমাদের লক্ষ্যে পৌছবার এইটিই একমাত্র সম্ভাব্য পথ।"

পাদটীকায় তিনি আরও লিখেছেন যে, চরখা ভাবাতত্ত্বের দিক থেকে বৃত্তের সমার্থক এবং আলঙ্কারিক অর্থে বিশ্বসংসারের ঘূর্ণায়মান চক্রের সমার্থ-বোধক। কবিরের একটি গান এই উপমার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু পাথিব-জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের কাছে চরখাকে যতই অসম্ভব বলে মনে হোক না কেন এইটিই যে দেশের প্রকৃত প্রগতির একমাত্র সম্ভাব্য পথ সে সম্পর্কে বড় দাদা যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেইটিই তাঁর চিঠির সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ। এইটিই একমাত্র জিনিস যা দেশে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনকে সম্ভব করে তুলতে পারে।[৫৪]

## খাদির সম্ভাবনা

বাংলা দেশে খাদির বিস্তৃতি আমি যা দেখতে পেয়েছি তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ফরিদপুরে যে 'কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী' হয়েছিল তা যত না অন্য কিছুর প্রদর্শনী ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল খদ্দরের প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর মাত্র একটি কোণে খদ্দরের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল না। সেখানে অনেক তাঁতি ছিল। কয়েকজন তো সুন্দর নক্সা বুনছিল। কিন্তু তারা সকলেই হাতে কাটা তুলা অথবা সিল্কের সুতায় কাজ করছিল। শ্রীরামপুরের সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁদের পরিদর্শক পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা হাতে পাটের সুতা তৈরী এবং তা থেকে যেসব জিনিস প্রস্তুত হয় তা দেখাচ্ছিলেন। যেহেতু বাংলা দেশে পাটশিল্প বিরাট শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম সেইহেতু হাতে পাটের সুতা কাটা অনেককে সম্মানপ্রদ কুটিরশিল্পের কাজ দেবে। বর্তমানে পাট মাঠ থেকে সোজা মিলে চলে যায় আর যে শর্তে যায় তা মোটেই পাট-উৎপাদকদের অনুকূল নয়। বাংলার গড়ে তুলায় সুতা কাটা বোধ হয় অন্ধ্রের চেয়েও উন্নত। প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে যে সুতা কাটার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ঐচ্ছিক কাটুনীরা যে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যাবে না। খদ্দরের নমুনাগুলিকে অন্ধ্রের সব চেয়ে ভাল কাপড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাংলা দেশ যদি আর একটু ভালভাবে সংগঠিত হয় তবে সরু সুতার ব্যাপারেও সে অন্ধ্রকে হারিয়ে দিতে পারবে। অন্য কোন প্রদেশ বোধ হয় এই বিষয়ে বাংলার কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

ফরিদপুরের প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার মত মির্জাপুর পার্কে

খাদি প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। নকীপুরের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং বিখ্যাত কবি শ্রীমতী কামিনী রায় এতে অংশ গ্রহণ করেন। বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সতীশবাবু এবং সর্বোপরি ডঃ রায় নিজে এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ডঃ রায় ইতিমধ্যে ভাল সুতা কাটছেন, সুতা বারো নম্বরের নিচে নয়। তিনি আমাকে বলেছেন যে, চরখা ক্রমেই তাঁর প্রিয় হয়ে উঠছে এবং সুতা কাটায় তিনি আনন্দ পান। প্রায় ১৮০ জন কাটুনী প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। আমার তো মনে হয় না যে, ভারতবর্ষের আর কোথাও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এতগুলি পুরুষ ও নারীকে এই রকম প্রদর্শনীতে যোগ দিতে এবং এত নৈপুণ্যের সঙ্গে সুতা কাটতে দেখা যাবে। আমি একথাও জানাচ্ছি যে, অনেক স্বরাজ্যবাদী নিয়মিত এবং আগ্রহ সহকারে সুতা কাটেন। ফরিদপুরে আমি সুরেশ বিশ্বাস নামে একজন নিষ্ঠাবান স্বরাজ্যবাদীর স্ত্রীর অতিথি হয়েছিলাম। তিনি খুব ভাল সুতা কাটেন। তিনি এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা চরখার ভক্ত। তিনি তাঁর সমস্ত বাড়তি সময় সুতা কাটায় ব্যয় করেন। আমাকে বলা হয়েছে যে, আমার এই ভ্রমণে, যা প্রকৃতপক্ষে আজ থেকে শুরু হচ্ছে, ( আমি এই লেখা কলকাতায় ৭ই মে লিখছি ) বাংলা দেশের আরও ভাল খদ্দরের প্রদর্শন দেখতে পাব। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশ যদি ইচ্ছা করে তবে অন্য আরও বিষয়ের মত খদ্দরেও সে দেশের নেতৃত্ব করতে পারে। বাংলা দেশে প্রতিভা আছে, সুন্দর কল্পনা-শক্তি আছে, কাব্য আছে, তার পুঁজিতে আছে মহান আত্মত্যাগ, আছে প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য এবং উপাদান। এই গুণগুলির সঙ্গে সে কি তার ইচ্ছাকেও যুক্ত করবে? ঈশ্বর তাকে সেই ইচ্ছা প্রদান করুন।[৫৫]

কুমিল্লায় আমাকে একটি চরখা দেখানো হয়েছে। এটি একশ বছরের পুরাতন এবং এতে এখনও সুতা কাটা যায়। এর বর্তমান মালিক হলেন ৫৮ বৎসর বয়স্কা একজন বিধবা মহিলা। তাঁর মা তাঁর শাশুড়ীর কাছ থেকে এটি পেয়েছিলেন। বর্তমান মালিক ১৪ বছর বয়সে বিধবা হন। এই চরখার সুতা থেকে তিনি তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাপড় বুনে নেন। তিনি তাঁর নিজের জন্য অথবা তাঁর লোকজনের জন্য কখন বিদেশী কাপড় কেনেননি।[৫৬]

## খাদি প্রতিষ্ঠান

বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্যরূপে চরখার সম্প্রসারণের কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উপযুক্ত বিষয়। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা আচার্য রায় এবং তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ সতীশবাবু—তাঁকে এইভাবে ডাকতে আচার্য রায় ভালবাসেন—অর্জন করেছেন তাতেই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হয়ে যায়নি। তাঁরা দুজনেই রাসায়নবিদ। বাংলার কৃষকদের একটি স্থায়ী বিকল্প শিল্পরূপে চরখা ও খদ্দরের সম্ভাবনা আবিষ্কারের দিকে কাজ করতে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মন তাঁদের বাধ্য করেছিল। একটি সামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা খাদি প্রতিষ্ঠান নামে একটি বড় সংগঠনে বিকশিত হয়েছে। বাংলা দেশের বহু অঞ্চলে এর শাখা রয়েছে এবং আরও শাখা স্থাপনার ইচ্ছাও এর রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল শুদ্ধ খদ্দর প্রস্তুত ও বিক্রয় করা এবং প্রকাশন, ম্যাজিক লাণ্টার্ণযোগে বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা তাকে জনপ্রিয় করে তোলা। এটিকে স্থায়ী রূপ দেবার উদ্দেশ্যে সংগঠনটিকে পাবলিক ট্রাস্টে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আমার সামনে ট্রাস্ট-ডীড ও ব্যালেন্স-শীট রয়েছে। আমি এই সব কথার উল্লেখ এইজন্য করছি যে, পাবনার এক জনসভায় একজন অনুসন্ধানীর কাছে এই প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম যে, ইয়ং ইণ্ডিয়ার পাতায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে আমি আলোচনা করব। সেই সভায় আমি বাংলার সর্বত্র প্রতিষ্ঠানের চরখা ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করছিলাম; কেননা আমি দেখেছিলাম যে, বাংলায় যত রকমের চরখা পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের চরখা সব চেয়ে ভাল এবং প্রতিদিন তার উন্নতির জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। সেই অনুসন্ধানী ব্যক্তিটি তখন প্রতিষ্ঠানের খদ্দরের বেশি দাম সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এই কাগজের পাতায় সেই অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম। এক অর্থে সেই অভিযোগ সত্য বলে মনে করা যেতে পারে। লক্ষ্য হল, ব্যাপকভাবে খদ্দর প্রস্তুত করা এবং প্রতি ঘরে চরখার প্রচলন করা। এই ট্রাস্টের রচয়িতারা খদ্দর স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে এবং সুতার শক্তি উন্নত করতে চান। যেসব অঞ্চল খদ্দর উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নয় সেই সব অঞ্চলেও ব্যবস্থাপকেরা খাদি উৎপাদন করেন। এইভাবে সব জায়গার খদ্দর তাঁরা একত্র করেন এবং গড় মূল্য ধরে নেন। তার ফলে যাঁরা কেবল অনুকূল স্থানেই খদ্দর উৎপাদন করেন তাঁরা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সস্তায় খাদি বিক্রয় করে থাকেন। বর্তমানে

এতে বিব্রত বোধ করার কোন কারণ নেই, কেননা যে অল্প কয়েকটি খাদি উৎপাদনের কেন্দ্র আছে তাদের নিজস্ব ক্রেতা আছে এবং এই ক্রেতারা দামের জন্য চিন্তিত নন। প্রতিষ্ঠান এখনও লোকসানে খদ্দর বিক্রয় করেন। তবে তাঁরা সেই লোকসান কমাবার কথা চিন্তা করছেন। এ চিরকাল দানের উপর পরিচালিত হতে পারে না। খদ্দরের দাম কমাবার জন্য প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট রয়েছেন দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। প্রতিষ্ঠানে কারও কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, এই কথাটি খুব বেশি প্রচারিত করা যায়নি। মূল কর্মকর্তাদের উপার্জনের নিজস্ব সাধন ছিল। তাঁরা সেগুলি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁরা কিছুই নেন না। এযাবৎ আমি আরও পাঁচটি খাদি উৎপাদনের সংগঠিত কেন্দ্র দেখেছি। সেগুলি হল কুমিল্লায় অভয় আশ্রম, মালিকান্দায় ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের আশ্রম, চট্টগ্রামে প্রবর্তক সংঘ, পাবনার সৎসঙ্গ আশ্রম এবং ভুয়াদন্দো খাদি কেন্দ্র। শেষোক্ত কেন্দ্রটি আমি নিজে দেখিনি। তবে হুগলীতে তার মূল কর্মীদের এবং তাঁদের খদ্দর ও চরখা দেখার আনন্দ আমার হয়েছে। প্রবর্তক সংঘ এযাবৎ আধা-খদ্দরের মধ্যে ব্যস্ত ছিলেন। তবে তাঁরা এখন নিশ্চিতভাবে স্থির করেছেন যে, চট্টগ্রামে তাঁরা কেবল শুদ্ধ খদ্দর উৎপাদন করবেন। তাঁরা কতিয়ান্দুতে এই কাজ সবেমাত্র শুরু করেছিলেন। কিন্তু আমার চট্টগ্রাম পরিদর্শনের সময় ব্যবস্থাপকেরা স্থির করেন যে, সমগ্র চট্টগ্রামে তাঁর এই কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করবেন। তাঁরা এখনও তাঁদের কলিকাতাস্থ ভাণ্ডারে এবং তাঁদের প্রধান কার্যালয় চন্দননগরে আধা-খদ্দর চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে প্রথম সুযোগেই পুরাপুরিভাবে এই আধা-খদ্দর ত্যাগ করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন। এই সমস্ত কাজই ভাল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারাও সরকারীভাবে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আমি নামে না হলেও প্রকৃতিগতভাবে কংগ্রেসের কাজ বলে মনে করি। যাই হোক প্রয়োজন হলে এই বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলির সমন্বয় সাধন এবং সময়, প্রতিভা, শ্রম ও মূলধনের পরিমিত বিনিয়োগ। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানেরা নিশ্চয় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং নিজেদের কাজের তুলনা করবেন ও একটি সম্মিলিত কর্মসূচী আবিষ্কার করবেন। সময়মত এটি হওয়া দরকার। যেভাবেই হোক এই সময়টিকে ত্বরান্বিত করাই হল সমস্যা। অন্য সব প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা খাদি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কিছু সুবিধাজনক, কেননা তাঁদের এমন লোক আছেন

যাঁরা খাদির বাণী প্রচার করার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন। এর কাছে সংগঠনের বিরাট প্রতিভা রয়েছে। এর নামের সুখ্যাতি রয়েছে। সুতরাং এর বিস্তৃতির অসীম সম্ভাবনাও রয়েছে। সেজন্য সমগ্র ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করে বাংলা দেশের দৃষ্টি আমি এর কাজের প্রতি আকর্ষণ করছি। আমি সমালোচকদের আহ্বান করছি যে, তাঁরা এর সমালোচনা করুন এবং কোন ন্যূনতা দেখতে পেলে তা প্রকাশ করুন। আমি এর সহানুভূতিশীলদের আহ্বান করছি যে, তাঁরা এর হিসাব-পত্র, যা সকলের সামনে খোলা পড়ে রয়েছে, তা অধ্যয়ন করুন এবং একে সাহায্য করুন। আমি উদাসীনদেরও আহ্বান করছি যে, তাঁরা তাঁদের ঔদাসীন্য ত্যাগ করুন এবং এর কার্যকলাপ অধ্যয়ন করে হয় একে প্রতিরোধ করুন, নয়তো একে সমর্থন করুন। একজন বিজ্ঞানীরূপে ডঃ রায়ের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ দেশবাসী ভাল সাবান তৈরী করতে পারেন বলে—যার দ্বারা এমন কি তিনি বহু বাঙালী যুবকের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তার দ্বারা তাঁকে চিনবে না। তারা তাঁকে এই বলে জানবে যে, তিনি তাঁদের দীন কুটিরে খদ্দরের মাধ্যমে সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বহন করে এনেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরাট বটবৃক্ষের মতন হোক—যা ছোট ছোট সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আশ্রয় দেবে এবং সেগুলিও এর কাছ থেকে সাহায্য এবং উপদেশ লাভ করবে। কেমিক্যাল ওয়ার্কস খুবই বড়, কিন্তু খাদি প্রতিষ্ঠান তার চেয়েও বড়। কেননা খাদি প্রতিষ্ঠানের মূল এই দেশের মাটিতে গ্রথিত। একে উপর থেকে চাপানো হয়নি। এর বিকাশের জন্য অধিকতর যত্নের প্রয়োজন। এটিকে যদি এক বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হতে হয় তবে এর প্রত্যেক সংগঠকের শ্রেষ্ঠ শক্তিকে আবাহন করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠান যা দিতে পারে বলে আমি আশা করি তা যেন এ সার্থক করতে পারে।[৫৭]

## বন্যাত্রাণে খাদি

বাংলায় ভ্রমণ করব অথচ বন্যাপীড়িত অঞ্চল এবং সেখানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমিতি কর্তৃক যে ত্রাণকার্য চলছে তা দেখব না, এ আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এটি ছিল আমার তীর্থযাত্রা। কেননা ১৯০১ সাল থেকে আচার্য রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং দ্বিতীয়ত ত্রাণকার্যে ও ভবিষ্যৎ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবার সার্থক উপায়রূপে চরখার কার্যকারিতা তিনি

যেভাবে দেখিয়েছেন তা দেখা। বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের সময় কী করা উচিত সে বিষয়ে গ্রামবাসীদের যদি ভালভাবে শিক্ষিত করা হয় এবং কৃষির অতিরিক্ত কোন পেশার সঙ্গে—বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষের সময় কৃষি করা তো অসম্ভব—যদি তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে এই রকম অবস্থায় সাধারণত যতটা সময়, অর্থ এবং শ্রম লাগে তা অনেকটা বেঁচে যেত। জনসাধারণকে যখন এই অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য দানের উপর নির্ভর করতে বলা হয় তখন তারা তাদের আত্ম-সম্মান হারিয়ে ফেলে এবং তাদের হাত-পায়ের ব্যবহার ভুলে যায়। তখন অনৈতিকতা প্রবেশ করে এবং জনসাধারণ নিম্নস্তরের পশুদেরও অধম হয়ে পড়ে। কেননা এই পশুদের অন্তত বেঁচে থাকার মধ্যেঃআনন্দ আছে, কিন্তু এই জাতীয় মানুষদের অবস্থা জীবন্মৃতের মত। সেইজন্য এই ত্রাণ-এলাকায় চরখা-পাগল রসায়নবিদ কী করেছেন তা আমি নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলাম।

আমাকে বগুড়ায় এবং সেখান থেকে তালোরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে এই বিশিষ্ট দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর নিজের বাড়িতে আমি মিলিত হয়েছিলাম। "সায়ান্স কলেজের বিরাট অট্টালিকার চেয়ে এই কুঁড়েঘর আমার কাছে বেশি মূল্যবান। অন্য সব জায়গার চেয়ে বেশি শান্তি এবং মানসিক স্থিতি আমি এখানে পেয়ে থাকি। এবং চরখা ক্রমশই আমার প্রিয় হয়ে উঠছে। বই পড়ে পড়ে যখন আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় চরখা তখন আমার শান্তি এনে দেয়।" তালোরা একটি ছোট গ্রাম। এখানে ত্রাণ সমিতির একটি কেন্দ্র আছে। সমিতি ২০ বিঘার একটি জমি কিনেছে এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে খড়ের চালা দেওয়া বাঁশের ঘর নির্মাণ করেছে। পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া আছে। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম উপেক্ষা করায় প্রকৃতি এইভাবে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে গাছপালা আছে, যার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করা যায় না। মানুষ এই জায়গাকে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়েছে বটে কিন্তু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে এখনও অপহৃত করতে পারেনি।[৩৮]

## চরখায় রোমান্সের অভাব?

[বাংলায় ভ্রমণের সময় ছাত্রদের সঙ্গেও গান্ধীজী মিলিত হয়েছিলেন। এই রকম এক আলোচনায় জনৈক ছাত্র বলেন যে, চরখাকে তারা গ্রহণ করতে পারেননি এইজন্য যে তার মধ্যে কোন উত্তেজনা, কোন রোমান্স নেই। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গান্ধীজী লেখেন।]

আমি আমার এই ভাবপ্রবণ বন্ধুটিকে বলি যে, সে যতটা মনে করে তার চেয়েও বেশি রোমান্স চরখার মধ্যে আছে। এবং যে বাংলা দেশ বোস ও

রায়ের মত অবাস্তব ও স্বপ্নাবেশের অর্থে শুদ্ধ ভাবপ্রবণ মানুষ ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছে তার বিরুদ্ধে সে কেন অভিযোগ করবে? আমি তাকে বলি যে যাঁরা সুতা না কাটার কোন না কোন যুক্তি উপস্থিত করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশকে ভালবাসেন না। মুমূর্ষু ছেলেকে বাঁচাবার জন্য বাবা কি ডাক্তারের উপহাসযোগ্য নির্দেশ পালন করেন না? ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের যে মুমূর্ষু অবস্থা সে বিষয়ে সাক্ষাৎকারী এবং আমি একমত। চরখা তাদের এই ক্লেশকর দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমার বাংলা ভ্রমণের সময় খুবই বিস্ময়কর ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা যা আমার হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল সকল দলের পক্ষ থেকেই সুতা কাটার বিরোধিতা না করা। আমি আমার দর্শকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যে, চরখার প্রতি যদি তাঁদের বিশ্বাস না থাকে তবে যেন তাঁরা তার বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনজন ছাড়া আর কারও বিরোধিতার আমি সম্মুখীন হইনি। এই তিনজনেরও যুক্তি আমি সেদিন খণ্ডন করেছি। এমন কি যে তিনজন আমার বিরোধিতা করেছিলেন তারাও নিজেরা খদ্দর পরেছিলেন। প্রত্যেক কেন্দ্রেই সুতা কাটা প্রদর্শনী একটি নিয়মিত ব্যাপার ছিল এবং সেখানে সাঁওতাল ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বসে বড় বড় জমিদার ও আইনজীবীদের সুতা কাটতে দেখা আমার পক্ষে খুবই আনন্দের বিষয় ছিল। সুতরাং ভাবপ্রবণ বিরোধিতার কোন ভিত্তি নেই। দুঃখের বিষয় পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া আর কোন বিষয়েই সাধারণ ছাত্রদের মনোনিবেশ নেই। দেশের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট পাওয়ার চেয়ে মহত্তর অভিপ্রায় হওয়া উচিত। বীজগণিতের সমস্যা সমাধানের মধ্যে অথবা দীর্ঘ যোগ ও গুণবহুল অঙ্ক কষার মধ্যে যে রোমান্স আছে সুতা কাটার মধ্যেও তা আছে। বাঙালী ছেলেরা যদি তাদের পরীক্ষায় রোমান্সের অভাব আছে এই অভিযোগ উত্থাপন না করেন তবে সুতা কাটার জন্য সেই অভিয়োগ করার কোন কারণ তাঁদের নেই। কেননা পরীক্ষা একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন সুতা কাটা একটি জাতির পক্ষে ঠিক ততটাই প্রয়োজন।৫৯

## বাংলা দেশের খাদি সংস্থা : অভয় আশ্রম, প্রবর্তক সংঘ

[ বাংলা ভ্রমণের সময় জনৈক বন্ধুর সঙ্গে নিম্নরূপ আলোচনা হয়। বন্ধুটি প্রশ্ন করলে গান্ধীজী তার উত্তর দেন। ]

'মহাত্মাজী, আমরা সেই পুরাতন ভুলের পুনরাবৃত্তি করছি। ১৯০৫-০৮ সালে

আমরা তাদের ঘর তৈরী করেছিলাম। সেটি তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গিয়েছিল। সেই জিনিসের পিছনে এখন আবার আমরা চলেছি।'

'আপনি আগেকার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এখনকার তুলনা করেছেন? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এখন আমাদের আতসবাজির খেলা নেই, এখনকার কাজ শান্ত।'

'তা জানি, কিন্তু এর জন্য কোন সংস্থা নেই।'

'মাফ করবেন, অবস্থা সম্পর্কে আপনি একেবারেই অজ্ঞ। আপনি কি জানেন যে, উদাহরণস্বরূপ বাংলা, তামিলনাদ এবং গুজরাটে আমাদের শ্রেষ্ঠ সংস্থা রয়েছে? আপনি কি মনে করেন যে, খাদি প্রতিষ্ঠান এবং কুমিল্লার অভয় আশ্রমের মত প্রতিষ্ঠান মরে যাবে?'

'কিন্তু কতদিন তারা চলবে? খোরাকীর ভাতার উপর আমরা বেঁচে আছি এবং আমাদের যুবকদের অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে বলছি। এইভাবে কতদিন চলবে?'

'কতদিন? কেন, আমাদের সমগ্র ইতিহাস তো এর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আপনি কি মনে করেন যে, আপনাদের যুবকদের চরিত্র-বল নেই? তারা তাদের চোখ খুলে এই কাজে গিয়েছে এবং যা কিছু ঘটুক না কেন তারা এই কাজ ছেড়ে দেবে না। কিছুদিন আগে আমি অভয় আশ্রমে গিয়েছিলাম। এটি এক সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। এখানে কতকগুলি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর কুটির আছে। একটি সুন্দর পুকুর ও খানিকটা খোলা জায়গা আছে। তাঁরা নিজেরা তাঁদের রান্না করে নেন, সাফাইয়ের কাজও নিজেরা করেন এবং হাসপাতালের আয় থেকে নিজেদের ভরণপোষণ চালান। ডাং সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ছেলেমানুষ নন। তিনি তাঁর কাজ বোঝেন। তাঁর নিজের এবং সহকর্মীদের যা কিছু ঘটুক খদ্দরের যাতে ক্রমাগত উন্নতি হয় তা তিনি দেখবেন। আর খাদি প্রতিষ্ঠান? আপনি বলছেন এর দাম বেশি। এর কাপড়ের চাহিদা এত বেশি যে, এ তা সরবরাহ করতে পারছে না। সতীশ-বাবুর কাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বন্যাপীড়িত এলাকায় আপনি কখন গিয়েছেন? বন্যাত্রাণ থেকে তারা স্থায়ী ত্রাণ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, খাদি প্রতিষ্ঠান খোরাকী ভাতায় বিশ্বাস করে না। এ তার কর্মীদের বাজার দরে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে।'

'কিন্তু এইসব আপনার এখানে আসার ফলেই তো ঘটেছে।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি একে স্ফোটক বলতে পারেন। এটি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে, এবং সেই অবস্থাও যথেষ্ট সন্তোষজনক। সুতার হাটে আপনি যান। সেখানে দেখবেন যে, আগে যেখানে মাত্র কয়েক মণ সুতা বিক্রীত হত এখন সেখানে শত শত মণ সুতা বিক্রীত হচ্ছে। শত শত পরিবার সম্পূর্ণ উপার্জন যদি নাও হয় অন্তত অতিরিক্ত উপার্জনটুকু চরখার দ্বারা করে নিচ্ছে। হাটের দিন লোকেরা সুতাকাটার তুলার জন্ত কর্মীদের যেভাবে ঘিরে ফেলে তা দেখার মত। আপনি জিজ্ঞেস করবেন, 'কর্মীরা যদি তাঁদের কাজ থেকে অবসর নেন তবে কী হবে?' কিন্তু তাঁরা অবসর নিতে পারেন না। তাঁরা মিছিমিছি তাঁদের সুন্দর জীবন ছেড়ে আসেননি। অভয় আশ্রমের লোকেদের ধনুকে তিনটি জ্যা আছে। একটি হল হাসপাতাল, এখান থেকে তাঁরা তাঁদের অর্থাদি সংগ্রহ করে নেন। সুরেশবাবু মনে করছেন যে, এর পরিপূরকরূপে তিনি একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনা করবেন। আর তা করার যথেষ্ট প্রতিভা তাঁর আছে। খাদি হল তাঁর মূল কাজ। তাছাড়া ছেলেদের একটি বিদ্যালয় তাঁরা পরিচালনা করেন। তাঁরা আশা করেন যে, এই ছেলেদের মাধ্যমে তাঁরা জনগণের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। এ ছাড়া প্রবর্তক সংঘের কর্মীরা রয়েছেন। তাঁদের কাজের সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তবে এটুকু জানি যে, তাঁরা সংখ্যায় ২০০ জন এবং ভীষণ অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।'[৬০]

চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ একটি খুব বড় প্রতিষ্ঠান। এত দিন পর্যন্ত এরা আধা খদ্দর প্রস্তুত ও বিক্রয় করত। আমি যখন চট্টগ্রামে যাই তখন সংঘ-নায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় তাঁর কেন্দ্রকে শুদ্ধ খদ্দরে পরিবর্তন করে দেন। তিনি লিখেছেন :

"গত ২০শে অক্টোবর আমরা চন্দননগরের 'মৃণালিনী বস্ত্রালয় কন্তালয়কে' এবং কলকাতার 'প্রবর্তক এম্পোরিয়ামকে' শুদ্ধ খাদি কেন্দ্রে পরিবর্তন করে দিয়েছি। এবং সেই দিনই এই মহান পরিবর্তনের কথা আপনাকে জানিয়েছি।

"সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি এখন শুদ্ধ খদ্দরের উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুঃসাহসিক কাজের জন্ত কত বড় ঝুঁকি আমরা ঘাড়ে নিয়েছি তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।"

যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তার সংবাদ আমার চোখে পড়েনি।

সেজন্য আমি দুঃখিত। এই পরিবর্তনের জন্য আমি মতিবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে প্রত্যেক খাদি সংস্থাকেই যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে প্রারম্ভিক স্তরে তা তাঁদের সহ্য করতে হলেও শুদ্ধ খাদিতে তাঁরা অবিচলিত থাকবেন।[৬১]

খদ্দরের প্রচার যেভাবে কর্মীদের গুণাবলী সব দিকে বিকশিত করে দিচ্ছে তা খুবই বিস্ময়কর। কেবল উৎপাদনই যথেষ্ট নয়। খাদিরও ক্রমাগত উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। উৎপাদনের খরচকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং বিক্রয়কেও উৎপাদনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। খাদি প্রতিষ্ঠান এই পথ দেখাচ্ছে। বাংলা দেশ যেভাবে তার উৎপাদন স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করে নিচ্ছে সে সম্পর্কে আমি আমার মত আগেই প্রকাশ করেছি। জানুয়ারী মাস থেকে ১৭ই মার্চের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ১৪টি জেলার ৪১টি স্থানে ঘুরে ঘুরে ২৫০০০ টাকার খাদি বিক্রয় করেছেন। কর্মীরা সারা বাংলা ভ্রমণের চিত্র এঁকে নিয়েছেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে তা শেষ করার আশা রাখেন। সুতরাং এখন আর সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উৎপাদন হবে না, বরং কম উৎপাদন হবে। আর একথাও বলা সম্ভব যে, যদি আরও বেশি পুঁজি নিয়োগ করা হয় তবে আরও বেশি খদ্দর উৎপাদন ও বিক্রয় করা যাবে। আদর্শ অবস্থা হল সেইটি যেখানে বিক্রয় স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন হয় এবং আর্থিক সাহায্যও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হয়। আর সেই অবস্থা আসতে বাধ্য। কেননা এইভাবে বিক্রয়ের ফলে বহু মধ্যবিত্ত লোক খাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন এবং যখন এই কাজের প্রতি তাঁদের জলন্ত আগ্রহ জেগে উঠবে তখন তাঁরা স্বভাবতই বিনা অসুবিধায় খাদির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে নেবেন।[৬২]

গত সপ্তাহে আমি পাঞ্জাবের খাদি-প্রগতির বিবরণের বিস্তৃত সার প্রকাশ করেছিলাম। আমি এখন খাদি প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ একটি বিবরণ প্রকাশ করছি। আমি এ থেকে ব্যালেন্স শীট বাদ দিয়েছি। কেননা পাঠকেরা যেসব বিষয়ে আগ্রহশীল হবেন তা ঐ বিবরণের মধ্যে আছে। যেসব বিবরণ আমি প্রকাশ করছি সেগুলি খাদি কর্মীরা ভালভাবে পড়বেন। তাহলে বিভিন্ন প্রদেশে যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তার তুলনা তাঁরা করতে পারবেন। পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন যে, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সহযোগে খাদিকে লোকপ্রিয়

করার চেষ্টা খাদি প্রতিষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রায়োগিক (টেকনিক্যাল) বিভাগটিও খুবই শক্তিশালী। যথেষ্ট অসুবিধায় প্রতিষ্ঠান নিজস্ব গৃহ সংগ্রহ করতে পেরেছে। সেখানে খাদিকে মনোহর করার জন্য প্রয়োজনীয় রং-এর এবং সাদা করার বিষয় নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে।[৬৩]

কুমিল্লার অভয় আশ্রমের ১৯২৫-২৬ সালের নিম্নলিখিত বিবরণটি খুব আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হবে। আমি পাঠকদের অনুরোধ করব যে, যেসব বিবরণ আমি প্রকাশ করছি সেগুলি তাঁরা যেন অধ্যয়ন করেন। এই বিবরণগুলি চরম অবস্থায় এবং নিশ্চয়তার সঙ্গে খাদির প্রগতি ও সম্ভাবনা প্রমাণ করে দেয়। আর কিছু তেমন ভাবে প্রমাণ করতে পারে না।[৬৪]

অভয় আশ্রম বাংলা দেশের দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম। বহু যুবক জাতির সেবার জন্য তাঁদের জীবন এখানে উৎসর্গ করেছেন। ইয়ং ইণ্ডিয়ার পাঠকেরা অভয় আশ্রমের সঙ্গে অপরিচিত নন। কেননা পত্রিকায় তার একাধিকবার উল্লেখ তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন। তাঁদের ১৯২৭ সালের বিবরণ আমার সামনে রয়েছে। ৩৫ পৃষ্ঠার চিত্র সম্বলিত এই বিবরণ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাতে খাদির ক্রমোন্নতির কথা উল্লেখিত হয়েছে। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর কর্মপরিষদের সভাপতি এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এর সম্পাদক। এর ১৩ জন সদস্য আছেন। তাঁরা নির্ভীকতা, সত্য, প্রেম, ত্যাগ, শ্রম, শুদ্ধতা এবং দেশসেবার ব্রত নিয়েছেন। আশ্রমের লক্ষ্য হল দেশমাতৃকার সেবার মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি। এর প্রধান কর্মক্ষেত্র কুমিল্লায় অবস্থিত এবং এর কাজ হল সুতাকাটা, চিকিৎসা, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, জাতীয় শিক্ষা, দুগ্ধ সরবরাহ এবং কৃষি। এর মধ্যে খাদি হল প্রধান কাজ। গত বছর আশ্রম খাদির মাধ্যমে শিল্পীদের ৬৬,০০০ টাকা বিতরণ করেছেন। তার মধ্যে তাঁতিরা পেয়েছেন ২৮,০০০ টাকা, কাটুনীরা পেয়েছেন ২৭,০০০ টাকা, যেসব মেয়েরা খাদিতে এমব্রয়ডাইরী কাজ করেছেন তাঁরা পেয়েছেন ১২০০ টাকা, ধোপারা পেয়েছেন ৩০০০ টাকার বেশি আর ৬০০০ টাকার বেশি পেয়েছেন দর্জিরা। এই বছরে এঁরা ১,৪২,০০০ টাকার বেশি খাদি বিক্রয় করেছেন। খাদি বিভাগ লাভজনকভাবে কাজ করেছে।……বস্তুত আশ্রম

আত্মোৎসর্গের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলা দেশ হল এই আত্মোৎসর্গের সুন্দরতম ভাণ্ডার। পাঠকদের আমি অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন এই বিবরণটি সংগ্রহ করে নেন, তা পাঠ করেন এবং এই মহান প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ববিধ সাহায্য প্রদান করেন।[৬৫]

বাংলা দেশের মত আর কোন প্রদেশই এমন নিদারুণভাবে বর্তমানে নির্যাতিত হয়নি। এখানকার শ্রেষ্ঠ যুবকদের কয়েকজন কেন তা না জেনেই জেলের মধ্যে পচে মরছে। এমন কি কংগ্রেসের মধ্যেও দলাদলি রয়েছে। দেশবন্ধুর পর একজনকে নেতা করার ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এখনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। এটিও কিছু আশ্চর্যের নয়। কেননা দেশবন্ধু একজনই হয়ে থাকেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলা দেশে গঠনকর্ম প্রায় বিনা বাধায় এগিয়ে চলেছে। এই কাজে যুক্ত স্বার্থত্যাগী যুবকদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। বাংলার প্রবর্তক সংঘ—যার প্রধান কেন্দ্র চন্দননগরে অবস্থিত এবং যার পরিচালক হলেন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়—খাদি উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। তবে এযাবৎ সংঘে খাদি ছিল পরিপূরক কাজ, অনেক বড় বড় কাজের মধ্যে একটি ছোট কাজ। কিন্তু মতিবাবু এখন স্থির করেছেন যে, খাদিকেই তিনি তাঁর কর্মপদ্ধতির কেন্দ্র করবেন। তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এই বিশ্বাস তাঁর হয়েছে যে, চরখাকে কেন্দ্র করে কাজ না করলে জনগণের প্রকৃত সেবা করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত ব্যাংকার এবং লক্ষ্মীদাস আমার পরে চন্দননগরে গিয়েছিলেন। তাঁরা সংঘের চরখার প্রতি উৎসাহের এবং তাঁদের কুতুবদিয়ার কাজের উজ্জ্বল বিবরণ আমার কাছে উপস্থিত করেছেন। তুলা ধোনাই ও সূতা কাটার আধুনিকতম উন্নতিগুলি শিখে নেবার জন্য মতিবাবুর আগ্রহের কথাও তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন। সংঘ বেশ পুরাতন একটি প্রতিষ্ঠান। পণ্ডিচারীর সন্ন্যাসীর কাছ থেকেই এঁরা মূল প্রেরণা পেয়েছেন এবং বাংলা দেশে অনেক স্বার্থত্যাগী নিষ্ঠাবান কর্মী এঁদের আছে।

তাঁদের জানুয়ারী মাসের খাদির হিসাব যা আমার সামনে রয়েছে তা থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা তাঁদের উৎপাদন কেন্দ্রে ৭০০ টাকার বেশি খাদি উৎপাদন করেছেন এবং ঐ মাসে খাদি বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,৪০০

টাকারও বেশি। সংঘ যদি তার শক্তিকে খাদি উৎপাদনে কেন্দ্রীভূত করতে পারে তবে কোন রকম বিরোধিতা না করেও সে শীঘ্রই খাদি প্রতিষ্ঠান ও অভয় আশ্রমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। কেননা নতুন কেন্দ্র যদি নতুন ক্ষেত্র বেছে নেয় তবে খাদি উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্র অসীম। কোন একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলা দেশের মত শক্তিমান প্রদেশের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব।[৬৬]

খাদিপ্রেমিকেরা এই কৌতুহলজনক ঘটনাটি লক্ষ্য করেছেন কিনা আমি জানি না যে, অন্য সব প্রদেশের মধ্যে কেবল বাংলা দেশই খাদি বিক্রয়ের ব্যাপারে বাংলার বাইরের খরিদ্দারের উপর নির্ভর করতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছে। বাংলা দেশে খাদি উৎপাদন যদিও সমরূপে বেড়ে চলেছে তবুও সমস্ত খাদিই বাংলার মধ্যেই বিক্রীত হয়েছে। এই বিরাট সমস্যা সমাধানের এইটিই হল উপযুক্ততম পন্থা। দেশবন্ধু যখন দার্জিলিং-এ ছিলেন তখন তিনি আমাকে বলতেন যে, সর্বজনীন কাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহের জন্য অন্য সব বিষয়ের মত খাদিতেও বাংলার নেতৃত্বের আশা খুব বড়। তিনি বলেছিলেন যে, মধ্যবিত্তদের মধ্য দিয়েই তিনি জনসাধারণের কাছে পৌছতে চান। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথমে কেবল খদ্দর পরিধান করবেন না, উপরন্তু তাঁরা হবেন তাঁর প্রথম ঐচ্ছিক কাটুনী। এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, মধ্যবিত্তদের প্রভাবেই জনতার মধ্যে খাদি ও চরখাকে প্রতিষ্ঠিত করানো যাবে। দেখা যাচ্ছে যে, অন্য প্রদেশের তুলনায় বৃহত্তর আকারে বাংলা দেশে বিস্ময়কর বস্তু সংঘটিত হচ্ছে।

দুটি বৃহৎ খাদি সংস্থা—খাদি প্রতিষ্ঠান এবং অভয় আশ্রম—বিক্রয়ের জন্য বাংলার বাইরে খাদি পাঠানোর বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার ফলে মধ্যবিত্তদের প্রয়োজনমত খাদি তাঁরা বুনে নেন। এই কারণে তাঁরা মাঝে মাঝে নিজেদের কাজের পরীক্ষা করে নিতে পারেন এবং একটি উচ্চ সীমা বজায় রাখতে সক্ষম হন। উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মত তাঁদের বিক্রয়কেন্দ্রগুলিও সুসংগঠিত। আমি মনে করি যে, সমগ্র ভারতবর্ষের কর্মীরা যদি বাংলা দেশের উদাহরণ অনুসরণ করেন এবং স্থানীয়ভাবে তাঁদের বিক্রয়কে সংগঠিত করেন তবে অনেক সময় এবং অর্থ বেঁচে যাবে এবং খাদির প্রগতি দ্রুততর হবে।[৬৭]

## বাংলা দেশের খাদি কর্মী

অখিল ভারত চরখা সংঘ তাঁদের অধ্যয়ন সমিতিতে অনুমতিসাপেক্ষ ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নাম নির্বাচন করেছিলেন। ডঃ ঘোষ তাঁর প্রধান কেন্দ্রের বাইরে থাকায় নাম প্রকাশ করার সময় পর্যন্ত তাঁর সম্মতি এসে পৌঁছায়নি। সেজন্য শেষ মুহূর্তে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ডঃ ঘোষ এখন অনুগ্রহ করে এই পদ গ্রহণে সম্মতি জানিয়েছেন। পাঠকেরা এটি জেনে খুবই খুশী হবেন যে, সমিতি এমন একজন লোকের সহযোগিতা পাবেন যিনি চরখা ও খাদি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন এবং সে সম্বন্ধে যাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে।[৬৮]

খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ভারত রক্ষা আইনের অন্তর্গত ২৬ (১) ধারা অমান্য করার অপরাধে গ্রেপ্তার এবং দু বছরের কারাবাসে দণ্ডিত হয়েছেন। তাঁর অপরাধ হল এই যে, তিনি দুর্দশাগ্রস্ত লোকেদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন যেমন জায়গায় থাকে সেই রকম একটি জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের জায়গা থেকে চলে না যায়। হরিজনে আমি যে লেখা লিখেছিলাম এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সতীশবাবু নির্ভুলভাবে তা অনুসরণ করেছেন।

সতীশবাবুর এই আইন-অমান্য ইচ্ছাকৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যত্র প্রকাশিত জেলা শাসককে লিখিত তাঁর চিঠি থেকে এই কথা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, মানবতাবোধের নির্দেশে তিনি এই কাজ করেছেন। সতীশবাবু এবং তাঁর কর্মীরা এই অঞ্চলে বহু বছর কাজ করেছেন এবং কাটুনী ও তাঁতিদের লক্ষ লক্ষ টাকা বণ্টন করেছেন। সতীশবাবুর চিঠিতে দেখা যায় যে, তাঁদের অভিযোগ সত্য। মানুষের মন ও দেহের দাসত্বমোচন যে মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য বলে দাবি করা হয়েছে সেই যুদ্ধ কখনই যাদের স্বেচ্ছায় সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং চাওয়া উচিত তাদের দমিত করে জয়লাভ করা যায় না। ভারতবর্ষের জনগণকে অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। তারা বিনীত এবং ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশি ভদ্র। তাদের সহজেই পরিচালনা করা যায়। তারা তাদের নেতাদের অনুসরণ করে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে আসতে হলে তাদের নেতাদের সম্পর্কে আসতে হয়।

নেতা দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে : এক, যারা 'আপনি মোড়ল'—এরা জনগণকে শোষণ করবার জন্য নেতা হয়, আর দ্বিতীয়, যারা জনগণের সেবা করার অধিকারে নেতা হয়। এরা বিশ্বস্ত মানুষ। এই দুই জাতের লোককে সহজেই চেনা যায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের জনসাধারণের কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায় না।

সতীশবাবু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। তিনি রাজনীতি জানলেও রাজনীতি করেন না। তিনি একজন ব্যবসায়ী। আচার্য রায়—যিনি একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, জীবনভোর বিশ্বপ্রেমিক এবং যিনি নিজের জন্য একটি পয়সাও উপার্জন করেননি—তাঁর প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম হলেন সতীশবাবু। সতীশবাবু বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা—এটিও আচার্য রায়ের অনেক সৃষ্টির একটি। সতীশবাবু বেঙ্গল কেমিক্যালের উচ্চ বেতনের ম্যানেজারের চাকরি ত্যাগ করেন। তিনি খাদিকে গ্রহণ করেন এবং দরিদ্র মানুষে পরিণত হন। তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী মনেপ্রাণে তাঁর এই দারিদ্র্যকে স্বীকার করে নেন। তাঁর ভাই এবং তাঁর ছেলেরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। এই সব ছেলেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং যখন তিনি চাকরি করতেন তখনই তাদের একজন মারা যায়। তাঁর ভাই ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও একজন রসায়নবিদ। তিনিও খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং মৌমাছি পালন, কাগজ তৈরী প্রভৃতি হস্তশিল্পে তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করেন। সতীশবাবু নিজে যে উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন তা থেকে তাঁর ছেলেদের বঞ্চিত রেখেছেন। তিনি এত বেশি উৎসাহে এই নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন যে, তিনি খাদির একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়েছেন এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান সেবামূলক কাজের একটি মহান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সতীশবাবু শ্রেষ্ঠ, সৎ ও ভদ্র ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি সত্য ও অহিংসাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধনরূপে গ্রহণ করেননি, করেছেন জীবনের নীতিরূপে। এবং সর্ব শক্তি দিয়ে তিনি সত্য ও অহিংসার আদর্শে জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। বিজেতাদের পক্ষে শোষণের নীতিতে এই দেশকে শাসন না করে যদি জনপ্রিয় প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন করা হত তবে যাঁরা শাসকের আসনে বসে আছেন তাঁদের প্রয়োজনে সতীশবাবুর মত লোকেদের দরকার হত। এখন সেই বিরাট প্রয়োজনের সময় সমুপস্থিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রয়োজন অনুভব

করলেন শুধু তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য। আর তাও যে আইন জাতির অভিব্যক্তি নয়, বরং যে মানুষের শাসন জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কেবল তার ইচ্ছার প্রকাশ, সেই আইন ভঙ্গ করবার জন্য। সতীশবাবু একটি দীপ জ্বেলেছেন, তা নির্বাপিত হবে না। আইনটিই অন্যায়, জনগণের সেবক সতীশবাবু ভুল করেননি।[৬৯]

[ ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী কুমিল্লার অভয় আশ্রমে কয়েক দিন অবস্থান করেন। সেখানে প্রার্থনান্তিক ভাষণে অভয় আশ্রমের ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের কাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন। ]

আপনারা হলেন পথিকৃৎ এবং ঠিক যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর মত। আপনারা এই দুটি স্রোতের মত হয়ে যান। আমি যখন আপনাদের কথা ভাবি তখন একটি ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দুটি সুন্দর ঘোড়া পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে, খদ্দরের গাড়িকে পূর্ণ গতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আপনারা আপনাদের উৎপাদনের জন্য প্রদেশের বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন না। সেদিক থেকে আপনারা অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। আপনারা বাংলা দেশের মেয়েদের আপনাদের ইচ্ছার দিকে নত করেছেন। সেই সম্মান তাঁদের প্রাপ্য—আজ তাঁরা আপনাদের সরবরাহ করা শাড়ী পরার গর্বে গৌরবান্বিত। সুতরাং আপনাদের একের শক্তি এবং দুর্বলতা অপরের শক্তি ও দুর্বলতায় পরিণত হোক এবং খাদি প্রতিষ্ঠান ও অভয় আশ্রম অসুবিধার সময় একে অপরের সাহায্যের আশা করুক।[৭০]

[ নোয়াখালি থেকে শ্রীমতী কিরণপ্রভা চৌধুরী তাঁর সুতায় প্রস্তুত একটি সুন্দর খাদি গান্ধীজীকে উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর জনৈক বন্ধু একটি চিঠিতে কিরণপ্রভার সুতা কাটার প্রতি নিষ্ঠার উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, কিরণপ্রভার বয়স যখন মাত্র সতের তখনই তিনি তাঁর সমস্ত কাপড় নিজের হাতের সুতা থেকে তৈরী করে নিতেন। অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে অক্ষম না হলে তিনি গত ২৪ বছর ধরে প্রতিদিন ১০০০ গজ করে সুতা কেটে আসছেন। চিঠিটি প্রকাশ করে গান্ধীজী নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন। ]

খাদির প্রতি নিষ্ঠার জন্য আমি বোনটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি তুলা গাছ করার উপর যে জোর দিয়েছেন তা সমগ্র ভারতের খাদি-অভিজ্ঞরা সমর্থন করেছেন। সারা ভারতের একটি বড় ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করা উচিত। বস্তুত তার জন্য বড় অঙ্কের টাকার প্রয়োজন নেই। আর এ কথা যদি সত্য হয় যে, গাছ কাপাসের ধোনাই করার দরকার হয় না তবে সাধারণ চারা গাছের তুলা থেকে তা অনেক বেশি সুবিধাজনক। আমি চাই যে, যাঁরা গাছ কাপাসে সুতা কাটেন তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাকে জানাবেন এবং সম্ভব হলে তাঁদের তুলা, সুতা ও তুলা বীজের নমুনা আমার কাছে পাঠাবেন।[৭১]

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ব্যক্তি-প্রসঙ্গ : গুণগ্রাহিতা

### রামকৃষ্ণ পরমহংস

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন-কাহিনী ধর্মকে অভ্যাস করার কাহিনী। তাঁর জীবন আমাদের ভগবানকে মুখোমুখি দেখতে সমর্থ করে দেয়। তাঁর জীবন-কাহিনী পাঠ করে কারও মনে এই বিশ্বাস উদ্রিক্ত না হয়ে পারবে না যে, এক-মাত্র ঈশ্বর সত্য আর সব কিছু মায়া। রামকৃষ্ণ ছিলেন দেবভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর কথাগুলি নিছক শিক্ষিত লোকের কথা নয়, তা হল জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা। সেগুলি হল তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। সুতরাং সেগুলি পাঠকের মনে একটি ধারণার সৃষ্টি করে, যাকে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেন না। এই সংশয়বাদের যুগে রামকৃষ্ণ প্রোজ্জ্বল ও জীবন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। সেই বিশ্বাস হাজার হাজার স্ত্রী ও পুরুষকে সান্ত্বনা দিয়েছে, যাঁরা তা না পেলে আধ্যাত্মিক আলোকশূন্য থেকে যেতেন। রামকৃষ্ণের জীবন অহিংসার বাস্তব-রূপায়ণ। তাঁর স্বর্গীয় প্রেম সকলের প্রেরণার বস্তু হয়ে উঠুক।[৭২]

### লালমোহন ঘোষ

[ শ্রীলালমোহন ঘোষ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় গান্ধীজী ১৯০৩ সালে 'জাতীয় কংগ্রেস ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়' এই নাম দিয়ে একটি লেখা প্রকাশ করেন। নিচে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল। ]

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন-এর এই সংখ্যাটি যখন ভারতবর্ষে পৌঁছবে তখন এই

জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের প্রস্তুতিপর্ব অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়ে থাকবে। শ্রীলালমোহন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ ও যোগ্য দেশসেবা এবং তাঁর অনুপম বাগ্মিতা যে-বিরাট জনতাকে আকৃষ্ট করবে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। লালমোহনবাবু রাজনীতিতে প্রবীণ, কি করে দেশবাসীর এবং গভর্নমেণ্টের সহানুভূতির উদ্রেক করানো যায় তা তিনি জানেন। ইংলণ্ডে বহু শ্রোতাকে তিনি তাঁর বক্তৃতার দ্বারা রোমাঞ্চিত করেছেন এবং আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁর কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ ভারতীয়েরা যথোচিত ব্যবহার লাভ করবেন।[৭৩]

## রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্য জগতে একজন দীপ্যমান গ্রন্থকার রূপে পরিচিত। গাইকোয়াড়ের মহারাজা নিজে একজন খুবই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। তিনি যোগ্য উপদেষ্টাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হলেন শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।[৭৪]

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমরা এই পত্রিকায় ইতিমধ্যে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রী ও পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছি। এই জীবনী প্রকাশের উদ্দেশ্য হল পাঠকদের উদ্বোধিত করা এবং এইসব স্ত্রী-পুরুষের সমকক্ষ হয়ে নিজেদের জীবনকে কার্যকর করতে তাঁদের সক্ষম করে তোলা।

বাংলা দেশে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের যে আন্দোলন চলেছে তার তাৎপর্য কম নয়। এই জাতীয় আন্দোলন যে সেখানে সম্ভব হয়েছে তার কারণ হল সেখানে শিক্ষা বেশি বিস্তৃত এবং সেখানকার জনগণ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বেশি সচেতন। হেনরী কটন বলেছেন যে, বাংলা কলকাতা থেকে পেশোয়ারকে দোলা দেয়। এর কারণ কী তা জানা দরকার।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একটি জাতির উত্থান-পতন সেই জাতির মহৎ লোকেদের উপর নির্ভর করে। যে জনসাধারণ ভাল লোক সৃষ্টি করে থাকে সেই জনতা ঐসব লোকের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে না। বাংলা দেশের যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আমাদের চোখে পড়ে সেটির কারণ হল এই যে, সেখানে

গত শতাব্দীতে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে এক-একজন বীর্যবান ব্যক্তি বাংলা দেশকে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে উন্নীত করে দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। 'বিদ্যাসাগর'—যার মানে হল জ্ঞানের সমুদ্র—কথাটি ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সম্মানসূচক উপাধি। সংস্কৃতে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য কলকাতার পণ্ডিতেরা এই উপাধিটি ঈশ্বরচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যার সাগরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন করুণা, ঔদার্য এবং আরও অনেক গুণের সাগর। তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান সবাই ছিল সমান। তিনি যেসব ভাল কাজ করেছিলেন তাতে ছোট-বড়র কোন ভেদাভেদ ছিল না। একবার তাঁর একজন অধ্যাপকের কলেরা হলে তিনি নিজেই তাঁর শুশ্রূষা করেন। অধ্যাপকটি গরীব ছিলেন। তাই ঈশ্বরচন্দ্র নিজব্যয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিজেই রোগীর কাপড়চোপড় কেচেছিলেন।

তিনি চন্দ্রননগরে নিজের পয়সায় লুচি-দই কিনে গরীব মুসলমানদের ভোজন করাতেন এবং যাদের প্রয়োজন তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। রাস্তার ধারে কোন পঙ্গু বা দুর্দশাগ্রস্ত লোককে দেখতে পেলে তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং নিজে তার সেবা করতেন। অপরের দুঃখে তিনি দুঃখ পেতেন এবং অপরের আনন্দে আনন্দিত হতেন।

তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর পোশাক ছিল মোটা ধুতি, দেহ আচ্ছাদনের জন্য সেই জাতীয় একটি চাদর এবং একজোড়া চটি। এই পোশাকেই তিনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতেন এবং গরীবদের সম্ভাষণ করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত ফকির, সন্ন্যাসী এবং যোগী। তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা আমাদের সকলের পক্ষে উপযুক্ত কাজ।

মেদিনীপুর তালুকের এক গণ্ডগ্রামে গরীব মা-বাবার ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মা খুব সাধ্বী মহিলা ছিলেন এবং তাঁর অনেক গুণ ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। সেই যুগেও তাঁর বাবা কিছু ইংরেজী জানতেন এবং ছেলেকে ভাল শিক্ষা দেবার কথা ভেবেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু করেন। আট বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হবার জন্য তাঁকে ৬০ মাইল পথ হেঁটে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। তাঁর স্মৃতি এমন বিস্ময়কর ছিল যে, রাস্তা দিয়ে হাঁটার

সময় রাস্তার ধারের মাইল-স্টোনের লেখা দেখে তিনি ইংরেজী সংখ্যাগুলি শিখে ফেলেছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যে কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন ক্রমশ উপরে উঠে সেখানকার তিনি অধ্যক্ষ হন। সরকার তাঁকে খুব সম্মানের চোখে দেখতেন। স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি এবং তিনি তাই পদত্যাগ করেছিলেন। বাংলার লেফটন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তা সরাসরি অস্বীকার করেন।

এই কাজ ছাড়ার পরই তাঁর মহত্ত্ব এবং মানবতা প্রকৃতরূপে পুষ্পিত হয়েছিল। তিনি দেখেন যে, বাংলা খুবই সুন্দর ভাষা, কিন্তু নতুন নতুন সংযোজনের অভাবে তাকে দরিদ্র ভাষা বলেই মনে হয়। সেজন্য তিনি বাংলা ভাষায় বই লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি খুব প্রভাবশালী বই লিখেছিলেন। প্রধানত বিদ্যাসাগরের জন্যই বাংলা ভাষা আজ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু তিনি এটিও অনুভব করেছিলেন যে, কেবল বই লেখাটাই যথেষ্ট নয়। তাই তিনি অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরই হলেন কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। এই কলেজের সমস্ত শিক্ষক হলেন ভারতীয়।

প্রাথমিক শিক্ষাও যে উচ্চতর শিক্ষার মত প্রয়োজনীয় এই কথা উপলব্ধি করে তিনি গরীবদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। এটি ছিল এক বিশাল কাজ আর তার জন্য সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। লেফটন্যান্ট গভর্নর তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, সরকার এই খরচ বহন করবেন। কিন্তু ভাইসরয় লর্ড এডিনবারো এর বিরোধিতা করেন এবং বিদ্যাসাগর যে বিল পেশ করেছিলেন তা গৃহীত হয়নি। লেফটন্যান্ট গভর্নর এতে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরকে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা জাহির করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বীর ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন, "মহাশয়, নিজের প্রতি ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কখনো আদালতের শরণ নিইনি। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধে আমি কি করে মামলা রুজু করব ?" যেসব ইউরোপীয় ভদ্রলোক ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহায্য করতেন তাঁরা এই সময় তাঁকে আর্থিক সহায়তা

প্রদান করেন। তিনি নিজে খুব ধনী ছিলেন না। তাই অন্য লোকেদের বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তবু তাঁর জন্য যখন জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তোলার প্রস্তাব করা হয় তখন তিনি তা নাকচ করে দেন।

উচ্চতর এবং প্রাথমিক শিক্ষার এইভাবে সুদৃঢ় গোড়াপত্তন করে দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। তিনি দেখেন যে, মেয়েদের শিক্ষা না দিয়ে কেবল ছেলেদের শিক্ষা দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। তিনি মনু থেকে একটি শ্লোক বার করেন যাতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াকেও কর্তব্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'অত্যাবশ্যক সেবা'—এই বিষয়ে তিনি একটি বই লেখেন এবং মিঃ বেথুনের সহযোগিতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা মেয়েদের কলেজে নিয়ে আসাটা খুবই শক্ত কাজ ছিল। সেজন্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে তিনি মিলিত হন এবং তাঁদের বাড়ির মেয়েদের কলেজে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেন। এইভাবে তাঁদের মেয়েরা কলেজে পড়তে আরম্ভ করে। আজ সেই কলেজে বিশুদ্ধ চরিত্রের অনেক পরিচিত ও মেধাবী স্ত্রীলোক আছেন যাঁরা এমন কি এই কলেজের ব্যবস্থাপনার কাজও নিজেরা চালিয়ে নিতে পারেন।

তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বিদ্যালয়ে বিনা পয়সায় খাদ্য বস্ত্র এবং বই দেওয়া হত। এর পরিণামে এখন কলকাতায় হাজার হাজার শিক্ষিত স্ত্রীলোক দেখতে পাওয়া যায়।

শিক্ষকের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের স্থাপনা করেন।

হিন্দু বিধবাদের দয়নীয় অবস্থা দেখে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের সমর্থন করেন। এই বিষয়ে তিনি বই লেখেন এবং বক্তৃতা দিতে থাকেন। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণেরা তাঁর বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেন না। লোকেরা তাঁকে হত্যা করবে বলে ভয় দেখায়, কিন্তু তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যান। তিনি অনেক লোককে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁদের বালবিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজের ছেলেকেও একজন গরীব বিধবাকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করেন।

কুলীন ব্রাহ্মণদের অনেক স্ত্রী থাকত। তাঁরা বারোকুড়ি বিবাহ করতেও

লজ্জা পেতেন না। এই সব মেয়েদের দুর্দশা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুমোচন করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কু-প্রথা দূর করার জন্য প্রয়াস করে গিয়েছিলেন।

যখন তিনি দেখেন যে, ম্যালেরিয়ায় বর্ধমানের লোকেরা কষ্ট পাচ্ছে তখন তিনি নিজের পয়সায় সেখানে একজন ডাক্তার রেখেছিলেন এবং নিজের হাতে তাদের ওষুধ বিতরণ করেছিলেন। তিনি গরীবদের বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেছিলেন। এইভাবে দু বছর ধরে তিনি অবিরাম কাজ করেছিলেন। গভর্নমেণ্টের সাহায্য তিনি আদায় করেছিলেন এবং সেখানে আরও ডাক্তার আনিয়েছিলেন।

এই কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন, তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং অসুস্থদের ওষুধ দিতে আরম্ভ করেন। দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক দূর পর্যন্ত যেতেও তিনি কিছু মনে করতেন না।

বিপদের সময় বড় বড় রাজাদের সাহায্য করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সমান বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁদের কারুর প্রতি যদি অন্যায় করা হত, তাঁদের কেউ যদি গরীব হয়ে পড়তেন তবে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি, তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর অর্থ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন এবং তাঁকে বিপদ থেকে মুক্ত করতেন।

এইভাবে কাজ করতে করতে ১৮৯০ সালে সত্তর বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই পৃথিবীতে তাঁর মত খুব অল্প লোকই আছেন। বলা হয়ে থাকে যে, ঈশ্বরচন্দ্র যদি ইউরোপে জন্মগ্রহণ করতেন তবে নেলসনের জন্য ব্রিটিশেরা যেমন স্মারক নির্মাণ করেছেন তাঁর জন্যও তেমনি এক চিত্তাকর্ষক স্মারক স্তম্ভ নির্মিত হত। যাই হোক, বাংলা দেশের ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সকলের হৃদয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য সম্মানের সৌধ ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়ে গিয়েছে।

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারব যে, বাংলা কিভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছে।[৭৫]

## উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা দুঃখের সঙ্গে শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি। তিনি ছিলেন বর্তমান সময়ের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দেশসেবকদের একজন। বলা যায় যে, স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সব নৌরজী-দলের দেশভক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁদের সময় ও বুদ্ধি দেশের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যারিস্টারদের একজন ছিলেন এবং আদালতী বাগ্মিতা ও আইনগত সূক্ষ্মদৃষ্টির ফলে তিনি জীবিকার প্রাথমিক অবস্থাতেই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি যে অস্বাভাবিক প্রভাব-শক্তি লাভ করেছিলেন তা তাঁর দেশের কল্যাণে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন এর প্রথম সভাপতি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশের কাজে তিনি তাঁর পয়সা দু হাতে খরচ করেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস, তিনি নিজেই ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ ফল। তাই ক্রইডনে তিনি একটি বাড়ি কিনেছিলেন এবং সেখানে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দেখার জন্য অর্ধেক সময় ব্যয় করতেন। তাতে এই স্বর্গীয় দেশসেবকের ছেলে এবং মেয়েরা উদার শিক্ষালাভ করেছেন এবং তাঁদের বাবার মতই সেই শিক্ষাকে তাঁরা দশের কাজে লাগাচ্ছেন।

আজকের ভারতীয় যুবকেরা উমেশচন্দ্রের জীবন থেকে অনেক কিছু শিক্ষা পেতে পারে। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই হবে যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। উমেশচন্দ্রের পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ সহানুভূতি জানাচ্ছি। তাঁদের ক্ষতি সমগ্র ভারতবর্ষেরও ক্ষতি।[৭৬]

## সরলা দেবী চৌধুরাণী

সরলা দেবী কয়েক দিনের জন্য আমেদাবাদে এসেছিলেন। সুতরাং 'নব-জীবনের' পাঠকদের কাছে তাঁর সম্পর্কে আরও সংবাদ পরিবেশন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাধারণভাবে সকলেই সরলা দেবীর সম্পর্কে এই কথা শুনেছেন যে, তিনি একজন বিদুষী মহিলা, যিনি দশের কাজ করছেন। তাঁর বিশেষ পরিচয় হল, তিনি হলেন স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী, কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক সুপরিচিত মিঃ ঘোষালের কন্যা এবং পাঞ্জাবের বিখ্যাত পণ্ডিত

রামভুজ দত্তচৌধুরীর স্ত্রী। তিনি ১৯ বছর বয়সে বি. এ. পরীক্ষা পাস করেন এবং তখন থেকে কোন না কোন ভাবে দেশের কাজ করে আসছেন। তিনিই প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশ করেন এবং বলা হয়ে থাকে যে, সেখানে তিনি তাঁর লেখনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবি-প্রতিভা খুব উঁচুদরের এবং বারাণসীতে তিনি যে মিষ্টি গান, 'বন্দি তোমায় ভারত-জননী' গেয়েছিলেন তা সারা দেশে পরিচিত। বাংলা দেশে সমিতি গঠনে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন সেই সমিতি শিক্ষিত বাঙালীদের যুদ্ধে যোগদান করার কথা বলতে থাকে। সেই সমিতিতে এই মহিলার মত ক্ষমতাশালিনী আরও কেউ কেউ ছিলেন। পাঞ্জাবের আন্দোলনেও তাঁর যে হাত আছে তা আমরা দেখেছি। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা তাঁর কবিতা লেখার শক্তিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনেই তাঁর ডাক আসে। পণ্ডিত রামভুজ চৌধুরীর মধ্যেও কবিত্বশক্তি রয়েছে। তাঁর একটি কবিতা খুবই শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়। এটি গুরুমুখী ভাষায় লেখা এবং হাজার হাজার লোক এটি গেয়ে থাকেন। কংগ্রেসের অধিবেশনেও এটি গীত হয়েছিল। সরলা দেবীই এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে এটি শিখিয়েছিলেন। সত্যাগ্রহীদের গান রূপে এটি ব্যবহৃত হতে পারে মনে করে আমরা গানটি এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করলাম। শক্ত কথাগুলির মানেও দেওয়া হল।[৭৭]

## রাসবিহারী ঘোষ

বাংলা দেশের বিখ্যাত ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ডঃ রাসবিহারী ঘোষ গত সোমবার ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর জ্ঞান অতলস্পর্শী। তাঁর দানও তেমনি মহান। তাঁর দেশপ্রেমও সাধারণ রকমের ছিল না। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বহু যুবককে লজ্জা দিয়েছে। ইংরেজী ভাষায় তাঁর দক্ষতা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁকে বিগত যুগের মানুষ বলে গণ্য করা হবে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত জ্ঞানীরা বিদেশী শাসন ও বিজাতীয় শিক্ষার ফলে কিভাবে অকেজো হয়ে যান ডঃ রাসবিহারী ঘোষ তার জলন্ত উদাহরণ। যৌবনে মাতৃভাষা চর্চা করার পরিবর্তে তিনি ইংরেজী ভাষার লিখন-শৈলী অধ্যয়ন করেন এবং তাতে ইউরোপীয়ান লেখকদেরও অতিক্রম করে যান। জীবন সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর উপর অবলম্বিত আইনের বিষয় ও প্রতীচ্যের অনুধ্যান স্পষ্ট করতে এবং সেগুলি ব্যাখ্যা করতে তিনি তাঁর অতলস্পর্শী

পাণ্ডিত্যকে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে যোগদান করার পরে তিনি কেবল জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্যকেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সুরাটে তিনি যে নীতি সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিলেন তা এই বছর নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসকে সংশোধন করতে হয়েছে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ লক্ষ টাকা দান করেছেন এবং এই শর্ত স্থাপন করেছেন যে, এই বৃত্তির টাকা থেকে যে অধ্যাপককে নিয়োগ করা হবে তাঁকে অবশ্যই ভারতীয় হতে হবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও তিনি বহু টাকা দান করেছেন। এইভাবে তিনি তাঁর যোগ্যতাকে বিদেশী ভাষা অধ্যয়নে, তাঁর বুদ্ধিকে সরকারী আদালতগুলিকে সাহায্য করতে, তাঁর অর্থ সেই গভর্নমেণ্টের শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে যার নীতির প্রতি তাঁর নিজেরই আস্থা নেই এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে জাতীয় আদর্শকে সংযত করতে নিয়োজিত করেছিলেন। তথাপি তিনি যদি স্বাধীনতার যুগে জন্মগ্রহণ করতেন তবে তাঁর জীবন সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকত এবং তাঁর সেবা সমগ্র বিশ্ব উপলব্ধি করতে পারত। বিধান-সভায় যে দুটি প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিয়েছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় জনগণ তাদের দেশের প্রতি যে অপরিমিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করে তার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি যদি জাতীয় শিক্ষা লাভ করতেন তবে ঐ অনুভূতি ও ভালবাসা তাঁর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হত এবং তিনি দেশের মহৎ সেবা করার অবস্থায় উপনীত হতেন। গভর্নমেণ্ট তাঁকে যতটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল জনগণ ততটা পারেনি। কেননা পশ্চিম গোলার্ধের সংস্কৃতির মধ্যেই সীমিত থাকার ফলে তিনি তাঁর নিজের জনগণের কাছে প্রায় বিদেশী হয়ে পড়েছিলেন। যাই হোক, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম আজও সকলের কাছে অনুকরণযোগ্য।[৭৮]

## সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর একটি কথা আমি সংযোজন করতে চাই। আমি বরিশালে গিয়ে শুনেছিলাম যে, সুরেন্দ্রবাবু যখন বরিশালে এসেছিলেন তখন তাঁকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল। এই কথা শুনে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। অসহযোগীরা কাউকে ধিক্কার দিতে পারেন না—এমন কি তাঁদের জঘন্যতম শত্রুকেও তাঁরা ধিক্কার দেবেন না। ধিক্কার দেওয়াটাও এক ধরনের হিংসা। আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধিক্কার দেওয়ার মানে হল

নিজেদের ভুলে যাওয়া। আজ তাঁর সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ আছে। কিন্তু তাঁর অতীত সেবার কথা আমরা ভুলতে পারি না। তিনি ছিলেন এক দিন বাংলা দেশের প্রতিমূর্তি। তিনি আমাদের মনোভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা কি আজ তাঁকে ধিক্কার দিতে পারি? আমাদের মতের সঙ্গে যে নেতা সহমত নন তিনি কখনই দেশের শত্রু হতে পারেন না। আমরা তাঁর সভায় উপস্থিত না হতে পারি। উপস্থিত হলে, তাঁর বিরোধিতা করতে পারি। কিন্তু আমাদের বিরোধিতা এবং মতভেদ সৌজন্যতার সঙ্গে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত হওয়া উচিত, বিশেষ করে কোন প্রবীণ নেতার বিরুদ্ধে যখন আমরা বিরোধিতা করি।[৭৯]

[ ১৯২১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বাংলা দেশের কয়েকজন প্রতিনিধি আমেদাবাদে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেশে অহিংস অসহযোগের পরিবেশ তখন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ এই নীতিকে পুরাপুরি সমর্থন করেননি। তার ফলে বাংলা দেশ তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ। জনৈক প্রতিনিধি যখন প্রশ্ন করেন যে, তাঁদের কাজের পদ্ধতি কী হবে, তখন তার উত্তর দিতে গিয়ে গান্ধীজী প্রসঙ্গত বাংলা দেশের অবস্থা এবং সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের কথাও উল্লেখ করেন। দীর্ঘ আলোচনার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উধৃত করা হল। ]

আমি জানি যে, বাংলা দেশে আজ খুব অসহিষ্ণুতা রয়েছে আর তার জন্য অনুদারতাও রয়েছে। আর আমি জানি যে, আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না যদি আমি বলি যে, নিজেদের মধ্যে তিক্ততা এবং তজ্জনিত অসহিষ্ণুতা যতটা আমি বাংলা দেশে দেখেছি ততটা ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখিনি। ······অধৈর্যের ফলে আমরা বিশ্বাস করে থাকি যে আমরাই হলাম উৎকর্ষতার আদর্শ আর যাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই তাঁরা যে কেবল দেশের কল্যাণকামী নন তা নয়, তাঁরা দেশের শত্রু। আর তাই শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শ্রেষ্ঠ নেতাকেও দেশের শত্রু বলে মনে করা হচ্ছে—একথা আমি কাগজে দেখেছি এবং ব্যক্তিগত আলোচনায় জানতে পেরেছি। আমি মোটেই তাঁকে এরকম মনে করি না এবং আমি আপনাদের বলছি যে, তিনি দেশের শত্রু নন। আমি যদি মাদ্রাজে গিয়ে বলতাম যে, মিঃ কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার দেশের শত্রু তবে মাদ্রাজের লোকেরা এতে আপত্তি করতেন এবং একথা সহ্য করতেন না। কিন্তু আমি জানি যে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশের শত্রু বললে আপনারা তা সহ্য করে নেবেন। সুতরাং আমি আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই যে অসহযোগ এবং অহিংসার প্রতি যদি আপনাদের

নিষ্ঠা থাকে তবে এমন নিষ্ঠুর হবেন না এবং আমাদেরই দেশবাসীর সম্পর্কে এমন অন্যায় চিন্তা করবেন না।[৮০]

## ব্যারাকপুরের ঋষি

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যারাকপুরের বাড়িতে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম যে তিনি অসুস্থ এবং বয়স তাঁর লোহার শরীর ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য আমি উপনীত হয়েছিলাম। যদিও তিনি আমার কোন কোন কাজ সমর্থন করতেন না তবু আধুনিক বাংলার স্রষ্টারূপে এবং ভারতীয় রাজনীতির নেস্টর ( বিজ্ঞতম ব্যক্তি ) রূপে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেই সময়কার কথা আমার মনে আছে যখন শিক্ষিত ভারত তাঁর কথায় ওঠা-বসা করত। সেজন্য গভীর আনন্দের সঙ্গে আমি ব্যারাকপুরের এই তীর্থযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম। নদীর ধারে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে স্যার সুরেন্দ্রনাথের একটি জমকালো বাড়ি আছে। তার চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে। কলকাতার ভিড়ের মধ্যে সারাদিন কাজ করার পর দিনান্তে এই জায়গায় আনন্দময় অবসর গ্রহণের দ্বারা তিনি যে কত প্রশান্তি লাভ করতেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমি তাঁকে দুর্বল এবং চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় বিছানায় শায়িত দেখব ভেবেছিলাম। তার বদলে আমি দেখলাম যে, আমাকে স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করবার জন্য তিনি তাঁর আসন থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন এবং যুবকের মত প্রফুল্লচিত্তে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। কথাবার্তার মধ্যে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর স্মৃতি আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি তাঁর ছেলেবেলার কথা তখনও মনে করতে পারেন। তাঁর স্মৃতি-কথা সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এটি গত নয় বছর ধরে তিনি লিখেছেন। তিনি গর্বের সঙ্গে তাঁর পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই গর্ব সমর্থনযোগ্য। এর সমস্তটাই শক্ত হাতে এবং স্পষ্ট অক্ষরে প্রণালীবদ্ধভাবে লেখা। স্যার সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ৭৭ বছর। কিন্তু পণ্ডিত মালব্যের মত তিনি তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস রাখেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি নিজের জন্য একানব্বই বছর বয়স রেখেছি এবং ততদিন পর্যন্ত এখনকার শক্তি বজায় রাখার আশা আমি রাখি।" আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি কী পড়ছেন তখন তিনি

আমাকে জানান যে, তিনি তাঁর স্মৃতিকথা আবার পড়ছেন; কেননা এক বছরের মধ্যেই তিনি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আশা রাখেন। তাঁর চার-পাশে যা কিছু ঘটে সেই সবগুলিকে তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেন। বাংলা দেশ থেকে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি তিনি আমার কাছ থেকে আদায় করেছেন। তিনি বললেন, "আপনি যদি ব্যারাকপুর পর্যন্ত আসতে সময় না পান তবে আমিই আপনার কাছে যাব।" আমি বলেছিলাম, "আপনার কাছে আসার সময় আমি অবশ্যই করে নেব।" স্যার সুরেন্দ্রনাথের শক্তির কারণ হল তাঁর নিয়মিত অভ্যাস, যা থেকে তিনি বিচ্যুত হন না। কোন কারণই তাঁকে কলকাতায় রাত্রি কাটাতে বাধ্য করতে পারত না। তিনি বলেছিলেন যে, ব্যারাকপুরের শেষ ট্রেন ধরতে তিনি কখনই অকৃতকার্য হতেন না। তিনি বলতেন যে, কঠিন কাজের জন্য যেমন ভারতবর্ষের সেবার জন্যও তেমনি এই নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন।[৮১]

## বাংলার সিংহ

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন থেকে এমন একজন মানুষকে সরিয়ে নিয়ে গেল যিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন। বর্তমানকালের নতুন আদর্শ ও নতুন আশার দরুন তিনি যে পিছনে সরে গিয়েছিলেন তাতে কী এসে যায়! আমাদের বর্তমান তো আমাদের অতীতের পরিণাম। স্যার সুরেন্দ্রনাথের মত পথিকৃতদের কাজ না থাকলে বর্তমানের আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব হয়ে যেত। একটি সময় ছিল যখন ছাত্রেরা তাঁকে আদর্শ বলে গণ্য করত, সমস্ত জাতীয় আলোচনায় তাঁর উপদেশকে অপরিহার্য বলে মনে করা হত এবং তাঁর বাগ্মিতা জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী চিন্তা করার সময় সেই ব্যাপারে স্যার সুরেন্দ্রনাথের অতুলনীয় কাজের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এবং গর্বের সঙ্গে মনে না করা একেবারে অসম্ভব। এই সময়ে স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কৃতজ্ঞ দেশবাসীর কাছ থেকে যথার্থভাবে 'সারেণ্ডার নট' (আত্মসমর্পণ নয়) এই উপাধি লাভ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সব চেয়ে অন্ধকারময় সময়েও সুরেন্দ্রনাথ কখনো বিচলিত হননি, কখনো আশা ত্যাগ করেননি। সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর উৎসাহ সমগ্র বাংলা দেশে সঞ্চারিত হয়েছিল। 'অবধারিত' ঘটনাকে

ভেঙ্গে ফেলার জন্ত তাঁর সঙ্কল্প বিচলিত হয়নি। তিনি আমাদের কর্তৃপক্ষকে ভয় না করতে শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগে তাঁর কাজের মূল্য তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের মূল্যের চেয়ে কম নয়। রিপন কলেজের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার যুবক তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে এসেছিল এবং উদার শিক্ষালাভ করেছিল। তাঁর নিয়মিত অভ্যাস তাঁকে স্বাস্থ্য, শক্তি এবং ভারতবর্ষের হিসাবে দীর্ঘজীবন দান করেছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর মানসিক উৎকর্ষতা অক্ষত রেখেছিলেন। সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি যে 'বেঙ্গলী' কাগজের সম্পাদনা করেছিলেন তা কম সাহসের ব্যাপার নয়। বস্তুত নিজের মানসিক শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতার উপর তাঁর এত বিশ্বাস ছিল যে, দু মাস আগে ব্যারাকপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ যখন হয় তখন তিনি ৯১ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার কথা আমাকে বলেছিলেন। তার বেশি তিনি বেঁচে থাকতে চাননি, কেননা তার পরে দীর্ঘদিন তাঁর ঐ মানসিক শক্তি ধরে রাখবার আশা তাঁর ছিল না। কিন্তু ভাগ্য অন্যরকম নির্ণয় করল। ভাগ্য আমাদের কোন রকম জানতে না দিয়েই তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কেননা তাঁর এ রকম হঠাৎ মৃত্যু কেউ ভাবতে পারেনি। বৃহস্পতিবার ৬ তারিখের সকালবেলা পর্যন্ত তাঁর মধ্যে মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। কিন্তু তাঁর দেহ আমাদের মধ্যে আর না থাকলেও দেশ তাঁর সেবার কথা কখনো ভুলবে না। আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টারূপে তাঁকে চিরকাল স্মরণ করা হবে।[৮২]

## শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

সমস্ত জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ এসে পৌঁছাচ্ছে। 'সারভেন্ট' কাগজের পাতাগুলি আর শ্যামবাবুর লেখার দ্বারা অলঙ্কৃত হবে না। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা আদালতের অধিকার স্বীকার করতে তিনি রাজী নন বলে তাঁকে জেলে বন্দী করা হয়েছে। কংগ্রেসের প্রস্তাব কোন লোককে এতদূর পর্যন্ত করতে নির্দেশ দেয়নি, আবার তা করতে বাধাও দেয়নি। শ্যামবাবু অধিকতর অনমনীয় মনোভাব বেছে নিয়েছেন। কলকাতার জেলখানায় বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবার যে সুযোগটি তিনি পেয়েছেন তা তিনি হারাবেন না। যে 'সারভেন্ট' কাগজ বহু বাধার সম্মুখীন হয়েও প্রতিষ্ঠার মাত্র দু বছরের মধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে তার পাঠকেরা এ থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ হারাবেন। কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই যে, শ্যামবাবু জেলে গিয়ে আরও ভালভাবে

দেশের সেবা করছেন। তাঁর কলম যে সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে পারে তাঁর যন্ত্রণাভোগের দৃষ্টান্ত তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী সম্পাদকীয়।[৮৩]

## দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা ( দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) একটি সুন্দর চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন। তাতে নিচের কথাগুলি লেখা আছে :

"ভারতবর্ষের পুত্র এবং কন্যারা এই ভ্রাম্যমাণ পৃথিবীতে শান্তি ও সদিচ্ছার নতুন যুগের উদ্বোধনের জন্য আকুল হয়ে আছেন। সেই আকুলতার একটি মহান অর্ণবপোত অন্তরঙ্গতায় প্রবেশ করছে যার গতি কখনো তীব্র, কখনো বা শ্লথ। সেই সম্পর্কে আমি আমার মতামত জানাচ্ছি।

জাহাজ ঠিক পথে যাবার সময় যখন বিপজ্জনক শিলায় ভরা কোন জায়গায় আসে তখন বুদ্ধিমান ক্যাপটেন তার গতি শ্লথ করে দেন এবং জাহাজ যখন আবার এই জাতীয় বাধাবিহীন উন্মুক্ত সাগরে এসে পৌছায় তখন তার গতি তীব্র করে দেন। কিন্তু একজন মূর্খ ক্যাপটেন শিলার ভয়ে ভুল পথে যেখানে সমুদ্রের তলায় কোন বিপদ নেই সেই দিকে জাহাজকে চালিত করেন এবং অজানা প্রদেশে যাত্রা করেন। সেখানে পৌছবামাত্র জাহাজটিকে গুঁড়া গুঁড়া করে দেবার জন্য অজ্ঞাত শিলা অপেক্ষা করে থাকে।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর পাত্রটিকে প্রথমোক্ত উপায়ে চালিত করছেন। কিন্তু তাঁর উপদেষ্টারা চান যে তিনি দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করুন।"

আমি আশা করি যে, যাত্রার শেষে একথা বলা সম্ভব হবে যে আমি ছিলাম 'এক জন বুদ্ধিমান ক্যাপটেন।' আমি সততার সঙ্গে বলতে পারি যে, জীবনে আমি আর কখনো এখনকার মত এমন ঝঞ্ঝাপীড়িত হইনি। আমার শক্তি এবং আমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা আছে এই বিশ্বাস নিয়ে আমি এযাবৎ নিজেকে তোষামোদ করে এসেছি। কিন্তু আমি এখন দেখছি যে, যতটা আমি ভেবেছিলাম তার চেয়ে গভীরতর জলে আমি পড়েছি। সেজন্য বড়দাদার মত পবিত্র এবং ধার্মিক মানুষের আশীর্বাদ ও প্রার্থনা আমার কাছে খুবই কামনীয়।[৮৪]

একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নেই। শান্তিনিকেতন থেকে প্রেরিত একটি তারবার্তায় এই দুঃখপূর্ণ সংবাদ আমাকে পাঠানো হয়েছে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত বড়দাদা চিরশান্তি লাভ করেছেন। তাঁর

বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি হয়েছিল। তবু তিনি এত প্রফুল্ল এবং স্ফূর্তিযুক্ত ছিলেন যে, তাঁর কাছে এলে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না যে, তাঁর মরজগতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বড়দাদা ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন পরিবারের একজন বিশিষ্ট সদস্য। সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে বড়দাদা ছিলেন সমান পণ্ডিত। তাছাড়া তিনি ছিলেন উদার সহানুভূতিসম্পন্ন গভীর ধর্মপ্রাণ মানুষ। উপনিষদের শিক্ষার মহত্ত্বের প্রতি তাঁর একগুঁয়ে মনোভাব থাকলেও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে আলো গ্রহণ করার মুক্ত মন তাঁর ছিল। একজন গভীর নিষ্ঠাবান দেশসেবকের মতই তিনি তাঁর দেশকে ভালবাসতেন। তবু তাঁর দেশপ্রেম একাঙ্গী ছিল না। অহিংস অসহযোগের রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করলেও তিনি এর নৈতিক সৌন্দর্যটিও অনুভব করতে পেরেছিলেন। সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে তিনি চরখার আদর্শ বিশ্বাস করতেন এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও খদ্দর গ্রহণ করেছিলেন। যুবকের মত উৎসাহ নিয়ে তিনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর নিকটতম সংস্পর্শে থাকতেন। বড়দাদার মৃত্যুর অর্থ হল আমাদের মধ্য থেকে একজন পণ্ডিত, একজন দার্শনিক এবং একজন দেশসেবকের বিদায় গ্রহণ করা। কবির প্রতি এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের লোকেদের প্রতি আমি আমার দুঃখপ্রকাশ করছি।[৮৫]

## চিত্তরঞ্জন দাশ

বঙ্গীয় বিধান পরিষদের কাজের মাধ্যমে দেশবন্ধু দাশ একথা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলা গভর্নমেণ্টের পিছনে জনগণের সমর্থন নেই। তিনি যে সন্ত্রাসবাদের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন এই ধারণাকে অবশ্যই নাকচ করে দিতে হবে। এই অভিযোগকে সমর্থন করার কোন প্রমাণ নেই। সন্ত্রাসবাদের দ্বারা আপনারা জনপ্রিয় নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেন না এবং একটি বিরাট দলকে একসূত্রে বেঁধে রাখতেও পারেন না। জনগণের মধ্যে প্রশংসার যোগ্য সহজাত এমন কিছু আছে যেজন্য তাঁরা দেশবন্ধুকে বাংলার বিরাট দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা নির্বাচন করেছেন। সেই জিনিস দেশবন্ধুর সামনে রয়েছে। তিনি জনগণের জন্য ক্ষমতা চান। তিনি শাসকদের কাছে অবনত হন না। তিনি ব্রিতয় বোঝা থেকে বাংলা এবং ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে অধৈর্য হয়ে রয়েছেন। তিনি যদি অন্য সুরে কথা বলেন, তিনি যদি বলেন যে জনসাধারণের জন্য তিনি স্বাধীনতা চান না তবে সন্ত্রাসবাদের যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করা

হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রভাব হারিয়ে ফেলবেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য আছে। কিন্তু তা আমাকে তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম ও মহান আত্মত্যাগের প্রতি অন্ধ করতে পারেনি। আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের মতই তিনি দেশকে ভালবাসেন। তাঁর দক্ষিণহস্তের মত লোকেরা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁরা সকলেই প্রতিষ্ঠাবান লোক। তাঁরা জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁদের কেন নিরপেক্ষ এবং সাধারণভাবে বিচার হবে না? অসাধারণ ক্ষমতাবলে এইজাতীয় লোকেদের সরাসরি গ্রেপ্তার করার ফলে প্রচলিত সরকারী পদ্ধতি নিন্দিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকের বন্দুক, গোলাগুলি এবং স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার শক্তিতে বেঁচে থাকা অন্যায় এবং বর্বরতা। এ বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে, এর দ্বারা তাঁদের চেয়ে সংখ্যায় যারা বেশি তাদের উপর নিজেদের অধিকার চাপাবার যোগ্যতা তাঁরা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সভ্যতার পাতলা আবরণের তলায় তাঁদের বর্বরতাও প্রমাণিত হয়েছে।

যেসব বাঙালী বিচারাধীন রয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি বলব, "আপনারা যদি নির্দোষ হন, আর আমি জানি যে, আপনাদের অধিকাংশই নির্দোষ, তবে আপনাদের কারাবাস দেশের এবং আপনাদের প্রতি কল্যাণ বহন করে আনবে; অবশ্য যথার্থ মনোভাব নিয়ে আপনারা যদি তা গ্রহণ করেন। যন্ত্রণাভোগ না করে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না।" যাঁরা প্রকৃত নৈরাজ্যবাদী এবং হিংসায় বিশ্বাসী তাঁদের আমি বলব, দেশের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আমার প্রশংসা দাবি করে। কিন্তু আমি বলব যে, আপনাদের সেই ভালোবাসা অন্ধ। আমার মতে হিংসার দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। তা হবে প্রতিশোধ না নিয়ে শুদ্ধতম যন্ত্রণাভোগের মাধ্যমে। এইটিই নিশ্চিত এবং দ্রুততম উপায়। কিন্তু হিংসার পদ্ধতির প্রতি যদি আপনাদের বিশ্বাস অবিচল থাকে তবে আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে, আপনারা সাহসের সঙ্গে আপনাদের বিশ্বাসের কথা স্বীকার করুন এবং কষ্টভোগ করতে এমন কি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকুন। তাতে আপনারা আপনাদের সাহস ও সততা প্রমাণ করবেন এবং বহু নির্দোষীকে অনিচ্ছাকৃত যন্ত্রণাভোগ থেকে বাঁচাবেন।"[৮৬]

লর্ড লীটনের বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর শেষ লেখাটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

তাঁর অসুস্থ অবস্থা এবং বিধানসভা কক্ষে তাঁকে স্ট্রেচারে করে বহন করে আনা তাঁর মহান বিজয়ে নাটকীয়তার স্পর্শ এনে দিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর উপস্থিতিই কথিত বাক্যের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী বক্তৃতারূপে গণ্য হয়েছে। লর্ড লীটনের মধ্যে যদি পর্যাপ্ত কল্পনাশক্তি থাকত এবং তাঁর মধ্যে যদি যথেষ্ট খেলোয়াড়ী মনোভাব থাকত তবে এই পরাজয়ের পর তিনি অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করে নিতেন, বন্দীদের মুক্তি দিতেন এবং হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে যাঁরা দেশবন্ধুর সঙ্গে ভোট দিয়েছেন তাঁদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন। হিস এক্সেলেন্সী মনে করেন যে, বাংলা দেশে ঐ ষড়যন্ত্র রয়েছে। ……বঙ্গীয় বিধানসভায় দেশবন্ধু দাশ যে নিয়মানুবর্তিতা দেখিয়েছেন তা ফলপ্রদ হবে। চরখা যখন প্রতিটি ঘরে স্থান করে নেবে এবং তার ফলে বিদেশী বস্ত্র বর্জন যখন প্রকৃত হয়ে উঠবে তখনই এই কাজের প্রভাব পড়বে। একটিমাত্র ঘটনা সমগ্র জাতিকে সম্মানে ভূষিত করেছে।[৮৭]

তিনি [ দেশবন্ধু ] মনে করেন যে, দ্রুত রাজনৈতিক কাজের দ্বারা যতক্ষণ না আমরা স্বাধীনতা অর্জন করছি ততক্ষণ আমরা কোন কাজ করতে পারব না। কেবল এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই সমস্যা [ অস্পৃশ্যতা ] সম্পর্কে তিনিও সম্পূর্ণ আগ্রহশীল এবং আপনার আমার মত তিনিও চান যে, এই অভিশাপ দ্রুত অপসারিত হোক।[৮৮]

## মহান শোক

হৃদয় যখন গভীর ক্ষত অনুভব করে কলম তখন সরতে চায় না। আমি এত বেশি শোকাভিভূত যে, তারবার্তায় ইয়ং ইণ্ডিয়ার পাঠকদের কাছে বেশি কিছু পাঠাতে পারছি না। এই মহান দেশপ্রেমিকের সঙ্গে দার্জিলিং-এ পাঁচ দিন ব্যাপী আমার যে কথোপকথন হয়েছিল তা আমাদের পরস্পরকে নিকটতর করেছিল। এত নিকট আমরা আগে কখনো ছিলাম না। দেশবন্ধু কত মহান ছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি কত ভাল ছিলেন তা আমি উপলব্ধি করি। ভারতবর্ষ একটি মণি হারাল। কিন্তু স্বরাজ লাভ করে তা আমাদের পুনরায় অর্জন করে নিতে হবে।[৮৯]

দেশবন্ধু দাশ দার্জিলিং-এ না থাকলে, তুষারমালার দৃশ্যের প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও সেখানে যাবার কথা আমি চিন্তাই করতাম না। আমি ভেবেছিলাম

যে, দার্জিলিং-এর শৌখিন লোকেদের কাছে চরখার কথা বলা নিছক মূর্খতা। আমার ভয় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল। মহিলাদের একটি সভায় বক্তৃতা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে চরখার কথা শোনেন। স্বর্গীয় ডব্লউ. সি. বনার্জীর কন্যা সর্বপ্রথম শৌখিন মহিলাদের জন্য চরখা ক্লাস খোলেন। মিশনারীদের ছোট সভাতেও আমার কথা বলার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। শেষোক্ত সভাটিই বোধ হয় বেশি সুবিধাকর ছিল। এতগুলি নেপালী, ভুটিয়া এবং অন্যান্য লোকেদের দেখার সৌভাগ্য আমার হবে তাও আমি জানতাম না। তাঁরাও চরখার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সব চেয়ে আনন্দ হয়েছিল শ্রীমতী বাসন্তী দেবী দাশকে সুতাকাটা শিখতে এবং অসুস্থ না হলে ধর্মানুষ্ঠানের মত প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে সুতা কাটার ব্রত নিতে দেখে। তাঁর মেয়ে আগে থেকেই এটি জানতেন। কিন্তু তিনি অবহেলা করেছিলেন। তিনি এখন তা শুরু করেন এবং তকলীতে সুতা কাটারও অভ্যাস করেন—তিনি দশ মিনিটে তকলীতে সুতা কাটতে শেখেন। শ্রীমতী ঊর্মিলা দেবী এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন থেকে নিয়মিত সুতা কেটে আসছেন। এবং দেশবন্ধু নিজে তকলীতে সুতাকাটা শেখেন। কিন্তু তিনি গভর্নমেণ্টকে হারিয়ে দেওয়ার অথবা মক্কেলদের মামলায় জিতিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা সুতাকাটাকে বেশি কঠিন বলে মনে করেন। বাসন্তী দেবী তাঁর স্বামীর পক্ষ নিয়ে বলেন, "আমার স্বামী তাঁর চাবির বাক্স কখনই ঠিকভাবে লাগাতে পারেন না, সব সময় আমাকেই সাহায্য করতে হয়। সুতরাং আপনি বুঝতে পারবেন যে, তাঁর পক্ষে সুতাকাটা শেখা কেন এত কঠিন।" কিন্তু দেশবন্ধু আমাকে কথা দেন যে, তিনি সুতাকাটা শিখে নেবেন। পাটনায় তিনি চরখায় সুতা কাটতে শিখেছিলেন। তাঁর অসুস্থতার জন্য তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, চরখায় তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা আছে এবং সম্ভাব্য সর্বরকমে তিনি একে সাহায্য করতে চান। কলকাতার মেয়রের সমগ্র পরিবারকে শৌখিন দার্জিলিং-এ সুতা কাটতে এবং সেখানে চরখার পরিবেশ সৃষ্টি করতে দেখে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁরা সকলেই খদ্দর পরিধান করেছিলেন। দেশবন্ধুর কাছে খদ্দর আনুষ্ঠানিক পরিধেয় ছিল না। তিনি নিয়মিত খদ্দর পরতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ইচ্ছা করলেও বিদেশী অথবা মিলজাত বস্ত্রে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন।[২০]

একজন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন মানুষের মৃত্যু হয়ে গেল। বাংলা দেশ আজ বিধবার মত কাঁদছে। দেশবন্ধুর একজন সমালোচক কয়েক সপ্তাহ আগে আমাকে বলেছিলেন, "একথা সত্য যে, আমি তাঁর দোষ ধরতাম, কিন্তু আমি সরলভাবে স্বীকার করছি যে, দেশবন্ধুর স্থান গ্রহণ করবার মত কোন লোক আমাদের নেই।" খুলনাতে সর্বপ্রথম এই বিহ্বলকারী ঘটনা শোনার পর সেখানকার জনসভায় যখন আমি দেশবন্ধুর মহৎ জীবন-কাহিনী বিবৃত করছিলাম তখন আচার্য রায় বলেছিলেন, "এটি ভয়ানক সত্য। আমি যদি আপনাকে বলতে পারতাম যে, কবিরূপে রবীন্দ্রনাথের স্থান কে নেবে, তবে আমি আপনাকে একথাও বলতে পারতাম যে, নেতারূপে দেশবন্ধুর স্থান কে নেবে? দেশবন্ধুর কাছাকাছি কোন লোক বাংলা দেশে বা অন্য কোথাও নেই।" শত যুদ্ধের তিনি ছিলেন বীর। দোষ-ত্রুটির প্রতি তিনি ছিলেন উদার। তাঁর ব্যবসা থেকে যদিও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন তবু তিনি নিজেকে ধনী হতে দেননি। এমন কি তাঁর বাড়িটিও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি ১৯১৯ সালে পাঞ্জাব কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতির কাজে সর্বপ্রথম তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসি। আমি সংশয় ও ভীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি দূর থেকে তাঁর প্রচণ্ড ব্যবসার কথা এবং তার চেয়েও প্রচণ্ড বাগ্মিতার কথা শুনেছিলাম। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং পরিবার নিয়ে মোটরগাড়িতে এসেছিলেন এবং রাজপুরুষের মত বাস করছিলেন। আমার প্রথম অভিজ্ঞতা খুব আনন্দদায়ক ছিল না। হাণ্টার কমিশনের সামনে সাক্ষ্য উপস্থিত করার ব্যাপার নিয়ে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে আইনজ্ঞের চতুরতা এবং জেরার মাধ্যমে সাক্ষ্যকে ঘায়েল করা ও মার্শাল ল' শাসনের নষ্টামি প্রকাশ করে দেবার উকিলের আগ্রহ লক্ষ্য করছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু করা। আমি আমার যুক্তি উত্থাপন করি। আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক আমাকে নিশ্চিন্ত করে এবং আমার ভয়কে অপসারিত করে। তিনি সব সময় যুক্তি গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন এবং আমি যা বলেছিলাম তা শুনেছিলেন। এই প্রথম আমি ভারতবর্ষের এতগুলি লোকনায়কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি। আমরা পরস্পরকে দূর থেকে জানতাম। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের কোন কাজেই তখনও আমি অংশগ্রহণ করিনি। তাঁরা আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন যোদ্ধা বলেই জানতেন। কিন্তু আমার সকল সহকর্মীই

আমাকে তৎক্ষণাৎ আপন করে নেন। আর ভারতবর্ষের এই মহান সেবকের চেয়ে বেশি আপন কেউ আমাকে করেননি। আমার এই সমিতির সভাপতি হবার কথা হয়েছিল। "যেখানে আমাদের মত-পার্থক্য হবে সেখানে আমি আমার কথা বলব, কিন্তু আমি আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেব, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" তাঁর দিক থেকে স্বেচ্ছায় এই প্রতিশ্রুতি দেবার আগে আমরা পরস্পরের এত কাছে এসেছিলাম যে, তাঁর সম্পর্কে আমার পুরাতন সংশয় প্রকাশ করার সাহসও আমার হয়েছিল। তাই যখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তখন এইরকম একজন বিশ্বাসী সহকর্মীর জন্য আমি গর্ববোধ করেছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে আমি কিছু অপ্রস্তুতও বোধ করেছিলাম, কেননা আমি জানতাম যে, ভারতীয় রাজনীতিতে আমি একজন শিক্ষার্থী মাত্র এবং এই জাতীয় সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসের অধিকারী নই। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠা পদের বিবেচনা করে না। যে রাজা এই নীতি স্বীকার করেন তিনি তাঁর সেই অনুচরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন যাকে তিনি কোন বিষয়ের একমাত্র বিচারক নিয়োজিত করেছেন। আমার অবস্থা ছিল ঐ অনুচরের মত। এবং আমি সকৃতজ্ঞ গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি যে, যেসব বিশ্বাসী সহকর্মীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাঁদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের চেয়ে অধিকতর বিশ্বাসী কেউ ছিলেন না।

অমৃতসর কংগ্রেসে আমি আর নিয়মানুবর্তিতার অধিকার দাবি করতে পারিনি। সেখানে যোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে দেশের কল্যাণ করার জন্য বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। এখানে কারও আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন ছিল কেবল শুদ্ধ যুক্তি উত্থাপন অথবা দলের অত্যাবশ্যকতা। এখানে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় আমার আচরণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ছিল। সকলেই ছিলেন বিনীত, তেমনি আত্মসমর্পণে তাঁরা ছিলেন সমান অনিচ্ছুক। মহান মালব্যজী একবার এই দলের সঙ্গে এবং তারপর অন্য দলের সঙ্গে আলোচনা করে সমতা বজায় রাখতে চেষ্টা করছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলালজী ভেবেছিলেন যে, এই যুদ্ধ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। লোকমান্য এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার সময়ও আমার পক্ষে দুর্লভ ছিল। সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁদের একটি সাধারণ সূত্র ছিল। প্রত্যেক দলই অপর দলকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় কারও ছিল না। সেখানে অচল অবস্থার সৃষ্টি

হয়েছিল এবং অনেকেই ঘটনার বিয়োগান্তক পরিণতির কথা ভেবেছিলেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় যাঁদের আমি জানতাম এবং ভালবাসতাম, অবশ্য এখনকার মত এত জানতাম না—তাঁরা আমাকে দেশবন্ধুর প্রস্তাব সমর্থন করতে বলেন। মহম্মদ আলি তাঁর প্ররোচক বিনয়ের সঙ্গে বলেন, "অনুসন্ধানের ব্যাপারে আপনার বিরাট কাজকে আপনি ব্যর্থ হতে দেবেন না।" কিন্তু আমি এ কথা মানতে পারলাম না। ঠাণ্ডা মাথার সিন্ধী জয়রামদাস এগিয়ে এলেন উদ্ধার করতে। তিনি আমার কাছে একটি ছোট কাগজ পাঠিয়ে দিলেন। তাতে তিনি তাঁর যুক্তি এবং মীমাংসার একটি রফা লিখে পাঠালেন। আমি তাঁকে প্রায় চিনতামই না। তাঁর চোখ এবং মুখ আমাকে বিমোহিত করে। তাঁর লেখাটি আমি পড়ি। সেটি ভালই ছিল। আমি সেটি দেশবন্ধুকে দিই। তিনি উত্তর দেন, "আমার দল যদি এটি মেনে নেন, তবে আমি মানতে পারি।" আনুগত্য একবার লক্ষ্য করুন! তিনি তাঁর দলকে মান্য করবেন—জনগণের উপর তাঁর বিস্ময়কর নেতৃত্বের এটি ছিল অন্যতম গোপন তথ্য। লোকমান্য তাঁর শ্যেন-চক্ষু দিয়ে কী ঘটছে তা লক্ষ্য করছিলেন। পণ্ডিত মালব্যজীর গঙ্গা-ধারা বক্তৃতার বেদি থেকে নিঃসারিত হচ্ছিল। তাঁর একটি চোখ ছিল মঞ্চের উপর যেখানে আমাদের মত বামনেরা জাতির ভাগ্য নির্ণয় করছিলেন। লোকমান্য বললেন, "আমি এটি দেখতে চাই না। দাশ যদি একে সমর্থন করেন তবে আমার পক্ষে তা ভালই।" মালব্যজী এই কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি আমার হাত থেকে সেটি টেনে নেন এবং কান-ফাটানো হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, একটি মীমাংসায় পৌছানো গিয়েছে। আমি এই ঘটনার বিষদ বিবরণ এই জন্যই দিলাম যে, এর মধ্যে দেশবন্ধুর মহত্ত্বের এবং তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের কারণ, তাঁর কাজের দৃঢ়তা, বিচারের যৌক্তিকতা এবং দলের প্রতি আনুগত্য মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। আমরা জুহু, আমেদাবাদ, দিল্লী এবং দার্জিলিং-এ মিলিত হয়েছিলাম। জুহুতে তিনি এবং মতিলালজী আমাকে দলে ভেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা দুজন যমজের মত হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। কিন্তু তাঁরা আমার সঙ্গে কোন রকম ভিন্নতা সহ্য করতে পারছিলেন না। তা যদি পারতেন তাহলে আমি পঁচিশ মাইল দূরে যেতে বললে তাঁরা পঞ্চাশ মাইল দূরে সরে যেতেন। কিন্তু যেখানে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত সেখানে তাঁরা তাঁদের নিকটতম বন্ধুর কাছেও সামান্যতম

আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে এক ধরনের সন্ধি ছিল। আমরা অসন্তুষ্ট ছিলাম, কিন্তু হতাশ ছিলাম না। আমরা একে অপরকে জয় করতে বদ্ধপরিকর ছিলাম। আমেদাবাদে আমরা মিলিত হলাম। দেশবন্ধুর প্রকৃতি সজাগ ছিল, এক জন যুদ্ধকলাবিদের মত তিনি সবকিছু দেখছিলেন। তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন—যে পরাজয় গৌরবময়। হায়, তাঁর মত বন্ধুর কাছে এই দেহে আমি আর পরাজিত হব না! কেউ যেন মনে না করেন যে সাহা প্রস্তাবের ব্যাপার নিয়ে আমরা পরস্পরের শত্রু হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা পরস্পরকে ভুল করছেন বলে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এ হল প্রণয়ীদের ভিন্নতা। বিশ্বস্ত স্বামী ও স্ত্রী তাঁদের ভিন্নতার চিত্রগুলির কথা এবং এই ভিন্নতা পুনর্মিলনের আনন্দকে তীব্রতর করার জন্য যে বেদনা তাঁদের দিত তার কথা একবার মনে করুন। আমাদের অবস্থাও ছিল সেই রকম। তাই দিল্লীতে আবার আমরা মিলিত হলাম। সুরুচিসম্পন্ন পণ্ডিত তাঁর ভয়ানক চোয়াল নিয়ে আর বাইরে থেকে দেখতে কর্কশ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বশানুগ দাশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধির খসড়া সেখানে তৈরী হয় এবং সমর্থিত হয়। এটি ছিল এক অলঙ্ঘ্য বন্ধন, একটি পক্ষ এখন মৃত্যুর দ্বারা তাকে মঞ্জুর করে দিয়েছেন।

দার্জিলিং-এর কথা এখন আমি বলব না। তিনি প্রায়ই আধ্যাত্মিকতার দাবি করতেন এবং বলতেন যে, ধর্মের ব্যাপারে আমার সঙ্গে তাঁর কোন মতপার্থক্য নেই। আর তিনি মুখে একথা বললেও ইঙ্গিতে বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমি বড়ই অকবি যে আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেকার মৌলিক ঐক্য আমি দেখতে পাই না। আমি স্বীকার করছি যে, তিনিই ঠিক। দার্জিলিং-এর মূল্যবান পাঁচদিনে প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি কত বড় ধার্মিক। তিনি কেবল মহৎ-ই ছিলেন না, তিনি দোষশূন্য ছিলেন এবং সেই উৎকর্ষতায় আরও বিকশিত হচ্ছিলেন। কিন্তু সেই পাঁচদিনের অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা আজ আমি বলব না, পরে একদিন তা বলব। নিষ্ঠুর ভাগ্য যখন লোকমান্যকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তখন আমি নিজেকে নিঃসহায় মনে করেছিলাম। সেই আঘাত আমি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি; কেননা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শিষ্যদের এখনও আমাকে সান্ত্বনা দিতে হচ্ছে। কিন্তু দেশবন্ধুর বিদায় আমাকে আরও খারাপ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। কারণ লোকমান্য যখন আমাদের ছেড়ে যান তখন দেশ আশায় পূর্ণ

ছিল। হিন্দু-মুসলমানকে চিরদিনের জন্ত ঐক্যবদ্ধ বলে মনে হত। আমরা যুদ্ধের মুখোমুখি ছিলাম। এখন ?[১১]

## দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন

বাংলা দেশের উপর, তা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দেশবন্ধুর কত বড় প্রভাব ছিল কলকাতা গতকাল তা দেখিয়েছে। কলকাতা বোম্বাই-এর মত বিশ্বজনীন। সব প্রদেশের লোক এখানে আছে। এবং এই সমস্ত লোক বাঙালীদের মত আন্তরিকভাবে শোভাষাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা থেকে যেসব তার আসছে তা তাঁর ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

কৃতজ্ঞ মানুষদের কাছে এছাড়া অন্ত কিছু হতে পারে না। আর তিনি এ পাবার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ত্যাগ ছিল মহান। তাঁর ঔদার্যের কোন সীমা ছিল না। তাঁর ভালবাসায় ভরা হাত সকলের জন্ত প্রসারিত ছিল। দানে তিনি ছিলেন অসাবধানী। এই সেদিন যখন আমি বিনীতভাবে তাঁকে বলেছিলাম যে, তিনি হয়ত প্রভেদ করে থাকবেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হয়েছিল, "আমি বিভেদশূন্যতা হারিয়েছি বলে মনে করি না।" তাঁর দুয়ার ধনী ও দরিদ্রের জন্ত উন্মুক্ত ছিল। দুর্দশায় পতিত সকলের প্রতিই তাঁর হৃদয়ে বেদনা ছিল। সারা বাংলা দেশে এমন একজন যুবকও কি আছেন যিনি কোন না কোন রকমে দেশবন্ধুর কাছে ঋণী নন ? তাঁর অতুলনীয় আইন-জ্ঞান গরীবদের অধিকারে ছিল। আমি জানি যে, এক পয়সাও না নিয়ে তিনি বহু রাজবন্দীকে বিচারে সমর্থন করেছেন। পাঞ্জাব অনুসন্ধান সমিতির কাজে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং নিজের খরচ নিজেই বহন করেছিলেন। সেই সময় তাঁর গার্হস্থ্য জীবন রাজকীয় ছিল। আমি তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে, পাঞ্জাবে থাকাকালীন তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। তাঁর সাহায্যপ্রার্থীদের প্রতি তাঁর এই উদার হৃদয় তাঁকে হাজার হাজার যুবকের অবিসংবাদী সম্রাট করে দিয়েছিল।

তিনি যেমন মহান ছিলেন তেমনি ছিলেন নির্ভীক। অমৃতসরে তাঁর প্রচণ্ড বক্তৃতা আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর দেশের আশু মুক্তি চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর কোন কথার বিকল্প অথবা কোন বিশেষণের পরিবর্তন সহ্য করতেন না—তার কারণ এই নয় যে, তিনি অযৌক্তিক ছিলেন। তার

কারণ শুধু এই যে, তিনি তাঁর দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। এই জন্যই তিনি তাঁর জীবন দিয়েছেন। বিশাল শক্তিকে তিনি সংযত করেছিলেন। অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি তাঁর দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। শক্তির এই প্রচণ্ড প্রকাশ তাঁর মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। এ হল তাঁর স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন। এ মহান।

তাঁর চরম জয়লাভ ঘটে ফরিদপুরে। সেখানে তাঁর বক্তৃতা তাঁর পরম যুক্তি এবং রাজনীতিজ্ঞানের প্রমাণ করেছে। এই বক্তৃতার দ্বারা তিনি সুচিন্তিত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং চূড়ান্তরূপে (সেকথা তিনি আমাকে বলেছিলেন) অহিংসাকে একমাত্র উপায় আর সেজন্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং মহারাষ্ট্রের নিয়মনিষ্ঠ বলিষ্ঠ কর্মীদের সহযোগে বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান স্বরাজ পার্টি গঠন করে তিনি তাঁর সঙ্কল্প, মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনশক্তি প্রমাণ করেছিলেন। কোন কাজকে একবার ঠিক মনে করলে তা না করাকে তিনি যে বিবেকের অবমাননা বলে মনে করতেন তাও তিনি এই পার্টি গঠন করার সময় দেখিয়েছেন। আজ স্বরাজ-পার্টি একটি দৃঢ় নিয়মানুগ প্রতিষ্ঠান। কাউন্সিলে প্রবেশ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যে মতান্তর ছিল এবং আজও আছে তা হল মৌলিক। কিন্তু গভর্নমেণ্টকে বিব্রত করতে এবং ক্রমাগত তার অন্যায়গুলি দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল প্রবেশের উপযুক্ততার প্রতি আমি কোনদিন সন্দেহ প্রকাশ করিনি। এই পার্টি কাউন্সিলে যে বিরাট কাজ করেছেন তা কেউ অস্বীকার করবে না। আর এর সমস্ত যশ প্রধাণত দেশবন্ধুর প্রাপ্য। আমি আমার মন খোলা রেখে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তারপর আমি আমার সাধ্যমত পার্টিকে সাহায্য করেছি। তাঁর মৃত্যু পার্টির পাশে দাঁড়াবার জন্য আমার কর্তব্যকে দ্বিগুণিত করেছে, কেননা এখন নেতা চলে গিয়েছেন। এই পার্টিকে যেখানে আমি সাহায্য করতে পারব না, সেখানে তার প্রগতিতে কোন রকম বাধাও আমি দেব না।

ফরিদপুরের বক্তৃতার কথায় আমি আবার ফিরে যাই। কার্যকারী ভাইসরয় শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে শোকবার্তা পাঠিয়ে যে সৌজন্যতা দেখিয়েছেন সমগ্র জাতি তার জন্য কৃতজ্ঞ। এই স্বর্গত নেতার স্মরণে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস যে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে লক্ষ্য করেছি। মনে

হয় তাঁর ফরিদপুরের বক্তৃতা তার স্বচ্ছ আন্তরিকতার জন্য অধিকাংশ ইংরেজকে প্রভাবিত করেছে। এই মৃত্যু কেবল সৌজন্যতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই যাতে শেষ না হয়ে যায় তার জন্য আমি অগ্রহান্বিত। এই বক্তৃতা ছিল সেই সব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধুর প্রতি উদার প্রতিবেদন যাঁরা চেয়েছিলেন যে এই মহান দেশসেবক তাঁর মনোভাবের কথা পরিষ্কার করে বলুন এবং সেইদিকে যাত্রা করুন। তিনি তা করেছিলেন। মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত এই প্রতিবেদনের স্রষ্টাকে আমাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নিয়েছে। দেশবন্ধুর মনোভাবের আন্তরিকতা সম্পর্কে এখনও যেসব ইংরেজের মনে সন্দেহ রয়েছে তাঁদের আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে, দার্জিলিং-এ থাকার সময় যে জিনিস সব চেয়ে বেশি আমাকে অভিভূত করেছিল তা হল এই উক্তির প্রতি তাঁর আন্তরিকতা। এই মহান মৃত্যু কি আঘাতকে আরোগ্য করতে এবং অবিশ্বাসকে মুছে ফেলতে ব্যবহৃত হতে পারে না? আমি একটি সহজ প্রস্তাব করছি। সরকার কি চিত্তরঞ্জন দাশের সম্মানার্থে—নিজের যুক্তি উত্থাপনের জন্য তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই—রাজবন্দীদের মুক্তি দেবেন, যাঁদের তিনি নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছিলেন? নির্দোষ বলে আমি তাঁদের ছেড়ে দিতে বলছি না। গভর্নমেণ্টের কাছে তাঁদের অপরাধের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ থাকতে পারে। আমি শুধু বলছি যে, এই স্বর্গতের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য এবং কোন রকম অধিকার ক্ষুন্ন না করে তাঁদের মুক্তি দিতে। গভর্নমেণ্ট যদি ভারতীয় জনমতকে শান্ত করার জন্য কিছু করতে চান তবে এখনকার চেয়ে ভাল সময় আর পাওয়া যাবে না এবং এই সব বন্দীর মুক্তির পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়ে অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করা যাবে না। মোটামুটিভাবে সারা বাংলা দেশ আমি ঘুরেছি। কেবল স্বরাজীদের নয়, সমগ্র জনমতই আজ এদিকে ঝুঁকে রয়েছে। যে আগুন দেশবন্ধুর নশ্বর দেহকে কয়েকদিন আগে পুড়িয়ে দিয়েছে সেই আগুন যেন ধ্বংসশীল অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং ভীতিকেও পুড়িয়ে দেয়। গভর্নমেণ্ট তখন ইচ্ছা করলে ভারতীয়দের যে কোন দাবি পূরণের উপায় নিধারণের জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করতে পারেন।

গভর্নমেণ্টকে যদি তাঁর কাজ করতে হয় তবে আমাদেরও নিজেদের কাজ করতে হবে। আমাদের সব কাজ যে একজন মাত্র করেন না তা দেখিয়ে দেবার যোগ্য আমাদের হতে হবে। যুদ্ধের সময় মিঃ চার্চিল যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন সেই ভাষায় আমাদের বলতে হবে যে, 'আমরা কাজ চাই'।

স্বরাজ পার্টিকে এখনই পুনর্গঠিত করতে হবে। এই 'বিনামেঘে বজ্রাঘাতে' মনে হয়, পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান তাঁদের ঝগড়া ভুলে গিয়েছেন। উভয় পক্ষ কি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ভুলে যাবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান মনে করতে পারেন? দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান একতায় বিশ্বাস করতেন এবং এই কাজকে তিনি ভালবাসতেন। খুবই কঠিন পরিস্থিতির সময় তিনি হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। চিতার আগুন কি অনৈক্যের অপরাধ থেকে আমাদের পবিত্র করতে পারবে? কিন্তু তা করবার জন্য প্রথমে হয়ত সব দলকে একটি সাধারণ মঞ্চে মিলিত হতে হবে। দেশবন্ধু তার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর বিরোধীদের সম্পর্কে তিনি কটু ভাষায় কথা বলতে পারতেন। কিন্তু দার্জিলিংএ থাকার সময় তাঁর মুখ থেকে কোন রাজনৈতিক বিরোধীর সম্পর্কে একটিও শক্ত কথা বেরিয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। সমস্ত দলকে একত্র করার কাজে তিনি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। আমাদের মত শিক্ষিত ভারত-বাসীরা তাহলে দেশবন্ধুর দূরদৃষ্টিকে কাজে রূপ দিতে পারব এবং স্বরাজের সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠে এখনই আমরা তাঁর জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারব। সেই সিঁড়ির শেষ ধাপে হয়ত আজ আমরা উঠতে পারব না। তখন আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বলতে পারব 'দেশবন্ধু মারা গিয়েছেন। দেশবন্ধু অমর হন'।[৯২]

[ দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর ১৯২৫ সালের ১৭ই জুন খুলনার এক জনসভায় গান্ধীজী নিম্নলিখিত ভাষণ দেন। ]

মিঃ দাশ শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন ছিলেন। ( এইখানে গান্ধীজী কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং এক মিনিট, কি দু মিনিট কথা বলতে পারেন না। ) গত ছ বছর ধরে তাঁকে জানার সুবিধা আমার হয়েছে এবং মাত্র কিছুদিন আগে দার্জিলিংএ যখন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি তখন একজন বন্ধুকে আমি বলেছিলাম যে, আমি যতই তাঁর কাছে আসছি ততই তাঁকে ভালবাসছি। দার্জিলিং-এ অল্প কয়েক দিন থাকার সময় আমি দেখেছি যে, ভারতের কল্যাণ চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করে নেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। আর কোন বিষয়ই তাঁর মনকে এমনভাবে জুড়ে রাখেনি। একথাও আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, দার্জিলিং-এ তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাকে বাংলা দেশে

বেশি দিন থেকে বিভিন্ন দলকে একত্র করতে বলেছিলেন যাতে আমার বাংলা ভ্রমণের সময় সমস্ত শক্তিকে একটি উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করা যায়।

যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতেন, যাঁরা তাঁর প্রচণ্ড সমলোচক ছিলেন, তাঁরাও একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি যে, বাংলা দেশে দেশবন্ধুর স্থান কেউ নিতে পারেন না। তিনি ছিলেন নির্ভীক। তিনি ছিলেন সাহসী। বাংলা দেশের যুবকদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল সীমাহীন। একজন যুবকও আমাকে একথা বলেননি যে, মিঃ দাশের কাছে সাহায্যের অনুরোধ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন এবং সেই লক্ষ লক্ষ টাকা বাংলার যুবকদের দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আত্মত্যাগ ছিল সীমাহীন, আর তাঁর জ্ঞান ও রাজনীতিজ্ঞতার কথা বলার আমি কে ?

দার্জিলিং-এ একাধিকবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সত্য ও অহিংসার উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানদের জানা উচিত যে, তাঁর অন্তরে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে কোন বিভেদ ছিল না। ভারতবর্ষের ইংরেজদেরও আমি একথা বলতে চাই যে, তাঁদের প্রতিও তিনি কোন খারাপ মনোভাব পোষণ করতেন না। "আমি যদি বাঁচি তবে স্বরাজের জন্য বাঁচব, আমি যদি মরি তবে স্বরাজের জন্য মরব"—মাতৃভূমির প্রতি এইটিই ছিল তাঁর ব্রত।

দার্জিলিং-এ থাকার সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি মিঃ দাশের স্নেহশীলতা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেই পবিত্র স্মৃতি-চারণ আমি এখানে করব না। তাঁর সেবা এবং তাঁর আত্মত্যাগ অতুলনীয়। সেই স্মৃতি যেন আমাদের মনে চিরকাল জাগরূক থাকে এবং তাঁর দৃষ্টান্ত যেন আমাদের মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের পথ দীর্ঘ এবং নিরানন্দময়। আর অন্য কিছুই আমাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাসের স্থান গ্রহণ করতে পারবে না। মিঃ দাশের নীতিবাক্য ছিল আত্মবিশ্বাস, তা যেন আমাদের দীর্ঘ দিন অনুপ্রাণিত করে। তাঁর আত্মা শান্তি-লাভ করুক।[৯৩]

## বিপ্লবীদের প্রতি দেশবন্ধু

[দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর জনৈক 'বিপ্লবী' শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি দেশবন্ধুর মহত্বের উল্লেখ করেন এবং একথাও লেখেন যে, রাজনীতিতে তাঁদের সঙ্গে একমত না হলেও তাঁদের প্রতি দেশবন্ধুর সহানুভূতি ছিল। এই চিঠিটি উধৃত করে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি লেখেন।]

…বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি দেশবন্ধু কী মনোভাব পোষণ করতেন, এই চিঠিটি তার অপ্রার্থিত প্রশংসাপত্র। দোষ থাকা সত্ত্বেও বাংলার যুবকদের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ স্নেহদৃষ্টির মধ্যে তাদের উপর তাঁর প্রভাবের কারণটি খুঁজে পাওয়া যাবে। তাদের পথ তিনি পছন্দ করতেন বলে যে তিনি তাদের ভালবাসতেন তা নয়। তাদের পথ থেকে সরিয়ে আনবার জন্যই তিনি তাদের ভালবাসতেন। তাঁর জীবিতকালে যারা তাঁর কথা শোনেনি এখন কি তারা তাঁর আত্মার কথা শুনবে, যে আত্মা তাদের বলছে 'হিংসার পথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ নয়!' নিজেদের সিদ্ধান্তের উপর ভরসা না করে তাঁর পরিণত সিদ্ধান্তের প্রতি কি তারা তাদের আস্থা স্থাপন করবে?[১৪]

## দার্জিলিং-এর স্মৃতি

দার্জিলিং-এ যে পাঁচটি দিন আমি কাটিয়েছিলাম তার পবিত্র স্মৃতি-চারণ আমি করব, এই প্রতিশ্রুতি আমি পাঠকদের দিয়েছিলাম। আমার জীবনের বহুমূল্য জিনিসগুলির মধ্যে আমি সেটিকে সঞ্চয় করে রেখেছি। সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্যও বেড়ে চলেছে। কেন, তা আমি পাঠকদের বলব। এর আগেও আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেছি। কিন্তু সেগুলি ছিল নিছক রাজনৈতিক মিলন। তখন দুজনেই আমরা নিজের নিজের কথার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত থাকতাম। কিন্তু দার্জিলিং-এ তা হয়নি। সেখানে দেশবন্ধু কেবল আমার জন্যই ছিলেন। তিনি সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই গিয়েছিলাম। দার্জিলিং-এ আমার বিশ্রাম নিতে যাওয়া একটি উপলক্ষ মাত্র। তুষারমালার আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও দেশবন্ধু না থাকলে আমি সেখানে যেতাম না। তবে পরিশেষে আমাকে লেখার জন্য তিনি যে পেন্সিলে নোট করেছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন, "মনে রাখবেন যে আপনি আমার কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছেন। আমি হলাম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। আপনার ভ্রমণের মধ্যে দার্জিলিং-কেও যুক্ত

করতে হবে। এটি হল আদেশ।" এই সুন্দর লেখাটি কাছে রাখার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু আমার কাছ থেকে যেমন অনেক দামী দামী কাগজ-পত্র হারিয়ে গিয়েছে এটিও তেমনি হারিয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, আমার সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি রয়েছে। টেলিগ্রামে তাঁর উত্তর ছিল, "তাহলে সমস্ত কমিটিকেই সঙ্গে আনুন। তাঁদের থাকার ব্যবস্থা আমি করব। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সদস্যদের গাড়িভাড়া দেবে। সাতকড়িকে আমি সেই কথা লিখছি।" ওয়ার্কিং কমিটিকে আমি দার্জিলিং-এ নিয়ে যেতে পারিনি। তবে সভার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম। আর তাই আমি গিয়েছিলাম। আমি সেখানে মাত্র দুদিনের জন্য গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছে পাঁচ দিন আটকে রাখেন। তিনি শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে আসাম-ভ্রমণ স্থগিত রাখার কথা শ্রীযুক্ত ফুকনকে জানাতে বলেন। তিনি নিজেও তিন দিনের জন্য বাংলা-ভ্রমণ স্থগিত রাখেন। পরস্পরের কাছে থাকার জন্য আমাদের কত আগ্রহ ছিল তা দেখাবার জন্য আমি এই সব খুঁটি-নাটি কথা উল্লেখ করছি। দেশবন্ধুর দীর্ঘনিদ্রা ঘনিয়ে আসছিল বলেই বোধ হয় এটি ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠ মিলনের প্রস্তুতি।

তিনি রোগগ্রস্ত না থাকলেও সদ্য রোগমুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি যত্ন নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু আমার এবং আমার সঙ্গীদের সুখ-সুবিধার প্রত্যেক খুঁটিনাটি দেখার আগ্রহ তিনি করতেন। তাঁর বন্দোবস্ত সবই ছিল অপর্যাপ্ত। সমতল থেকে তিনি তিনটি ছাগল আনতে আদেশ করেছিলেন। তিনি চাননি যে, একবেলাও আমার দুধ বন্ধ হোক। আমি প্রায়ই বাসন্তী দেবীর ভগ্নী-সুলভ যত্ন লাভ করেছি। কিন্তু দার্জিলিং এ দেশবন্ধু নিজে আমার দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন। সেখানে কোন রকম কৃত্রিমতা ছিল না। আতিথেয়তা ছিল তাঁদের বংশের স্বভাব। তাঁদের প্রাচুর্যপূর্ণ আতিথেয়তার কয়েকটি আকর্ষণীয় ঘটনার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। অপরিচিত অথবা রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি তাঁর কত শ্রদ্ধা ছিল তা কেবল আমি দার্জিলিং-এ এসেই জানতে পারি। তাঁরই আগ্রহে খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশবাবুকে বাংলা দেশে খদ্দর চালু করার বিষয়ে আমরা যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলাম সে বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সতীশবাবু কোথায় থাকবেন বলে তিনি মনে করেন? তিনি বলেছিলেন, "কেন, এই বাড়িতেই থাকবেন।" আমি বলেছিলাম, "কিন্তু

ইতিমধ্যেই আমরা এখানে ভিড় করে ফেলেছি।" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "মোটেই নয়। আর তা যদি হয় তবে তিনি আমার ঘর ব্যবহার করতে পারেন।" আমি যখন তাঁর এবং তাঁর অতিরিক্ত পরিশ্রমী সঙ্গীর কথা ভাবছিলাম তখন তিনি সতীশবাবুর সুখ-সুবিধার কথা ভাবছিলেন। তিনি বললেন, "তাছাড়া সতীশবাবু মনে করেন যে, তাঁর সম্পর্কে আমি পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি খানিকটা আমার কাছে অপরিচিত। আপনি জানেন যে, আমি আমার অন্য বন্ধুদের কথা ভাবছি না। তাঁরা আমাকে ভুল বুঝবেন না। সতীশবাবু এই বাড়িতেই থাকবেন।"

আমরা বাংলা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কথা আলোচনা করি। প্রসঙ্গত স্বরাজ পার্টির বিরুদ্ধে যে সব ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ করা হয় তার উল্লেখও আমি করি। আমি তাঁকে জানাই যে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ আমাকে বাংলা ত্যাগ করার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আপনি নিশ্চয় তাঁর কাছে যাবেন এবং আমাদের কথাবার্তা তাঁকে জানাবেন এবং সমস্ত ঘুষ ও দুর্নীতির সম্পর্কে আমার স্পষ্ট অস্বীকৃতির কথা তাঁকে বলবেন। পার্টির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে আমি জনজীবন থেকে বিদায় নেব। আসল কথা, বাংলা দেশের রাজনৈতিক জীবন হল পারস্পারিক বিদ্বেষ ও পিছনে নিন্দা করা। স্বরাজ পার্টির অসাধারণ অগ্রগতি ও সাফল্য কিছু কিছু লোকের কাছে অসহ্য হয়ে গিয়েছে। সেজন্য আমি চাই যে, পার্টির বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উত্থিত হবে তার প্রত্যেকটি আপনি যাচাই করুন এবং সে সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত দিন। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনার মত আমিও অসাধুতায় বিশ্বাস করি না। আমি জানি যে আমার দেশ অসৎ পথে মুক্তি-লাভ করতে পারবে না। আপনি যদি সব দলকে একত্র করতে পারেন অথবা অন্তত পারস্পরিক প্রত্যভিযোগের হাওয়াকে মুক্ত করতে পারেন তবে আপনি খুব বড় সেবা করবেন। বিশেষ করে শ্যামবাবু ও সুরেশবাবুর সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। তাঁদের যদি কোন অবিশ্বাস বা সন্দেহ থাকে তবে তাঁরা আমার কাছে আসেন না কেন? আমাদের মত নিম্ন হতে পারে, কিন্তু আমরা পরস্পরকে অভিশাপ দিতে পারি না।" আমি প্রক্ষিপ্ত করলাম, "ফরওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারটি কী? আমি জানি না, কেননা এই কাগজ আমি পড়ি না। কিন্তু ফরওয়ার্ডের সম্পর্কেও এই জাতীয় অভিযোগের কথা আমি

শুনেছি।" "হাঁ, ফরওয়ার্ড অন্যায় করে থাকতে পারে। আপনি জানেন যে আমি ফরওয়ার্ড কাগজে লিখি না, অথবা আপনি যেমন ভাবে ইয়ং ইণ্ডিয়া পরিচালনা করেন তেমন ভাবে পরিচালনাও করি না। কিন্তু লোকেরা যদি এই সব জিনিস আমার গোচরে আনেন তবে আমি আনন্দের সঙ্গে তার অনুসন্ধান করব এবং বিষয়টির মীমাংসা করব। আমার মনে হয় যে, আপনি লক্ষ্য করবেন ফরওয়ার্ড সব সময় আত্মরক্ষা করছে। তবে আত্মরক্ষা করতে গিয়েও কেউ কেউ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আপনি জানেন যে, আমার কাছে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা যদি সত্য হয় তবে ফরওয়ার্ডে প্রকাশিত এক অমার্জনীয় অতিরঞ্জনের ভয়ঙ্কর বিষয়টির আমি অনুসন্ধান করব ভাবছি। আপনাকে আমি জানাচ্ছি যে, এ সম্পর্কে আমি কড়া করে লিখেছি, এমন কি লেখককেও আমি ডেকে পাঠিয়েছি।" এইভাবেই আমাদের কথাবার্তা এগিয়ে চলল। সর্বক্ষণ আমি লক্ষ্য করেছি যে, বিরোধীদের প্রতি ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সকল দলের সম্মানীয় সম্মিলনের জন্য তাঁর মন কাজ করছে।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "সর্বদলীয় সম্মেলন অথবা মিঃ কেশকারের পরামর্শানুসারে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আহ্বান করা সম্পর্কে আপনি কী বলেন?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি এখন এটি চাই না। এ আই সি.সি. অকেজো হয়ে গিয়েছে। কেননা আমাদের মত স্বরাজীদের এখন কাজ করতে হবে এবং নতুন ভোটাধিকারকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমি আপনাকে বলছি যে, আমি ক্রমেই চরখার প্রতি আপনার যে ধারণা তার কাছাকাছি আসছি। আমার ভয় যে, চরখাকে নিয়ে সব জায়গায় আমরা কাজ করিনি। আপনি বলেছেন যে, বাংলা দেশে কোথাও আপনি বিরোধিতা পাননি। কিন্তু আমি যদি অসুস্থ হয়ে না পড়তাম তবে আমি আপনাকে চরখার বিপুল সাফল্য দেখাতাম। আমি আপনাকে বলছি যে, ঐকান্তিকতার সঙ্গে চরখার কাজ করার ইচ্ছা আমি করেছিলাম এবং সংগঠনের কাজে আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি দেখছেন যে, আমি এখন অসহায়। এই বছরে কোন রকম পরিবর্তন করা যাবে না। পক্ষান্তরে, নতুন ভোটাধিকারকে আমাদের সকলের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মহারাষ্ট্রের বন্ধুদের আমি একথা লিখব।"

প্রস্তাবিত সর্বদলীয় সম্মেলন সম্পর্কে তিনি বলেন, "এখনই এই রকম সম্মেলন আমরা করব না। লর্ড বার্কেনহেডের কাছ থেকে বড় জিনিস আমি

আশা করছি। তিনি শক্ত মানুষ আর আমি শক্ত মানুষদের পছন্দ করি। তিনি যেমন বলেন ততটা খারাপ তিনি নন। আমরা যদি সভা করি তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে হবে। তিনি এই মুহূর্তে যা দিতে পারেন তার চেয়ে বেশি দাবি করে আমি তাঁকে বিব্রত করতে চাই না। আমি তাঁকে আমাদের দাবি কমিয়ে দিয়ে হতাশও করতে চাই না। আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। তা করলে আমরা কিছুই হারাব না। এই বিবৃতি যদি সন্তোষজনক না হয় তবে কাজের একটি সাধারণ সূত্র নির্ধারণ করার জন্য সভা ডাকার সময় তখন হবে।" প্রস্তাবিত সভা আহ্বান না করার এটি এক অদ্ভুত যুক্তি বলে আমার মনে হয় আর তাই আমি বলি, "আপনি এবং মতিলালজী না চাইলে অথবা প্রাতিনিধিক দাবি উত্থিত না হলে আমি এই সভা আহ্বান করব না। কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে, আপনার বিশ্বাসের সঙ্গে আমি সহমত নই। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের দিকে চেয়ে দেখুন। সেটি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের বিবাদের দিকে মন দিন। বাংলা দেশের রাজনৈতিক দলগুলির দিকে চেয়ে দেখুন। দৃশ্যত এখনকার মত এত দুর্বল আমরা কখনো ছিলাম না। আর আপনি কি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন না যে, ইংরেজ কখনও দুর্বলের কাছে নতিস্বীকার করেনি? আমি অনুভব করি যে, ইংলণ্ডের কাছ থেকে বড় কিছু পাবার আশা করার আগে আমাদের নিজেদের অদম্য করে নিতে হবে।" দেশবন্ধু অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং বলেন, "আপনি নৈয়ায়িকের মত তর্ক করছেন। আমি সেই কথা আপনাকে বলছি যা আমি অনুভব করি। আমার অন্তরের বাণী আমাকে বলছে যে, বড় কিছু জিনিস আমরা পাব।" আমি আর তর্ক করি না। এই বিরাট বিশ্বাসের কাছে আমি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত করি। আমি তাঁকে বলি যে, ইংরেজ চরিত্রের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তাঁদের মধ্যে আমার অনেক ভাল বন্ধু রয়েছেন। কিন্তু আমি দেখলাম যে, ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস আমার বিশ্বাসের চেয়েও বড়। ইংরেজরা জানুন যে, দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁরা তাঁদের একজন কত বড় বন্ধুকে হারালেন।

কলকাতার পীর-সমস্যা তাঁকে খুবই ব্যথিত করেছিল। এই সমস্যার সমাধানে আমি যা করতে পারি তা করার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "মুসলমানদের অনুভূতিকে আমি শান্ত করতে চাই। আমি আশা করেছিলাম যে, স্তম্ভটিকে দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলার পর এ সম্পর্কে

আর কিছু শোনা যাবে না। এখন কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বার করবার জোরদার আন্দোলন চলছে। আমি তাকে বাধা দিতে পারি না। আইন অনহুমত স্থানে কবর দেওয়ার স্পষ্ট বিরুদ্ধে রয়েছে। সুভাষ বা সুরাবর্দির এ বিষয়ের অনুমতি দেবার কোন অধিকার নেই। কিন্তু মুসলমানদের আমার সঙ্গে চলার জন্য যা করার আমি করব। তাঁরা নিজেরাই যাতে দেহটিকে সরিয়ে নেন তার জন্য তাঁদের প্রবৃত্ত করতে আমি চেষ্টা করছি। আমার আশা আছে যে, তাঁরা আমার কথা শুনবেন।"

তারকেশ্বরের ঘটনা নিয়েও আমরা আলোচনা করি। আলোচনার পরিণাম একটি বিবৃতিতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল যাতে তিনি সই করবেন আর দরকার হলে আমিও করব। ডঃ বেশান্তের ইস্তেহার নিয়েও আমরা আলোচনা করি। তিনি ডঃ বেশান্তকে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে এইটি নিয়েই আমরা প্রথমে আলোচনা করি। এই আলোচনার পরিণামস্বরূপ তিনি ডঃ বেশান্তকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু বেশির ভাগ সময় যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তা হল চরখা ও ও খদ্দর ; বিশেষ করে পল্লী পুনর্গঠনে এদের স্থান কী হবে তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। এই কাজের জন্য তিনি তাঁর প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন এবং প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। আমি তাঁকে বলি যে, তাঁর পরিকল্পনা একবারে কাজে লাগাবার পক্ষে বড় বেশি উচ্চাভিলাষী। প্রতাপ-বাবুর প্রদত্ত খসড়াটি আমি পড়েছি এবং অবাস্তব বলে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছি। দেশবন্ধু সেটি দেখেননি। এটিকে যে কার্যান্বিত করা যায় না তা তিনি স্বীকার করলেন। বস্তুত প্রতাপবাবুও এই কথা স্বীকার করেছিলেন। আমি দেশবন্ধুকে বলেছিলাম যে, চরখাকে তিনি পল্লী-সংগঠনের সকল কাজ-কর্মের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করুন। চরখার চারপাশে এই কাজগুলি আবৃত্ত হতে থাকবে এবং যেখানে চরখা স্থাপিত হবে কেবল সেখানেই সেগুলিকে সংযুক্ত করা হবে। আমি বলি যে, পল্লী সংগঠনের এই কাজকে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে আর সেজন্য একে একটি স্থায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে ন্যস্ত করতে হবে। যার মূল কাজ হবে এই সব কাজ পরিচালনা করা। আমি তাঁকে বলি যে, এই কমিটি গঠন করার জন্য এবং কংগ্রেসের পক্ষে এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সতীশবাবুকে তাঁর আমন্ত্রণ করা উচিত। আলোচনার কেবল সারাংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

দেশবন্ধু কেবল এতে স্বীকৃতই হননি, উপরন্তু তিনি এগুলি নোট করে নেন এবং তখনই এই পরিকল্পনাকে কার্যান্বিত করতে তৎপর হন। তিনি বলেছিলেন যে, আমি দার্জিলিং-এ থাকতে থাকতে তিনি সতীশবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে চান। কংগ্রেস কমিটিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে নেবার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। সতীশবাবুকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হয়। তিনি আসেন। প্রথমে আমরা তিনজনে বসে আলোচনা করি। পরে আমাকে অন্য কাজের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাঁরা দুজনে আলোচনা করেন। সতীশবাবু হবেন এই বোর্ডের প্রথম সদস্য, সাতকড়িবাবু হবেন দ্বিতীয় এবং তাঁরা দুজনে এর তৃতীয় সদস্য নির্বাচন করবেন। পল্লী-তহবিলের একাংশ তাঁরা তখনই তাঁদের অধিকারে পাবেন এবং জলপাইগুড়িতে আমাকে যে তোড়া দেওয়া হবে তার একাংশও আমি এই বোর্ড বা কমিটিকে দিয়ে দেব। কমিটিকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য প্রয়োজন হলে তাকে বেনোভলেণ্ট সোসাইটিজ্ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রী করা হবে। দেশবন্ধু এই উদ্দেশ্যে এটি পড়ে দেখবেন। দেশবন্ধু প্রতাপবাবুকে এই আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা বলেন। এবং সেগুলি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন।

চরখা এবং তার মাধ্যমে পল্লী-সংগঠনের প্রতি তাঁর এইরকম ভাবাবেগ ছিল। তিনি বলেছিলেন, "লর্ড বার্কেনহেড যদি হতাশ করেন তবে কাউন্সিলে আমরা কী করব তা জানি না। তবে একথা আমি জানি যে, আপনার চরখার পরিকল্পনা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং গ্রামগুলিকে সংগঠিত করতে হবে। আমাদের আবার পরিশ্রমী জাতিতে পরিণত হতে হবে। কাউন্সিলে আমাদের শক্তি আনতেই হবে। বাংলা দেশের যুবকদের আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সম্ভব হলে গভর্নমেণ্টের সাহায্য নিয়ে আর প্রয়োজন হলে তা ছাড়াই আমাকে দেখাতে হবে যে, হিংসা না করেও স্বরাজ লাভ করা সম্ভব। দেশের মুক্তির জন্য আপনার কাছে অহিংসা যেমন অন্তিম নীতি আমার কাছেও তেমনি। অহিংসা ছাড়া আমরা আইন অমান্য করতে পারি না। আর আইন অমান্যের যোগ্যতা লাভ করতে না পারলে স্বরাজও লাভ করা যাবে না। বাস্তবে তা হয়ত আমাদের প্রয়োগ করতে হবে না, কিন্তু তার জন্য আমাদের যোগ্য হতে হবে। আমার অধৈর্য যুবকদের জন্য আমাকে কাজ বার করতে হবে। আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, আমরা যত্নশীল না হলে আমাদের শিবিরে দুর্নীতি প্রবেশের বিপদ আছে। সকল আচরণে

সত্যের মহিমার কথা আমি আমার গুরুর কাছে শিখেছি। আমি চাই যে, আপনি তাঁর সঙ্গে অন্তত কিছুদিন থাকুন। আমার যা প্রয়োজন আপনার তা নেই। কিন্তু যে শক্তি আমার আগে ছিল না তিনি আমাকে তা দিয়েছেন। আগে যে জিনিস আমি অস্পষ্টভাবে দেখতাম এখন আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাই।"

কিন্তু এই আলোচনার কথা আর বেশি দূর আমি চালিয়ে যেতে সাহস করি না। তবে পাঠকদের শুধু এই কথা আমি বলতে পারি যে, এই কথাবার্তা আধ্যাত্মিক আলোচনায় বা সঠিকভাবে বললে আধ্যাত্মিক বক্তৃতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, তখন তিনি কী করছেন এবং আরও শক্তিশালী হলে কী করার কথা ভাবছেন, এটি ছিল তারই বিরামহীন স্রোত। এই বক্তৃতার ফলে তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক স্বভাবের অন্তর্দৃষ্টি আমি লাভ করি। এর পরিচয় আমার আগে জানা ছিল না। এই আধ্যাত্মিকতাই যে তাঁর প্রভুত্বকারী ভাবাবেগ তা আমার জানা ছিল না। অনেক বিশিষ্ট বাঙালীর মধ্যে এই রকম ভাবাবেগ আছে। চার বছর আগে প্রথম যখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, গঙ্গার তীরে তিনি একটি কুটির নির্মাণ করতে চান এবং তারপর সাশুন হাসপাতালে আমাকে দেখতে এসে তিনি যখন এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন তখন সেই কথা শুনে মনে মনে আমি হেসেছিলাম এবং ঠাট্টা করে বলেছিলাম যে, তিনি যখন কুটির নির্মাণ করবেন তখন আমি তাঁর ভাগীদার হব। কিন্তু দার্জিলিং-এ আমি আমার ভুল আবিষ্কার করতে পেরেছি। তাঁর রাজনীতিতে তিনি যত আগ্রহশীল এতে তাঁর আগ্রহ তার চেয়েও বেশি—রাজনীতিতে তিনি তো পরিস্থিতির চাপে পড়েই প্রবেশ করেছেন।

পাঠক যেন একথা মনে না করেন যে, আমাদের আলোচনার সব বিষয়ের কথা আমার বলা হয়ে গিয়েছে। কেবল মুখ্য কথাগুলিই আমি মনে করতে চেষ্টা করেছি। ইউরোপীয়ন ও ভারতীয় লোকদের সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা আমি বাদ দিয়েছি।

কিন্তু আমাদের মূল আলোচনা যেমন সব সময় চরখার দিকে আবর্তিত হয়েছে, আমাদের নিত্য কর্মও তেমনি ভিন্নরূপ ছিল না। সমস্ত বাড়িটা চরখা ক্লাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মহাদেব, সতীশবাবু এবং আমি দক্ষ শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলাম। দেশবন্ধুকে আমরা সকলেই শিখিয়েছি। পাটনায় তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুকে তিনি একজন শিক্ষক দেবার কথা বলেছিলেন কিন্তু সেই সময় অসুস্থ থাকায় তিনি

প্রগতি করতে পারেননি। দার্জিলিং-এ তাঁর বেশি আশা ছিল। তাঁর বাম কাঁধে ব্যথা করছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, সেই ব্যথা চলে গেলে তিনি ভালভাবে সুতো কাটতে পারবেন। "তবে জেনে রাখুন, আমি আমার হাতের কাজে ভীষণ বোকা। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন আমি কত অসহায়।" বাসন্তী দেবী বললেন, "হাঁ, উনি ওঁর ছোট বাক্সের চাবি খুলতেও আমাকে ডাকেন।" আমি বললাম, "আপনারা মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বেশি চালাক। ছোট ব্যাপারেও আপনি আপনার স্বামীকে অসহায় করে রেখেছেন, যাতে তাঁর উপর সম্পূর্ণ অধিকার আপনার বজায় থাকে।" মনে হল যেন সমস্ত বাড়িটা দেশ-বন্ধুরা হাসিতে ফেটে পড়ল। আন্তরিকভাবে তিনি কাঁদতে এবং হাসতে জানতেন। তাঁর স্ত্রীর মতই তিনি গোপনে কেঁদেছিলেন। এই অভিভূতকারী দুঃখের মধ্যেও বাসন্তী দেবী তাঁর নিকটতম লোকের সামনে কাঁদেননি। কিন্তু দেশবন্ধু জনতার সামনে হাসতে পারতেন এবং তাঁর উচ্চ হাসির রশ্মিতে তিনি সবাইকে অভিভূত করতে পারতেন। আমাদের গুরুতর আলোচনা হাসির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং সেই হাসি বাড়িসুদ্ধ লোক শুনতে পায়। তিনি জানতেন যে, আমি বাবু হয়ে বসা পছন্দ করি। তিনি তাঁর বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি চেয়ারে বসেছিলাম। চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় আমার পা দুটি অস্বচ্ছন্দভাবে ঝুলছে অথবা চেয়ারের উপরেই আমি বাবু হয়ে বসতে চেষ্টা করছি, এই দৃশ্যটি তিনি সহ্য করতে পারেননি। সুতরাং তাঁর বিপরীত দিকে বিছানার উপর একটি বালিশ পেতে তার উপর হাতে কাটা পশমের একটি কম্বল রেখে গদী তৈরী করলেন। আমাকে তাতে বসালেন। তাঁর সামনাসামনি স্বচ্ছন্দের সঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে আমি বললাম, "আপনি জানেন, এটি আমাকে কী মনে করিয়ে দিচ্ছে? আমার স্মৃতি চল্লিশ বছরের পুরাতন এক ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের সময় আমি এবং আমার স্ত্রী এইভাবে বসেছিলাম। এখন যেটির অভাব তা হল পাণিপীড়ন। কী জানি বাসন্তী দেবী এইসব দেখে কী মনে করবেন।" উচ্চ হাসিতে সমস্ত বাড়িটা আবার ফেটে পড়ল। হায়, সে জিনিস আর শোনা যাবে না।[১৫]

## প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

আজ দেশবন্ধুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে কাজ করতে করতে মারা গিয়েছেন। কেননা তিনি মারা গিয়েছেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস

নিয়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল নিজের প্রতি এবং দেশের প্রতি, কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি আস্থাবান। শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজের কথা চিন্তা করেননি, করেছেন দেশের কথা। তিনি একটি আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই আদর্শের মধ্যে তিনি আজও জীবিত; কেননা সেই আদর্শ তাঁর মৃত্যুর পরেও সঞ্জীবিত রয়েছে। বাংলা দেশের মতবিরোধ এবং ভারতবর্ষের ভ্রাতৃঘাতী-যুদ্ধ তাঁর আদর্শের পরিপন্থী। কিন্তু আমি মনে করি যে, এই নৈতিক অবনতি আদর্শ রূপায়ণের পথে সাময়িক ঘটনা মাত্র। আত্মশুদ্ধির কাজে আমরা খাড়া পাহাড় এবং গভীর খাদের দ্বারা প্রতিহত হবই। খাদের উপর পোল তৈরী করে এবং পাহাড় কেটে আমাদের পথ করে নিতে হবে। এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, এই অসুবিধাগুলিকে আমরা অতিক্রম করবই। তার মূল্য আমাদের কাছে বেশি মনে হচ্ছে। হয়ত তা আরও বেশি মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য—যার জন্য দেশবন্ধু, লোকমান্য এবং তাঁদের পূর্বসূরীরা জন্মেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন—তার জন্য কোন মূল্যই বেশি হতে পারে না।[১৬]

## অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক

আমি আশা করি যে ইয়ং ইণ্ডিয়ার পাঠকেরা অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারকের কথা ভুলে যাননি। কানপুর কংগ্রেসের পর যখন আমি ঘোরা বন্ধ করি তখন আমি জানতাম যে, অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহও বন্ধ হয়ে যাবে। এই অর্থসংগ্রহের জন্য আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু তা অনিবার্য ছিল। যখন আমি এই ভ্রমণ স্থগিত করি তখন আমি বলেছিলাম যে, ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে বছরের শেষে অর্থসংগ্রহের জন্য আবার আমি ভ্রমণ শুরু করব। কলকাতায় আমি আবার তা শুরু করেছি এবং এখন আমি যা অর্থ সংগ্রহ করছি তা সবই অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক তহবিলে জমা হবে। তবে দাতা যদি কোন বিশেষ কাজের উল্লেখ করে কোন টাকা দেন তবে সেই টাকা এতে জমা হবে না। আর যেহেতু অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক তহবিলের উদ্দেশ্য হল পল্লী-সংগঠন এবং তা চরখা-আন্দোলনের মাধ্যমে, সেই হেতু এই অর্থ স্বাভাবিকভাবে অখিল ভারত চরখা সংঘের অংশ হয়ে যাবে। স্মৃতি তহবিলের টাকা এই সংঘের মাধ্যমে পল্লী-সংগঠনের কাজে ব্যবহৃত হবে। অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারক সমিতি কানপুরে ১৯২৫ সালে এই মর্মে একটি

প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, আমার এই ভ্রমণের সময় যাঁরা সভার আয়োজন করার জন্য ভারপ্রাপ্ত তাঁরা সভায় যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদের কাছে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্যটি প্রচার করতে যত্নশীল হবেন। সভায় চাঁদা চাইলে সভায় যোগদানকারীদের মধ্যে যেন বিস্ময় ভাব দেখাবার ইচ্ছা না জাগে। সঠিক পথ হল এই যে, তাঁদের আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া যে তাঁদের কাছে টাকা চাওয়া হবে। যাঁরা এই স্মারকে এবং এর উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন না তাঁদের টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি একথাও জানি যে, এমন লোক আছেন যাঁরা দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু চরখা-আন্দোলনে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই সব লোকেদের আমি মৃত্যুর ঠিক সাত দিন আগে দেশবন্ধু তাঁর শেষ ইচ্ছা, যা তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে, তাঁর বোনের কাছে, তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীর কাছে, খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের কাছে এবং আমার কাছে বলেছিলেন,সেই কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন যে, দার্জিলিং থেকে নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনেপ্রাণে চরখা-আন্দোলনে যুক্ত হবেন। তিনি দেখেছিলেন যে, এইটিই শ্রেষ্ঠ গঠনাত্মক আন্দোলন যা আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং এইটিই পল্লী সংগঠন ও গ্রাম পুনর্গঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই কারণেই তিনি সতীশবাবুকে ডেকে পাঠাবার জন্য আমাকে বলেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে চরখা-আন্দোলনের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন ও পল্লী পুনর্গঠনের জন্য সংগৃহীত অর্থের বেশির ভাগ এই আন্দোলনে ব্যয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং আমি বলতে পারি যে, চরখা সংঘ হল দেশবন্ধুর ইচ্ছার স্বাভাবিক পরিণতি।[৯৭]

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

একজন বৈজ্ঞানিকরূপে ডঃ রায়ের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ দেশবাসী তিনি ভাল সাবান তৈরী করতে পারেন বলে তাঁকে মনে করবে না, এমন কি তিনি যে বহু বাঙালী যুবকের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন তার জন্যও তাঁকে মনে করবে না। তারা তাঁকে এই বলে জানবে যে, তিনি তাদের দীন কুটিরে খদ্দরের মাধ্যমে সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বহন করে এনেছেন।[৯৮]

ডঃ পি. সি রায়ের বয়স ৭৫ বছর। যুবা বয়স থেকেই তিনি শরীরে দুর্বল। তবু পৃথিবীর রসায়নবিদদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য এবং আজও তিনি যুবকের উৎসাহ ও শক্তি ধরে রেখেছেন। সেবা করার প্রতি তাঁর লোভ কখনোই

পরিতৃপ্ত হয় না। দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে, বিশেষ করে ছাত্রদের সাহায্য করতে তিনি কখনই অস্বীকার করেন না। তিনি এত উদার যে, প্রতারকেরা তাঁর নাম ভাঙিয়ে কার্যসিদ্ধি করে বলে জানা গিয়েছে। তার জন্য তিনি কিছু মনে করেন না। তিনি তাঁর অমিতব্যয়িতার জন্য গর্ববোধ করেন এবং যাঁরা তাঁর কাছে পার্থক্য করার যুক্তি তোলেন তাঁদের কাছ থেকে তিনি দূরে সরে যান। তিনি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেন, দরজা উন্মুক্ত রাখেন এবং সকলকেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন। যখন তাঁর সমবয়স্কেরা হয় অতীত হয়ে গিয়েছেন আর নয়ত কোন কাজ করার পক্ষে হীনবল হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি এত সেবা করার পরেও প্রফুল্ল থাকেন কি করে ? তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদে এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। আমার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর কিছু লেখার অবকাশ হয়েছিল। (তাঁর কাছে) সামান্য ঘটনাটির উল্লেখমাত্র না করে (তাঁর তুলনায় আমি তো আর ছেলেমানুষ নই) তিনি শান্তভাবে ঐ পরিচ্ছদের একটি 'অবিশুদ্ধ' প্রুফ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটিতে এমন উজ্জ্বল আশার কথা আছে যে, তা বৃদ্ধ ও দুর্বলদের সঙ্গে ভাগ করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই। আর এ বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ যে, যুবকেরাও এটি পড়ে লাভবান হবেন। ডঃ রায় তাঁর শক্তি ও বৃদ্ধ বয়সের জন্য যেসব যুক্তি উত্থাপন করেছেন তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর অদম্য রসবোধ ও তাঁর ছেলেমানুষির ভাবটি যোগ করব। আমি তাঁকে নির্লজ্জের মত শ্রীযুক্ত যমুনালালজী এবং মৌলনা সৌকত আলির মত মোটাসোটা বন্ধুদের কাঁধে চাপতে এবং সব রকমের ঠাট্টাতামাশা করতে দেখেছি। সেই সময় তিনি ভুলে যান যে, পৃথিবী তাঁকে একজন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক বলে জানে এবং তিনি একটি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ। আর প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন এটির প্রতিষ্ঠাতা।[২৯]

[আচার্য রায় বাংলা দেশের কয়েকটি খাদি কেন্দ্র ঘুরে একটি চিঠিতে গান্ধীজীকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানান। গান্ধীজী চিঠিটি প্রকাশ করেন এবং খাদি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রসঙ্গত নিচের কথাগুলি লেখেন।]

আমি ডঃ রায়কে বলেছি যে, যদি তাঁর শরীরে কুলোয় তবে যেন তিনি তাঁর প্রেমের বাণী উৎপাদন কেন্দ্রগুলির চারপাশেও প্রচার করেন। সমগ্র বাংলা দেশে পাতলা কাপড় ব্যবহৃত হয়। তারা পাতলা খদ্দর কেন পরবে না ? নতুন পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা দেশ যদি ফাটকার জন্য না করে

কেবল ঘরে ব্যবহারের জন্য তুলা উৎপাদন করে তবে খদ্দরের দাম সস্তা হতে পারে। কিন্তু সেই দিন এখন অনেক দূরে। বর্তমানে বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অঞ্চলের উচিত ব্যবসায়ী মনোভাব না নিয়ে এবং মূল্য-বিচার না করে মানবতার দৃষ্টিতে খদ্দর ব্যবহার করা।[১০০]

## সুশীল রুদ্র

একজন সম্মানিত বন্ধু ও নীরব দেশকর্মীর মৃত্যুতে আমার শোকের অংশ-গ্রহণ করতে আমি পাঠকদের অনুরোধ করব। আমি অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্রের কথা বলছি। তিনি মঙ্গলবার ৩০শে জুন দেহত্যাগ করেছেন। ভারতবর্ষের মূল ব্যাধি হল রাজনৈতিক দাসত্ব; যাঁরা পদাতিক ও নৌবাহিনী, অর্থ ও কূটনীতির ত্রিতয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম করেন, ভারতবর্ষ কেবল তাঁদেরই গুণ গ্রহণ করে থাকে। জীবনের অন্যদিকে যেসব কর্মী স্বার্থত্যাগ করেন এবং নিজেদের মুছে ফেলেন, ভারতবর্ষ স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁদের মনে রাখে না—অথচ জীবনের এই সব দিক শুদ্ধ রাজনৈতিকতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্র এই জাতীয় একজন বিনম্র কর্মী ছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী ছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাবিদ। অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি নিজেকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর একরকম আধ্যাত্মিক বন্ধন ছিল। তিনি নিজে খ্রীষ্টান হলেও তাঁর হৃদয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের জন্য স্থান ছিল এবং সেগুলির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করতেন। তাঁর কাছে খ্রীষ্টধর্ম অন্য-নিরপেক্ষ ছিল না, যা যারা যীশুখ্রীষ্টকে একমাত্র মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করে না তাদের চিরমৃত্যুর জন্য নিন্দা করে। নিজের বিশ্বাসের খ্যাতির জন্য ঈর্ষার ভাব থাকলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর সহনশীলতা ছিল। তিনি রাজনীতির একজন আগ্রহী ও সাবধানী ছাত্র ছিলেন। তথাকথিত চরমপন্থীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা তিনি যদি প্রকাশ্যে ঘোষণা নাও করে থাকেন, তা গোপনও তিনি করেননি। ১৯১৫ সালে ঘরে ফেরার পর থেকে যতবারই আমি দিল্লী গিয়েছি ততবারই আমি তাঁর অতিথি হয়েছি। রাওলাট অ্যাক্টের বিষয় নিয়ে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করার আগে পর্যন্ত আমাকে অতিথি করা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। উঁচু মহলে তাঁর অনেক ইংরেজ বন্ধু ছিল। তিনি শুদ্ধ ইংরেজ মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর

কলেজে তিনিই প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছিলেন। সেজন্য আমি ভেবেছিলাম যে, আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তাঁর বাড়িতে আমাকে আশ্রয়দান তাঁকে হয়ত বিপদগ্রস্ত করতে পারে এবং তাঁর কলেজকে অহেতুক ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। আমি তাই অন্য জায়গায় থাকার কথা বলেছিলাম। তাঁর উত্তর তাঁর মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল: "লোকেরা যতটা কল্পনা করতে পারে আমার ধর্ম তার চেয়েও বেশি গভীর। আমার কতকগুলি মতামত আমার জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। গভীর এবং দীর্ঘ প্রার্থনার পর আমার সেই মতামত গঠিত হয়েছে। আমার ইংরেজ বন্ধুরা সে কথা জানেন। এক জন সম্মানীত বন্ধু ও অতিথিরূপে আপনাকে ঘরে স্থান দিলে বোধ হয় আমাকে কেউ ভুল বুঝবে না। ইংরেজদের উপর আমার যে প্রভাব আছে সেটি হারানো আর আপনাকে হারানোর মধ্যে আমাকে যদি কখনও একটিকে বাছতে হয় তবে আমি কি বাছব তা আমি জানি। আপনি আমাকে ছেড়ে যেতে পারেন না।" আমি বলেছিলাম, "কিন্তু আমার সঙ্গে যে সব রকমের বন্ধু দেখা করতে আসেন তার বেলায়? আমি যখন দিল্লীতে থাকব তখন নিশ্চয় আপনি আপনার বাড়িটাকে সরাইখানায় পরিণত হতে দেবেন না।" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনাকে সত্য কথা বলতে কী আমি এই সবই পছন্দ করি। যে সব বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁদের আমি পছন্দ করি। একথা ভাবতে আমার ভাল লাগে যে, আপনাকে আমার কাছে রেখে দেশের সামান্য সেবা আমি করতে পারছি।" পাঠকেরা হয়ত জানেন না যে, খিলাফতের দাবি সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্বলিত যে খোলা চিঠি আমি ভাইসরয়কে দিয়েছিলাম সেটি অধ্যক্ষ রুদ্রের বাড়িতে কল্পিত এবং লিখিত হয়েছিল। তিনি এবং চার্লি এণ্ডরুজ আমার লেখা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তাঁর আতিথেয়তার মধ্যে অসহযোগ কল্পিত এবং উদ্ভাবিত হয়েছিল। মৌলানা, অন্যান্য মুসলমান বন্ধু এবং আমার মধ্যে যে গোপন সম্মিলন হয়েছিল তিনি ছিলেন তার নীরব এবং আগ্রহী দর্শক। ধর্মীয় প্রবর্তনা ছিল তাঁর সমস্ত কাজকর্মের বুনিয়াদ। সেজন্য পার্থিব ক্ষমতার কোন ভয় তাঁর ছিল না, যদিও ধর্মীয় প্রবর্তনা তাঁকে জীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে এবং পার্থিব ক্ষমতার সঙ্গে সখ্য স্থাপনে এবং তার প্রয়োগে তাঁকে সক্ষম করে তুলেছিল। ধর্মীয় অনুভূতি যে মানুষের মনে সামঞ্জস্যের নির্ভুল বোধ জাগ্রত করে দেয় যার ফলে কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে এক সুন্দর ঐক্য সৃষ্টি হয়, এই সত্য

তিনি তাঁর জীবনে প্রমাণিত করেছিলেন। একজন মানুষ নিজের কাছে যতগুলি ভাল চরিত্র আকৃষ্ট করার ইচ্ছা করতে পারেন; অধ্যক্ষ রুদ্র তাঁর নিজের জীবনে তা সম্ভব করেছিলেন। সি. এফ. এণ্ডরুজ এবং অধ্যক্ষ রুদ্রের কাছে আমরা কত ঋণী তা অনেকেই জানেন না। তাঁরা যেন যমজ ছিলেন। তাঁদের আত্মীয়তা আদর্শ বন্ধুত্বের একটি পাঠ। অধ্যক্ষ রুদ্র তুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রেখে গিয়েছেন, তারা সকলেই বড় এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তারা জানে যে, তাদের মহৎপ্রাণ পিতার অসংখ্য বন্ধু ও গুণমুগ্ধরা তাদের শোকের অংশীদার।[১০১]

সাগরলাল হাজরা

কোন দেশই তার মহৎ সন্তানদের নামের হিসাব রাখতে পারে না। তাঁরা তাঁদের কাজের দ্বারাই পরিচিত থাকেন; যেমন মূল্যবান প্রাচীন বইগুলির গ্রন্থকারেরা তাঁদের কাজের দ্বারাই পরিচিত রয়েছেন, তাদের নাম কেউ জানে না। এমন অনেক যুবক আছেন যাঁরা তাঁদের দেশের সেবা করতে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু যশের দিক থেকে তাঁরা অপরিচিত রয়ে গিয়েছেন। হুগলীর আরামবাগে খাদির কাজ করতে গিয়ে এই রকম এক নীরব কর্মীর মৃত্যু সংবাদ আমি পেয়েছি। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু বাংলা দেশের খুবই ম্যালেরিয়ায় অধ্যুষিত একটি জেলায়, সেখানে ম্যালেরিয়া যখন মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল তখন লোকেদের প্রথমে সেবা ও শুশ্রূষা করবার জন্য গিয়েছিলেন। তারপরে সেখানকার তুঃস্থ লোকেদের মধ্যে খাদি সংগঠন করার জন্য তাঁরা সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর এক বন্ধু এবং সহকর্মী তাঁর সম্পর্কে এইভাবে লিখেছেন:

"গভীর তুঃখের সঙ্গে আমি আমার প্রিয় বন্ধু সাগরলাল হাজরার মৃত্যু সংবাদ আপনাকে জানাচ্ছি। তিনি ১২ই নভেম্বর রাত্রি তুটায় আমার সেখানে পৌঁছবার আগেই শান্তভাবে দেহত্যাগ করেন। এই কেন্দ্রে তিনি সব চেয়ে ভাল কর্মী ছিলেন। গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং সহানুভূতি তাঁকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন এই কেন্দ্রের 'ধাত্রী'। গ্রামের দরিদ্রতম লোকের রোগশয্যায় গিয়ে তিনি এত দরদের সঙ্গে তার সেবা করতেন যে, তাঁর কেবল উপস্থিতিতেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট রুগী উৎসাহ বোধ করত। তিনি ভাল কাটুনি ছিলেন এবং সেই রকম ভাল কাপড়ও বুনতে

পারতেন। এখন ঈশ্বর তাঁকে উচ্চতর মর্যাদার কাজ করবার জন্য নিয়ে গিয়েছেন। আর আপনি সেকথা আমাকে সুন্দরভাবে লিখেছেন যে 'শ্রেষ্ঠতর অনুকূলতার' মধ্যে সেবা করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর মা-বাবা এবং দুটি ছোট ভাইকে রেখে গিয়েছেন।"

এই মহৎ আত্মা শান্তিলাভ করুক এবং তাঁর মা-বাবা ও ভাইরা তিনি যে কাজ রেখে গিয়েছেন সেই কাজ অনুসরণ করে মৃত ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষা করুন। আমি বিশ্বাস করি যে, হাঙ্গরা তাঁর যে-দেহ দূষিত হতে পারে তার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠতর অবস্থার দিকে যাত্রা করেছেন।[১০২]

## প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

খুবই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা যে এই মুহূর্তে খাদিকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন তা সময়ের প্রয়োজনকে সূচিত করছে এবং পুরাতন পরম্পরার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে যখন প্রেমবশত মানুষ জাতীয় অথবা ধর্মীয় সেবার কাজ করত। খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশবাবু আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ অক্লান্তভাবে বাংলা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, খাদিকে জনপ্রিয় করার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত সভাগুলিতে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং নিজের সমর্পিত কাঁধে খদ্দরের কাপড় রেখে ফেরি করে বেড়াচ্ছেন। ডঃ ঘোষ ডঃ রায়ের একজন প্রিয় ছাত্র। তিনি মিণ্টে ৫০০ টাকা বেতনের চাকুরি করতেন। তিনি এখন ৩০ টাকার বেশি নেন না এবং এখন তিনি কী ভাবে থাকেন তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। বাংলা দেশে অথবা সমগ্র ভারতে তিনি একজন মাত্র লোক নন যিনি ভিক্ষুকের মত থেকে চরখার মাধ্যমে দরিদ্রের সেবা করছেন। বাংলা দেশের এবং বাংলার বাইরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এমন বহু যোগ্য ও শিক্ষিত যুবক আছেন যাঁরা খাদিকে একমাত্র না হলেও মূল কাজ বলে গ্রহণ করেছেন এবং সামান্য খাদ্য গ্রহণ করে সেই কাজ করে চলেছেন। কিন্তু যেহেতু খাদির লক্ষ্য হল ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের সেবা করা সেই হেতু তা স্বভাবতই কয়েক শত নয়, হাজার হাজার যুবক-যুবতীর নিষ্ঠা দাবি করে।[১০৩]

## যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

বিহার ভ্রমণ শেষ করে মধ্য প্রদেশে যাবার সময় আমি যখন বাবু যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনি তখনই আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষিতীশবাবুকে

তাঁর জীবনের বিস্তারিত বিষয় জানাবার জন্য লিখি। যোগেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে ঢাকার মসলিন—যাকে নিশির শিশিরের সঙ্গে তুলনা করা হয় সেই জিনিসের তিনি পুনঃপ্রচলন করতে সক্ষম। তাঁর জীবনী আমি পেয়েছি এবং পাঠকদের কাছে তা উপস্থিত করছি :

"২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত পানপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত জটিলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার ২৭শে জানুয়ারী কলেরায় আক্রান্ত হন এবং রবিবার ৩০শে জানুয়ারী সকালে মারা যান। তিনি তাঁর স্ত্রী, এক বছরের একটি মেয়ে, ছোট ভাই এবং বৃদ্ধ পিতাকে রেখে গিয়েছেন। তাঁর ছোট ভাই ই. বি. রেলওয়েতে কাজ করেন।

"যোগেশ্বরবাবু বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন এবং কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। তারপর তিনি ই. বি. আর-এ চাকরি নেন এবং কাঁচড়াপাড়া এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে সাত বছর কাজ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫।

"তিনি অসহযোগের সময় সূতা কাটা গ্রহণ করেন এবং খুবই আগ্রহশীল কাটুনী হয়ে যান। ১৯২৪ সালে তিনি যখন প্রতিষ্ঠানকে তাঁর ৬০ নম্বরের সূতা বোনবার জন্য দেন তখন থেকে তিনি প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সূতার তুলা তাঁর বাগানে জন্মেছিল। তাঁর সূতা থেকে যে কাপড় তৈরী হয় তা গান্ধীজীকে উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং গান্ধীজী তা থেকে কিছু কাপড় প্রতিষ্ঠানকে প্রদর্শনীর জন্য দিয়ে দেন। তিনি তাঁর উঁচু নম্বরের সূতা (১০০ নম্বর) এবং সূতা কাটার গতিবেগ ১৯২৫ সালে কানপুর প্রদর্শনীতে দেখিয়েছিলেন এবং ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৌহাটিতে যে প্রদর্শনী হয়েছিল সেখানে তিনি ২০০ নম্বরের সূতা কেটেছিলেন। খাদি প্রতিষ্ঠান এই দুটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। মির্জাপুর পার্কে প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর যে পূজা-প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে যোগেশ্বরবাবু সেখানে তাঁর দক্ষতার প্রদর্শন করতেন। গৌহাটি প্রদর্শনীতে ২০০ নম্বরের মসলিন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছিল এবং সেই মসলিন যোগেশ্বরবাবুর সূতা থেকে প্রস্তুত হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে—কানপুর প্রদর্শনী থেকে গৌহাটি প্রদর্শনী পর্যন্ত—তিনি ঐ মসলিনের জন্য ২০০ নম্বরের সূতা কেটেছিলেন এবং ১০০ নম্বরেরও অনেক সূতা কেটেছিলেন যা থেকে দুটি ধুতি বোনা হয়েছে।

শেষোক্ত ধুতির মধ্যে একটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে এবং আর একটি তাঁর বাবাকে দেওয়া হয়েছিল।

"গৌহাটি থেকে ফেরার পর সতীশবাবুর অনুরোধে তিনি ৩০০ নম্বরের সুতা কাটছিলেন। তিনি বরাবর প্রতিষ্ঠানের বাক্স চরখায় সুতা কেটেছেন। তিনি পরিপূর্ণরূপে খাদি-মানুষ ছিলেন এবং আবার সময়ে সুতা কেটে এই রকম প্রগতি করতে পেরেছিলেন।"

আমি মৃতের পরিবারবর্গের প্রতি আমার সহানুভূতি নিবেদন করছি এবং আশা করছি যে, পুরাতন শিল্পকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা যোগেশ্বরবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে না। সকলে মনে রাখবেন যে, যোগেশ্বরবাবুর শ্রম স্বদেশহিতৈষীর প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং তাঁর এই বিরাট প্রচেষ্টা কেবল স্বেচ্ছা-কাটুনীদের দ্বারাই অনুসরণ করা সম্ভব।[১০৪]

## লর্ড সিংহ

ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট সেবকের স্মৃতির প্রতি যেসব শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলিটিও আমি সংযোজন করছি। যখন হিসাব করার সময় হবে তখন দেখা যাবে যে, আধুনিক ভারত রচনায় লর্ড সিংহের অবদান খুবই উঁচুতে রয়েছে। রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে তাঁর অভিমত চাওয়া হত এবং সেই অভিমতের খুব মূল্য দেওয়া হত। লর্ড সিংহের মৃত্যুতে দেশ আরও গরীব হয়ে গেল।[১০৫]

## এস. আর. দাশ

শ্রীযুক্ত এস. আর. দাশের মৃত্যুতে শ্রীযুক্তা এস. আর. দাশ এবং তাঁর পরিবারবর্গকে আমি আমার সশ্রদ্ধ শোকানুভূতি নিবেদন করছি। যদিও রাজনীতিতে তাঁর সঙ্গে আমার মিল খুব কমই ছিল তবু তাঁর অসাধারণ ঔদার্য এবং সারল্য আমি স্বীকার না করে পারি না। অনেকেই জানেন না যে, এই মহান পুরুষ কোন প্রয়োজনীয় বিষয় যাতে তাঁর দুয়ার থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে না যায় তার জন্য নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছিলেন।[১০৬]

## নগেন্দ্রনাথ বসু

আমি হিন্দী প্রচার সম্মেলন সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছি তাতে ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বসুর হিন্দী বিশ্বকোষের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিরাট

কাজের কথা দু বছর আগে আমি শুনেছিলাম। আমি এ কথাও শুনেছিলাম যে, গ্রন্থকার অসুস্থ এবং বিছানায় শায়িত। শ্রীযুক্ত বসুর পরিশ্রমের কথা শুনে আমি এত বিস্মিত হয়েছিলাম যে, তাঁকে চোখে দেখার এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাজ জেনে আসার মনস্থ আমি করেছিলাম। সেজন্য মনে মনে আমি স্থির করেছিলাম যে, কংগ্রেসের কাজে কলকাতায় এলে এই তীর্থযাত্রা আমি করব। সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে যাবার পথে আমার সেই প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পেরেছি। আমি প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হয়েছিলাম। আমি গ্রন্থকারকে বিস্মিত করেছিলাম, কেননা আমার যাবার কথা আগে থেকে নির্ধারিত ছিল না। আমি তাঁকে প্রায় আসবাবশূন্য ও শান্ত অনাড়ম্বর ঘরে বিছানার উপর বসে থাকতে দেখেছিলাম। সেখানে কোন চেয়ার ছিল না। তাঁর বিছানার ঠিক পাশে বইতে ভর্তি একটি ছোট আলমারি এবং পিছনে একটি ছোট ডেস্ক ছিল। তাঁর বিছানার উপর তিনি আমাকে বসতে বললেন। সেখানে না বসে পাশের একটি টুলে আমি বসলাম।

তিনি হাঁপানির রুগী। যে অল্প সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম তার মধ্যেই আমি তাঁর রোগযন্ত্রণা লক্ষ্য করেছিলাম। শ্রীযুক্ত বসু বলেছিলেন, "আমি যখন অতিথিদের সঙ্গে কথা বলি তখন আমি ভাল বোধ করি এবং সেই মুহূর্তে আমি অসুখের কথা ভুলে যাই। আপনি যখন চলে যাবেন তখন আমি আরও বেশি কষ্ট পাব।"

তিনি তাঁর প্রচেষ্টার যে কথা আমাকে বলেছিলেন তার সারাংশ এখানে দেওয়া হল: "বাংলা বিশ্বকোষ যখন আমি শুরু করি তখন আমার বয়স ১৯। শেষ খণ্ড যখন আমি শেষ করি তখন আমার বয়স ৪৫। এটি খুবই সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। হিন্দী সংস্করণের চাহিদা ছিল। স্বর্গত বিচারক সারদাচরণ মিত্র পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমি নিজেই যেন এটি প্রকাশ করি। আমি ৪৭ বছর বয়সে কাজ শুরু করি এবং এখন আমার বয়স ৬৩ বছর। এটি শেষ করতে আরও তিন বছর লাগবে। আমি যদি আরও গ্রাহক অথবা অন্য সাহায্য না পাই তবে এই মুহূর্তে আমার ২৫০০০ টাকা ক্ষতি হবে। কিন্তু তার জন্য আমি কিছু মনে করি না। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আমি যখন আমার সঙ্গতির শেষ সীমায় পৌঁছাব তখন ঈশ্বর আমার কাছে সাহায্য পাঠাবেন। আমার এই শ্রম হল আমার সাধনা। আমি তার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের পূজা করি। কাজের জন্যই আমি বেঁচে আছি।"

শ্রীযুক্ত বসুর মধ্যে কোন রকম নৈরাশ্য নেই। তাঁর মিশনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর রয়েছে। এই তীর্থযাত্রার জন্য আমি ধন্য, এটি বাদ দেওয়া আমার কিছুতেই উচিত হত না। আমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন ডঃ মুরে তাঁর মহান কাজের জন্য যে শ্রম করেছিলেন সে কথা আমার মনে উদিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিরাট পুরুষদের মধ্যে কেন তুলনা করা হবে? আমাদের পক্ষে এই কথা জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, জাতি এই জাতীয় বিরাট পুরুষদের দ্বারাই গঠিত হয়ে থাকে।

এঁর ছাপাখানা, যার পিছনে গ্রন্থকার নিজে বাস করেন তার ঠিকানা হল : ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।[১০৭]

## রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

একজন বিশ্ব-বিশ্রুত পত্রিকার সম্পাদককেও তাহলে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হল। একজন আমেরিকান মানবতাবাদী তাঁর পত্রিকার জন্য যেসব লেখা লিখেছিলেন এবং মাঝে মাঝে যেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেই লেখাগুলি তিনি পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশের সাহস করেছিলেন বলে তাঁকে এই জরিমানা দিতে হয়েছে। ডঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের 'ইণ্ডিয়া ইন ব্যাণ্ডজ' বইটি মূলত মডার্ণ রিভিউ-তে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এই পত্রিকায় প্রায়ই উল্লেখ করেছি যে, যে ধারায় রামানন্দবাবুকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তা এমন ব্যাপক ও স্থিতিস্থাপক যে, যিনিই সত্য কথা সাহসের সঙ্গে লিখবেন তাঁকেই এই ধারায় অপরাধী গণ্য করা যায়। রামানন্দবাবুর মত প্রতিষ্ঠাবান লোককে এই ধারায় অভিযুক্ত করা বিচারের হাস্যকর অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তিনি কালো চামড়ার লোক, এইটিই হল তাঁর অপরাধ। প্রাচ্যের ছাপ তাঁর কপালে অঙ্কিত আছে বলে তাঁকে এবং তাঁর প্রকাশককে অপরাধী হিসাবে দণ্ডিত হতে হয়েছে। আমি মনে করি না যে, এই অভিযুক্তি রামানন্দবাবুর লেখার উপর অথবা তাঁর পত্রিকার জন্য তাঁর লেখা নির্বাচনের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। তিনি এক অপ্রত্যাশিত বিজ্ঞাপন পেয়ে গেলেন। গভর্নমেণ্ট অপ্রেম থেকে মুক্তি পায়নি। কিন্তু এই অভিযুক্তির যে মনঃকষ্ট তা সেই অপ্রেমকে বর্ধিত করে দিয়েছে। চরমপন্থী বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরা কখনো কখনো গ্রেপ্তার আশা করে

থাকেন। যাঁরা রামানন্দবাবুর মত স্বাধীন প্রকৃতির জন্য পরিচিত হলেও প্রশান্ত ভাবের জন্যও পরিচিত তাঁদের সেই কারণে ন্যায়ালয়ে (ভুল নামে অভিহিত) তাঁদের অপরাধীর মত টেনে আনা হবে, এই জিনিস আশা করা যায় না। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত জিনিস ঘটেছে। লোকমান্য তিলক যে বিশিষ্ট গ্যালারিতে ছিলেন সেইখানে যেতে পারার সৌভাগ্যের জন্য আমি রামানন্দবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আইনের খুঁটিনাটি যাই হোক না কেন, সাধারণ নাগরিকের কাছে এই অভিযুক্তি ও বিচার জাতির প্রতি অপরাধ বলেই গণ্য হবে।[১০৮]

ডঃ সাণ্ডারল্যাণ্ডের নির্দোষ পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করার পর বাংলা গভর্নমেণ্ট যদি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে অভিযুক্ত না করতেন তবে এতদিন ধরে তাঁরা যে পরম্পরা চালিয়ে এসেছেন তার সঙ্গে খাপ খেত না। বাজেয়াপ্ত করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোক করার কাজটি পুলিসের পক্ষে যতটা আড়ম্বর, অপমান এবং ক্রোধের পক্ষে করা সম্ভব তা করা হয়েছিল। কেননা জানা গিয়েছে যে, রামানন্দবাবুর কাছে যেসব কপি ছিল সেগুলি ভদ্রভাবে না চেয়ে তারা 'তাঁর অফিস হানা দেয় এবং ৩৫০টি না-বাঁধানো বই, ১০টি কাপড়ে বাঁধানো বাক্স, ৫ বাণ্ডিল বই-এর খোলা ফর্মা, এক বাণ্ডিল ছবির আবরণ এবং ৪৪টি বাঁধানো বই নিয়ে চলে যায়'।

একজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক ও দেশসেবককে অপমান করে পুলিস এবং বাংলা গভর্নমেণ্ট যদি সন্তোষলাভ করতে চান তো তা করুন। কিন্তু তাঁরা জেনে রাখুন যে, এই জাতীয় কাজের দ্বারা তাঁরা ব্যারোমিটারের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে আজ হয়ত আমরা অসহায়, কিন্তু সেই সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে যখন আর আমরা এমন অসহায় থাকব না।[১০৯]

## হরদয়াল নাগ

[অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের কার্যকলাপ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষের প্রবীণতম নেতা' গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি উধৃত করে প্রসঙ্গত গান্ধীজী নিচের কথাগুলি লেখেন।]

হরদয়ালবাবু তাঁর বিশ্রাম অর্জিত করেছেন। আর তাই সমস্ত সর্বজনীন কাজ থেকে তিনি যদি অবসর গ্রহণ করেন তবে কেউ কোন অভিযোগ করবে

না। পণ্ডিত মালব্যজী, আব্বাস তায়েবজী এবং বিজয় রাঘবেচারিয়ার—তাঁর এই তিনজন প্রতিযোগীর মত তিনিও কাজ করে যাওয়ার আগ্রহ রাখেন। সুতরাং তিনি তাঁর সমালোচকদের কাছ থেকে বয়সের অজুহাতে কোন রকম প্রশ্রয় আসা করতে পারেন না। আমি জানি যে, তিনিও তা চান না। ওঁর দেহ ও বুদ্ধি অবিকৃত রয়েছে এবং তা সব সময়েই জাতির অধিকারে রয়েছে।

সুতরাং তাঁকে আমি বলব যে যাঁরা প্রকৃতপক্ষে কাজ করছেন তাঁদের মনে কোন রকম হতাশার ভাব নেই। ক্ষেত্রটি এত নতুন যে তার প্রস্তুতির জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। কর্মীদের হাতে যা রয়েছে তার সঙ্গে তাল রাখবার যোগ্য তাঁরা নন।

তাই আমার কথা হল যে, হরদয়ালবাবু যে কারণগুলির উল্লেখ করেছেন তার জন্যই তাঁর মনে হতাশার ভাব রয়েছে। কর্তব্যের অবহেলার যে অভিযোগ উত্থিত হয়েছে সেই অপরাধ তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি যদি কাজ হাতে নিতেন তবে দেখতেন যে, সেই কাজ খুব কঠিন। কিন্তু তাহলেও তিনি নিশ্চয়ই হতোদ্যম হতেন না। তিনি যে এর আর্থিক দিকটি দেখতে পাননি তার কারণ হল এই যে, তা দেখার জন্য তিনি কাজ করেননি।[১১০]

## আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

[২৪-৫-২৫ তারিখে গান্ধীজী পাবনায় ছিলেন। পাবনার জমিদার শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র খুব ধনবান ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ক্রোড়পতি স্বরাজ্যবাদী শ্রীতুলসী গোস্বামীর বোন। তাঁরা দুজনেই এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিষ্ঠার সঙ্গে সুতা কাটতেন। যোগেশবাবু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ না দিলেও চরখার প্রচার করতেন। গান্ধীজীর কাছে এই বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'এটি আমার কাছে খুবই প্রিয়। ধর্মভাব নিয়ে খাদিকে গ্রহণ করবেন এবং ধর্মভাবে খাদি প্রচার করবেন, তার বেশি আমি আর কিছু চাই না। আমার কাছে এইটিই যথেষ্ট।' সেই দিন জনসভায় গান্ধীজী নিচের কথাগুলি বলেন।]

বাংলা দেশে প্রাদেশিকতা আছে এই দোষারোপ স্যার আশুতোষ মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বিশাল গ্রন্থসংগ্রহ কাশী বিদ্যাপীঠে দান করেছিলেন। এতে আমি তাঁর উদারতার প্রমাণ পেয়েছি।[১১১]

## নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত

নিবারণবাবু, যিনি কয়েকদিন আগে পুরুলিয়ায় দেহত্যাগ করেছেন, তিনি নম্র মানুষদের একজন ছিলেন। তিনি হরিজনদের প্রকৃত সেবক ছিলেন এবং তেমনিভাবে সকল দরিদ্র মানুষের বন্ধুও ছিলেন। অহিংসার অতুলনীয়

সৌন্দর্য তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং অহিংসার প্রতি তাঁর জীবনের জীবন্ত বিশ্বাস ছিল। তাঁর অনেক বন্ধু ও অনুগত, যাঁরা বিপদের সময় তাঁর দিকে পথনির্দেশ ও সান্ত্বনার জন্য চেয়ে থাকত তাঁদের কাছে তাঁর জীবন প্রেরণাস্বরূপ ছিল। তাঁর স্মৃতি তাঁদের চিরদিন প্রতিপালন করুক এবং তাঁদের ভাল থেকে অধিকতর ভালর দিকে পরিচালিত করুক।[১১২]

## নন্দলাল বসু

[১৯৩৬ সালে ফৈজপুর কংগ্রেসে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রসঙ্গত গান্ধীজী নিচের কথাগুলি বলেন।]

তিনি (নন্দলাল বসু) একজন সৃজনশীল শিল্পী, আমি তা নই। ভগবান আমাকে শিল্পের বোধ দিয়েছেন, কিন্তু তাকে সঠিক রূপ দেবার অঙ্গ আমাকে দেননি। নন্দবাবুকে তিনি এই দুটিই দিয়েছেন।...

দু মাস আগে যখন নন্দবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, তিনি যেন তাঁর শান্তিনিকেতনের শিল্প-বিদ্যালয় থেকে দামী দামী ছবি নিয়ে না আসেন। কেননা অসময়ের বৃষ্টি সেগুলি নষ্ট করে দিতে পারে। তিনি আমার পরামর্শ শুনেছিলেন এবং এখানকার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর যে শিল্পীর চোখ আছে তা নিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান এবং কৃষকদের ঘর থেকে অসংখ্য জিনিস সংগ্রহ করেন। এই জিনিসগুলিকে শিল্পের বিশেষ বস্তু বলে সাধারণ চোখ কোন দিনই ধরতে পারত না। কিন্তু তাঁর সূক্ষ্মদর্শী চোখ সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়েছে, সেগুলিকে ব্যবস্থিত করেছে এবং সেগুলির মধ্যে একটি নতুন অর্থ সংযোজন করেছে।[১১৩]

## অজিত বসু

[ডঃ অজিত বসু কলকাতার একজন বিখ্যাত প্রাকৃতিক চিকিৎসক। তিনি এডিনবরার শিক্ষিত এ্যালোপাথ। কিন্তু তিনি তার ব্যবহার না করে মালিশ, জলচিকিৎসা প্রভৃতি প্রয়োগ করতেন। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। ডঃ বসু কয়েক দিন ধরে গান্ধীজীকে পরীক্ষা করেন। বিদায়ের দিনে তিনি বলেন যে, তিনি গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তার উত্তরে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি তাঁকে বলেন।]

আপনার মত সব পাগলই আমার আশীর্বাদ পেয়ে থাকেন। কেননা আমি জানি যে, পৃথিবীতে মহান কাজ যেসব ভাল লোক আদর্শে পাগল তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছে। আপনি সেই রকম একজন পাগল।[১১৪]

## সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[ গভর্নমেন্ট ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন যে, তিনি যেন কোন বক্তৃতা না দেন এবং কোন শোভাযাত্রা পরিচালনা না করেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কিছুদিন পরে বজবজের একটি জুট মিলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যান। ফলে তাঁকে ফরিদপুরে তাঁর নিজের গ্রামে অন্তরীণ রাখা হয়। এ ছাড়া, মেদিনীপুরের কাঁথি সাব ডিভিসনের পিতাবস দাস ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করছিলেন। গভর্নমেন্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি। কিন্তু বরদৌলী প্রস্তাবের পর তিনি যখন সত্যাগ্রহ বন্ধ করেন তখন তাঁকে তাঁর গ্রামে অন্তরীণ থাকার এবং কোন কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে কথাবার্তা না বলার হুকুম জারী করা হয়। এই ঘটনা দুটি একজন পত্রলেখক গান্ধীজীকে জানালে তিনি নিচের কথাগুলি লেখেন। ]

ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে তা অবশ্যই নিষ্ঠুর। প্রতিহিংসাপরায়ণ কথাটির প্রয়োগ হয়ত এই ব্যাপারে শক্ত কথা বলে বিবেচিত হবে। আমি নিষ্ঠুর কথাটি ব্যবহার করছি, কেননা সুরেশবাবু অপরিচিত লোক নন। তিনি বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য। তিনি অসুস্থ বলে সবাই জানে। তিনি হাড়ের যক্ষ্মারোগে মারা যাচ্ছিলেন। কিন্তু বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছায়—তাঁর এই ইচ্ছা কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়, তা হল দেশের সেবা করার জন্য—তিনি এই সাংঘাতিক অসুখ থেকে বেঁচে ওঠেন। তিনি দীর্ঘদিন প্লাস্টার অফ প্যারিসের জামা পরেছিলেন, ডাক্তারদের নির্দেশ কঠোর ভাবে মেনে চলেছিলেন এবং কোন রকমে কাজ করবার অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। বাংলা গভর্নমেন্ট এই সব কথাই জানেন। তাঁরা জানেন যে, তাঁর সব সময় ডাক্তারদের পরামর্শ প্রয়োজন। তাঁর সযত্ন শুশ্রূষা এবং ডাক্তারী স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন। সেজন্য ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তরীণ করে রাখা নিষ্ঠুরতা। আমি জানি না যে, বাংলা গভর্নমেন্টের পক্ষে এই ডাক্তারকে অন্তরীণ করা কতদূর যুক্তিযুক্ত। তাঁদের দিকের কথা আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁকে অন্তরীণ করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, এবং তাও এমন একটি গ্রামে যেখানে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য ঠিকমত রাখতে পারবেন না, যেখানে ডাক্তারী সাহায্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য সহজে পাওয়া যায় না। সে গ্রাম তাঁর নিজের হলেও সেখানে তাঁকে অন্তরীণ রাখা নিষ্ঠুরতা। আমি আশা করি যে, বাংলা গভর্নমেন্ট এই অনুভবযোগ্য দাবির প্রতিবিধান করবেন।

পত্রলেখক অপর যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তা ভিন্ন প্রকৃতির। পিতাবসবাবুকে অন্তরীণ করার কোন অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য সেখানে খুঁজে

পাওয়া না। বাংলা গভর্নমেণ্ট জনগণের কাছে দায়গ্রস্ত। গভর্নর তাঁদের উপর হুকুম জারী করতে পারেন না। স্বেচ্ছাচারিতাভাবে তাঁরা ভারত রক্ষা আইন বলবৎ করতে পারেন না। তাঁরা যে কাজ করবেন তার যৌক্তিকতা তাঁদের জনতাকে বোঝাতে হবে। বিধানসভার যদি অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় তবে দায়িত্বশীল শাসনকর্তার কর্তব্য হল যে, যে সব কাজ তিনি করেছেন সেগুলি বিধান-সভাকে জানিয়ে দেওয়া। বঙ্গীয় বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের সম্পর্কে পত্র-লেখক যে ব্যঙ্গ করেছেন তার মধ্যেও যথেষ্ট সার আছে। সুরেশবাবু এবং পিতাবসবাবুর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা দাবি করার জন্য তাঁদের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে।[১১৫]

## ডঃ দত্ত

ফরমান খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দত্তের মৃত্যুতে দেশ একজন নিষ্ঠাবান ভারতীয় খ্রীষ্টানকে হারিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পরেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি স্বর্গীয় দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি যতক্ষণ না তাঁর প্রত্যেক বন্ধুর সঙ্গে আমায় পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ততক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। দিল্লীতে ১৯২৪ সালে আমি যখন একুশ দিনের অনশন করেছিলাম তখন সেই উৎকণ্ঠিত সময়ে ডঃ দত্ত ঐক্য সম্মেলনের জন্য দিনরাত প্রাণ দিয়ে খেটেছিলেন। দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল বৈঠকের সময়েও আমি তাঁকে এইভাবে পরিশ্রম করতে দেখেছি। দেশের এই সংকটময় সময়ে তাঁর মৃত্যু দ্বিগুণভাবে অনুভূত হবে। শ্রীযুক্তা দত্তের প্রতি আমি আমার শোক জানাচ্ছি। তাঁর দুঃখ অগণিত বন্ধু ভাগ করে নেবেন।[১১৬]

## শচীন্দ্রনাথ মিত্র

[১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে শান্তিমিছিল পরিচালনা করার সময় শচীন্দ্রনাথ আক্রান্ত হন এবং ৩রা সেপ্টেম্বর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। গান্ধীজী তখন কলকাতায়। এই মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি শচীন্দ্রনাথের স্ত্রীর কাছে নিচের চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন]

শচীন্দ্রনাথ অমর হয়ে গিয়েছেন। এই ধরনের মৃত্যু দুঃখের কারণ হওয়া উচিত নয়। বরং তা আনন্দেরই কারণ হবে। তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসা তুমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই প্রদর্শন করতে পারবে।[১১৭]

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন

খবর পাওয়া গিয়েছে যে, স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক সপ্তাহের জন্য গুজরাটে অবস্থান করবেন। তাঁকে যদি আমরা শান্তি দিতে পারি এবং তাঁর কাছ থেকে যা আমাদের শেখা উচিত তা যদি শিখে নিতে পারি তবে তাঁর অবস্থান থেকে আমরা লাভবান হতে পারব। তিনি খুব বেশি অনুষ্ঠান পছন্দ করেন না। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। তিনি যেসব সভায় উপস্থিত হবেন সেগুলিতে সম্পূর্ণ শান্তি বজায় থাকা দরকার। জনতার হৈ-হল্লা তিনি অপছন্দ করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বিধিনিষেধগুলি যদি আমরা মেনে চলি তবে তিনি সুরাট এবং ব্রচেও আসতে পারেন। তাঁকে আমরা কীভাবে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেখাতে পারি? তাঁর কাজে অর্থসাহায্য করে। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং তার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতি গভীর ভাবে অনুরক্ত। তাঁর বাবা এই আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেছেন তিনি নিজে। এগুলির ব্যয় তিনি যে দান সংগ্রহ করেন তা থেকে মেটান। এই কাজের জন্য তিনি তাঁর নিজের টাকাও লাগিয়েছেন। গত বছর তিনি যখন মাদ্রাজে গিয়েছিলেন তখন যেখানেই তিনি যান সেখানেই দান সংগ্রহ করেন। আমরা মনে করি যে গুজরাটেও যদি সেই রকম কিছু করা যায় তবে তার দ্বারা একটি কাজ দেখানো হবে। আমরা আশা করি যে, যেখানেই তিনি যাবেন সেখানেই যেন এই কথাটি মনে রাখা হয়।[১১৮]

## শান্তিনিকেতন

মিঃ এণ্ড্রুজ চিঠিতে জানিয়েছেন যে, শান্তিনিকেতনে বাড়িঘর তৈরী হচ্ছে আর সেজন্য টাকার খুবই প্রয়োজন। কবি এখন সেখানে নেই। তাই মিঃ এণ্ড্রুজের উপর সব ভার এসে পড়েছে।

আমার মনে হয় যে কবি যখন গুজরাটে আসেন (এপ্রিল ১৯২০—ভ. প্র. চ.) তখন গুজরাট তার সম্পূর্ণ কর্তব্য পালন করেনি। কোন অতিথিকে জয়ধ্বনি.

দিয়ে অথবা ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা করা নিছক ভদ্রতা। এ হল কর্তব্যের প্রারম্ভ, সমাপ্তি নয়। আমরা যদি কবিকে একজন অসামান্য শক্তিধর বলে মনে করি এবং তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা সত্যসত্যই উপলব্ধি করতে চাই তবে তাঁর কাজে আমাদের সাহায্য করা কর্তব্য।

......কবি মনে মনে যে উদ্দেশ্যের কথা ভেবেছেন তার প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, আমরা যদি চাই যে, তাঁর হাতে জাতির শিক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভার থাকুক, আমাদের যদি ইচ্ছা থাকে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা কবির শিল্পবোধ কিছু লাভ করুক তবে সেই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। কবি নিজেই বলেছেন যে, শান্তিনিকেতন হল তাঁর বিরাম স্থান আর শ্রান্তি বিনোদনের জন্য তিনি তাঁর চারপাশের ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করেন। ছেলেমেয়েদের গুণাবলী ঐ রকম পরিবেশেই সব চেয়ে ভালভাবে বিকশিত হতে পারে। শান্তিনিকেতন হল তাঁর পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি। কবিকে সম্মান করব অথচ তাঁর প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করব না, এ কখনও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ নয়।[১১৯]

## কবির উদ্বেগ

[ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের নীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমর্থন খুঁজে পাননি। 'মডার্ণ রিভিউ'তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি তাঁর মনের শঙ্কার কথা লেখেন। সেই প্রবন্ধের উত্তরে গান্ধীজী নিচের লেখাটি প্রকাশ করেন।* ]

ডঃ ঠাকুরকে লর্ড হার্ডিঞ্জ এশিয়ার কবি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি খুব দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বের কবি হতে চলেছেন, অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি যদি তা হয়ে গিয়ে না থাকেন। ক্রমবর্ধমান সম্মান তাঁর দায়িত্বকেও ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ সেবা হল ভারতবর্ষের বাণীকে কাব্যময় করে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেজন্য কোন মিথ্যা বা দুর্বল বাণী যাতে ভারতবর্ষ তার নামে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে না দেয় তার জন্য কবি আন্তরিক-ভাবে উদ্বিগ্ন। দেশের খ্যাতির প্রতি তিনি স্বভাবতই সতর্ক। তিনি বলেছেন যে, বর্তমান আন্দোলনের সুরে সুর মেলাবার জন্য তিনি নিজের সঙ্গে খুবই বিবাদ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

* রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিশদ বিবরণের জন্য ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পরমবান্ধব রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' বইটি দ্রষ্টব্য।

অসহযোগের চিৎকার ও ব্যস্ততার মধ্যে তিনি তাঁর বীণার কোন সুর খুঁজে পাননি। তিনটি উগ্র চিঠিতে তিনি তাঁর সংশয় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাঁর কল্পনার ভারতবর্ষের পক্ষে অসহযোগ যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ নয়; এটি হল অস্বীকারকরণ ও নৈরাশ্যের মতবাদ। তাঁর ভয় যে, অসহযোগ হল পৃথককরণ, কূপমণ্ডূকতা, সঙ্কীর্ণতা এবং অস্বীকারকরণের মতবাদ।

ভারতবর্ষের সুনাম রক্ষায় কবির এই তীব্র উদ্বেগের জন্য ভারতবাসীর মনে কেবল গর্ববোধই জাগ্রত হতে পারে। ভালই হয়েছে যে তিনি তাঁর সংশয় ভাষার মাধ্যমে—যা একই সঙ্গে সুন্দর ও স্পষ্ট—আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমি কবির সংশয়গুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করব। আমি হয়ত তাঁর এবং যে পাঠক তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করতে ব্যর্থ হব। কিন্তু তাঁকে এবং ভারতবর্ষকে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আদর্শের দিক থেকে অসহযোগের মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্য তিনি ভীত হবেন এবং দেশ অসহযোগকে গ্রহণ করেছে বলে তাঁর লজ্জিত হবারও কোন কারণ নেই। যদি কার্যত প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অন্তিমে এ ব্যর্থ হয়েছে তবে তার দোষ মতবাদের নয়; বরং সেক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য হবে এই যে যারা একে কার্যে রূপায়িত করার দাবি করে তারাই ব্যর্থ হয়েছে। অসহযোগ হয়ত সময়ের আগেই এসে গিয়েছে। সেজন্য ভারতবর্ষকে এবং বিশ্বকে অপেক্ষা করতে হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের কাছে হিংসা এবং অসহযোগ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

কবির এই ভয় করারও দরকার নেই যে, অসহযোগ ভারতবর্ষ ও পশ্চিমের মধ্যে এক চীনের প্রাচীর খাড়া করতে চায়। পক্ষান্তরে, অসহযোগ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকৃত সম্মানজনক এবং স্বেচ্ছায় প্রদত্ত সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করতে চায়। বর্তমান সংগ্রাম বাধ্যতামূলক সহযোগিতা, এক-পক্ষীয় সমবায় এবং সভ্যতার মুখোশ পরে শোষণের আধুনিক পদ্ধতিগুলিকে যেভাবে অস্ত্রের সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে।

অসহযোগ হল অন্যায়ের সঙ্গে অজ্ঞাত ও অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ছাত্রদের সম্পর্কেই কবি বেশি করে উদ্বিগ্ন। তাঁর মত হল অন্য বিদ্যালয় না পাওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বলা উচিত নয়। তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। আক্ষরিক জ্ঞানকে আমি কোন দিনই অন্ধভাবে অনুকরণ করার নীতি বলে মনে করতে পারিনি। আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে এই কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কেবল আক্ষরিক জ্ঞান মানুষকে নৈতিক স্তরে উন্নীত করতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না এবং চরিত্র-গঠনের সঙ্গে আক্ষরিক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সরকারী বিদ্যালয়গুলি আমাদের নির্বীর্য করে দিয়েছে এবং আমাদের অসহায় ও ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন করে দিয়েছে। সেগুলি আমাদের মনকে অসন্তোষে ভরিয়ে দিয়েছে এবং এই অসন্তোষের কোন প্রতিকার উপস্থিত না করায় আমাদের হতাশ করে দিয়েছে। আমরা যা হতে চেয়েছিলাম অর্থাৎ কেরানী আর দোভাষী, সেগুলি আমাদের তাই করে দিয়েছে। গভর্নমেণ্ট তার সম্মান শাসিতদের দৃশ্যত স্বেচ্ছাকৃত সম্মিলনের দ্বারাই সৃষ্টি করে থাকেন। আর আমাদের দাসে পরিণত করার কাজে গভর্নমেণ্টের সহযোগিতা করা যদি আমাদের পক্ষে অন্যায় হয় তবে যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সম্মিলনকে খুবই স্বেচ্ছামূলক বলে মনে হয় সেইসব প্রতিষ্ঠানে আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে বাধ্য। দেশের যুবকেরাই হল তার ভবিষ্যৎ। আমি বিশ্বাস করি যে, যখনই আমরা আবিষ্কার করি যে গভর্নমেণ্টের পদ্ধতি সম্পূর্ণত অথবা প্রধানত অন্যায় তখনই তার সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের যুক্ত করাটা পাপ হয়ে দাঁড়ায়।

ছাত্রদের অধিকাংশ যে উৎসাহের প্রথম জোয়ারের পর আবার বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়েছে সেটি আমি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছি তার অকাট্যতার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি নয়। তাদের এই ফিরে যাওয়া আমাদের অবনতি কতদূর তাই প্রমাণ করে দেয়, আমরা যে পথ গ্রহণ করেছি তার ভ্রম প্রমাণ করে না। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা বেশি ছাত্রকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাদের মধ্যে যারা বেশি শক্তিশালী এবং সত্যসন্ধ তারা জাতীয় বিদ্যালয়ের শরণ না নিয়েই বেরিয়ে এসেছিল এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইভাবে বিদ্যালয় ত্যাগ করে তারা উচ্চ কোটির সেবা করেছে।

তবে কবি যে ছেলেদের বিদ্যালয় ত্যাগ করার আহ্বানের প্রতিবাদ করেছেন সেটি হল তাঁর অসহযোগের মূল নীতির বিরোধিতার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। অভাবাত্মক সব কিছুর প্রতিই তাঁর একটি ভীতি আছে। ধর্মের

নঞর্থক উপদেশগুলির বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত সত্তা বিদ্রোহ করে। তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় লিখিত বিরোধিতা আমাকে এখানে উল্লেখ করতেই হবে। বর্তমান আন্দোলনের স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ আমাকে প্রায়ই বলেন যে, "একটি আদর্শকে গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রত্যাখ্যানের ভাবাবেগ প্রারম্ভে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। যদিও আমি জানি যে, এমনটি ঘটেছে তবু আমি একে সত্য বলে স্বীকার করতে পারি না। ···ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষ্য হল মুক্তি অর্থাৎ বন্ধনমোচন আর বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য হল নির্বাণ অর্থাৎ বিলোপকরণ। মুক্তি ভাবাত্মক বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর নির্বাণ করে সত্যের অভাবাত্মক দিকের প্রতি। সেজন্য তিনি নির্বাণ বা দুঃখের বিষয়কে পরিহার করতে এবং ব্রহ্মবিদ্যা যার লক্ষ্য হল আনন্দ তাকেই গ্রহণ করতে জোর দিয়ে থাকেন।" এই লেখা থেকে এবং অনুরূপ অন্য লেখা থেকে পাঠক কবির মানসিকতার মূল উপলব্ধি করতে পারবেন। আমার বিনীত মত হল এই যে, কোন কিছু গ্রহণ করার মত বর্জন করাও একটি আদর্শ। অসত্যকে বর্জন করা ঠিক তেমনি প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন সত্যকে গ্রহণ করা। সমস্ত ধর্মই শিক্ষা দেয় যে, দুটি বিরোধী শক্তি আমার উপর ক্রিয়া করে থাকে এবং সকল মানবীয় উদ্যম চিরন্তন বর্জন ও গ্রহণের পারম্পর্যের মধ্যে নিহিত।* ভালর সঙ্গে সহযোগিতা করার মত অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ করাও কর্তব্য। আমি এ কথাও সাহসের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে, নির্বাণকে কেবল এক অভাবাত্মক অবস্থা বলে বর্ণনা করে কবি বৌদ্ধধর্মের প্রতি এক অজ্ঞাত অন্যায় করেছেন। দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি অথবা তার বিলোপকরণ আনন্দ ( শাশ্বত সুখ )-এর দিকে নিয়ে যায়। বর্তমান আলোচনা আমি এই কথা বলে শেষ করতে চাই যে, উপনিষদের ( ব্রহ্ম-বিদ্যা ) অন্তিম কথা হল নেতি। উপনিষদের রচয়িতারা ব্রহ্মার যে শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞার্থ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তা হল নেতি।

সুতরাং আমি মনে করি যে, অসহযোগের অভাবাত্মক দিকটির জন্য কবি অহেতুক ভয় পেয়েছেন। 'না' বলার শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

* তুলনায়ঃ "গ্রহণ ও বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের। আমাদের প্রাণের, আমাদের বুদ্ধির, আমাদের সৌন্দর্যবোধের, আমাদের মঙ্গল প্রকৃতির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্মই এই যে, সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয়, সে ত্যাগও করবে। রবীন্দ্রনাথ ( দুঃখ, শান্তিনিকেতন, পৃ ১৭ )।

গভর্নমেন্টকে 'না' বলা রাজদ্রোহিতা এবং প্রায় অপমানজনক ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। কৃষক বীজ বপন করার আগে যেমন আগাছা তুলে ফেলে, সহযোগিতার ইচ্ছাকৃত অস্বীকার হল ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় কাজ। কৃষি-কাজে বীজ বপনের মত আগাছা তুলে ফেলারও প্রয়োজন আছে। বস্তুত, প্রত্যেক কৃষকই জানে যে, এমন কি যখন শস্য দেখা দেয় তখনও আগাছা তুলে ফেলা প্রতিদিনের কাজ। জাতির অসহযোগ হল গভর্নমেন্টকে আপন শর্তে সহযোগিতা করার আমন্ত্রণ—প্রত্যেক জাতির এই রকম আমন্ত্রণ জানাবার অধিকার আছে এবং সেই মত কাজ করা ভাল গভর্নমেন্টের কর্তব্য। অসহযোগ হল জাতির এই বিজ্ঞপ্তি যে, সে আর অভিভাবকের অধীনতায় সন্তুষ্ট নয়। হিংসার অস্বাভাবিক ও অধর্মীয় নীতির পরিবর্তে জাতি অসহযোগের (তার পক্ষে) নির্দোষ, স্বাভাবিক এবং ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করেছে। আর ভারতবর্ষ যদি কোন দিন কবির স্বপ্নের স্বরাজ লাভ করে তবে সে কেবল অহিংস অসহযোগের মাধ্যমেই তা লাভ করবে। তিনি তাঁর শান্তির বাণী জগৎকে দিতে থাকুন এবং এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, ভারতবর্ষ যদি সঙ্কল্পে অটুট থাকে তবে সে তাঁর বাণীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। কবি যে দেশপ্রেমের জন্য উৎসুক অসহযোগ তাকেই প্রকৃত করতে ইচ্ছুক। ইউরোপের পদতলে শায়িত ভারতবর্ষ মানবতার কাছে কোন আশার উদ্রেক করতে পারে না। জাগ্রত ও মুক্ত ভারত আর্ত পৃথিবীর কাছে শান্তি ও সদিচ্ছার বাণী নিয়ে যাবে। অসহযোগ তাকে সেই মঞ্চ দিতে চায় যেখান থেকে সে এই বাণী প্রচার করবে।[১২০]

## মতান্তর মনান্তর নয়

[গান্ধীজী বাংলা ভ্রমণের সময় বরিশালে পৌছালে তাঁর হাতে একটি স্বাক্ষরহীন চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে অসহযোগের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। গান্ধীজী জনসভায় তার উত্তর দেন। পরদিন সেই উত্তরগুলিকে বিকৃত করে তাঁর কাছে উপস্থাপিত করা হয়। তাতে কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল সে সম্পর্কেও বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হয়। একটি লেখায় এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি লেখেন।]

কবির সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল অন্তিমে সেটিকেও বিকৃত করা হয়েছিল। পত্রিকায় কাল্পনিক এবং অসমর্থিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও গোপনতার কিছু ছিল না তবু এই সাক্ষাৎকারকে গোপন বলে গণ্য করা

হয়েছিল। বিবরণটি দেখে মনে হয় যে, আমাদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব কথা আরোপিত হয়েছে অসহযোগীরা সেগুলি বিশ্বাস করতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করবেন। আমাদের মধ্যে মতান্তর আছে। কিন্তু তা কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। আমি নিজের সম্পর্কে যতটা দাবি করি কবিও সেই মতই ভারতবর্ষকে ভালবাসেন। আর সেই ভালবাসাই আমাদের পরস্পরকে বেঁধে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এই সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে তাতে আমি যুক্ত হতে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করব।[১২১]

•

## প্রকাশের পক্ষে অতি পবিত্র

[১৯২২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় 'বম্বে ক্রনিকেল' লিখেছিলেন যে, গান্ধীজী নাকি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন হল কেবল ভৌতিক (মেটিরিয়াল) প্রগতির কেন্দ্র আর তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম হল আধ্যাত্মিক প্রগতির। এর উত্তরে গান্ধীজী নিচের প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।]

এমন জিনিস আছে যা লোকে চায় না যে তা প্রকাশিত হোক। তার কারণ এই নয় যে, তার মধ্যে গোপনীয়তা আছে, বরং তার কারণ হল এই যে, তা প্রকাশের পক্ষে অতি পবিত্র। বিবরণ যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশিত বক্তব্য কখনো কখনো কথিত বাক্যের ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করে থাকে। কোন ছোট শিশুকে যখন আমি খুবই রসিকতার মধ্যে অথবা ভ্রূকুটি করে বন্ধু বলে সম্বোধন করি তখন কেন এবং কিভাবে কথাটি বলা হয়েছে তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা না করে শুধু আমি একজনকে বন্ধু বলে ডেকেছি এই রকম একটি বিবরণ প্রকাশ করা যায় না। সত্যাগ্রহ আশ্রমে যে আলোচনা হয়েছিল বম্বে ক্রনিকেলের ২রা তারিখের সংখ্যায় এই রকম এক বিবরণ প্রকাশ করে বন্ধু রিপোর্টারটি খুবই অনিষ্ট করেছেন। আমি পছন্দ করি না যে, এই জাতীয় জিনিস বিকৃত হোক। দ্রুত আলোচনার সময় অনেক কথা ধরে নিতে হয়। প্রচুর পাদটীকা ছাড়া এই জাতীয় আলোচনার যথার্থ বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিবরণে বলা হয়েছে যে আমি নাকি বলেছি যে, শান্তিনিকেতন হল কেবল ভৌতিক প্রগতির কেন্দ্র আর সত্যাগ্রহ আশ্রম হল আধ্যাত্মিক প্রগতির কেন্দ্র। কবি যখন এই বিবরণটি দেখবেন তখন শান্তিনিকেতন সম্পর্কে এই ধরনের কথা আমি যে বলতে বা মনে করতে পারি তা স্মরণ করে হয় হেসে উঠবেন আর নয়ত শান্তিনিকেতনে আধ্যাত্মিকতা না দেখতে পারার মত আমাকে অসহায়,

অজ্ঞ ও কলা-কৌশলে অনিপুণ দেখে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হবেন। আমি নিশ্চিত যে, যে-কথা আমার উপর আরোপিত হয়েছে তা আমি বিশ্বাস করতে পারি, এ-কথা মনে করে কবি আমার প্রতি অন্যায় করবেন না। কবিকে এ কথা আমি বলতে পারি, আর তা আমি বলেওছি যে, শান্তিনিকেতনে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব আছে। এই কথায় তিনি হেসে উঠেছিলেন এবং এমন কি আমার সমালোচনা মেনেও নিয়েছিলেন। আর এই কথা বলে তিনি এর সমর্থন করেছিলেন যে, তিনি হলেন কবি এবং শান্তিনিকেতন হল তাঁর চিত্ত-বিনোদনের বস্তু। তিনি কেবল নিজে গান গাইতে পারেন এবং অপরকে গান গাওয়াতে পারেন। যে নিয়ম-শৃঙ্খলা আমি পছন্দ করি তার প্রচলন আমি করতে পারি, কিন্তু তিনি যে কেবল কবি। পাঠকদের জেনে রাখা উচিত যে, শান্তিনিকেতনে আমি একাধিকবার বাস করেছি। একে আমার বিশ্রামের আবাস বলে মনে করার মঞ্জুরী আমি পেয়েছি। আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন আমার ছেলেরা এখানে এবং গুরুকুলে আশ্রয় পেয়েছিল। হিন্দী শিক্ষকের সঙ্গে আমার যে বার্তালাপ হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল এই যে, তিনি এবং আমি দুজনেই শান্তিনিকেতনের ভক্ত। প্রকৃত আধ্যাত্মিক কবিতার যিনি স্রষ্টা তিনিই যখন শান্তিনিকেতনের আধিপত্য-বিস্তারী চেতনা তখন তা আধ্যাত্মিক ছাড়া আর কী হতে পারে! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে বাস করেছেন সেই জায়গায় আধ্যাত্মিকতার অভাব থাকতে পারে বলে মনে করার মত মূর্খ আমি নই। ইয়ং ইণ্ডিয়ার পাঠকেরা জানেন যে আমি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন থেকে বড় দাদার প্রেরিত আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করি। তিনি নিরন্তর আমাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন এবং আমার ব্রতের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছেন। পাঠকদের আমি এ-কথা বলতে চাই যে, শান্তিনিকেতনের বহু অধ্যাপক ও শিক্ষককে আমি খুবই আধ্যাত্মিক এবং ভাল লোক বলে মনে করি এবং তাঁদের সাহচর্যকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করি। আমি পাঠকদের আরও জানাতে চাই যে, আমাদের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলাকেই আমি সব চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক বলে মনে করি। আমাদের সমস্ত কথাবার্তা পরিপূর্ণ রসিকতার মধ্যে হয়েছিল; দুঃখের বিষয় সেটিকে বিকৃত করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের ভক্তদের কাছে আমি প্রায়ই শান্তিনিকেতনের অপেক্ষা সত্যাগ্রহ আশ্রমে উচ্চতর আধ্যাত্মিকতা দাবি করে থাকি। কিন্তু এই রকম প্রতিযোগিতা ও দাবি শ্রেষ্ঠত্বের ধারণারূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে না। আমার খুবই ইচ্ছা যে,

সত্যাগ্রহ আশ্রম জনসাধারণের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকুক। আমরা সেখানে এক দল বিনীত ও অশিক্ষিত কর্মী থাকি, আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি, তা আরও জানবার চেষ্টা করছি এবং নিঃসন্দেহে সত্যকে জানতে আমরা ব্যগ্র এবং সেই সত্যের জন্যই বেঁচে থাকতে এবং মৃত্যুবরণ করে নিতে আমরা ইচ্ছুক। সমপ্রকৃতির কিন্তু অভিন্ন নয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তুলনা করা যায় না। কিন্তু তা যদি করতেই হয় তবে সত্যাগ্রহ আশ্রমের দ্রুত উন্নতি ও নিয়মানুবর্তিতা সত্ত্বেও আমি যথার্থভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের পক্ষে ভোট দেব। বয়সে এ অনেক বড় আর আমি জানি জ্ঞানেও এ বড়। তবে সেখানে একটি 'কিন্তু' আছে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকেরা এই দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সাবধান হন, কেননা গুজরাটের ছোট জায়গাটিও দৌড়াচ্ছে।

সংস্কার-সাধনের দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে এত কথা বলার পর সেদিন সকালের আলোচনার সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থিত করার সময় অথবা স্থান আর নেই। আর তা আমি করতে চাইও না। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এটি উত্থিত হয়েছে। সেই শক্তিতে তার বিবরণ আমি উপস্থাপিত করতে পারি না। একজন বোন একটি বাক্যে সে কথা বলেছেন বলে আমি শুনেছি। তাঁর কথা খুবই সত্য। আমার ইচ্ছা যে, এই অজ্ঞাত রিপোর্টারটি যেন তা বিকৃত করার চিন্তা না করেন। বিবরণটি শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করেনি।[১২২]

## কবি এবং চরখা

[ রবীন্দ্রনাথ চরখা সমর্থন করতেন না বলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার তাঁর সমালোচনা করেন। তার উত্তরে 'চরখা' এই নামে রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই প্রবন্ধের প্রতি গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিচের লেখাটি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তর। ]

কিছুদিন আগে স্যার রবীন্দ্রনাথ কৃত চরখার সমালোচনাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন কয়েকজন বন্ধু আমাকে তার উত্তর দিতে বলেন। বিশেষ ব্যস্ত থাকায় তখন আমি এটি সম্পূর্ণ পড়তে পারিনি। তবে তার প্রকৃতি বোঝার মত যথেষ্ট আমি পড়ে নিয়েছিলাম। উত্তর দেবার কোন তাড়া আমার ছিল না। যাঁরা এটি পড়েছিলেন তাঁরা তখন এত বেশি উত্তেজিত অথবা প্রভাবিত ছিলেন যে, আমার সময় থাকলে আমি যদি তখন কিছু লিখতাম তবে তাঁরা সেটি উপলব্ধি করতে পারতেন না। সুতরাং আমার পক্ষে এখনই কিছু লেখার

ঠিক সময় হয়েছে ; যাতে কবির সমালোচনা এবং আমার উত্তর (অবশ্য এই ভাবে যদি তাকে অভিহিত করা যায়) একটি আবেগহীন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

সমালোচনাটি হল চরখা সম্পর্কে কবি এবং আচার্য শীলের মতের জন্য আচার্য রায়ের যে অসহিষ্ণুতা তার তীব্র ভর্ৎসনা আর চরখার প্রতি আমার অনন্য ও অত্যধিক ভালবাসার জন্য আমার প্রতি মৃদু তিরস্কার। জনসাধারণ এ কথা জেনে রাখুন যে কবি চরখার মহান অর্থনৈতিক মূল্য অস্বীকার করেন না। তাঁরা জেনে রাখুন যে, কবি তাঁর সমালোচনা লেখার পর অখিল ভারত দেশবন্ধু স্মারকের আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন। আবেদনটি তিনি পড়ে সই করেছেন এবং এমন কি এটি সই করার সময় এ খবরও তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন যে, চরখা সম্পর্কে তিনি এমন কিছু লিখেছেন যা আমাকে খুশী করবে না। সুতরাং কী আসছে তা আমি জানতাম। কিন্তু এই লেখা আমাকে অসন্তুষ্ট করেনি। কেবল মতের অমিল আমাকে ক্ষুণ্ণ করবে কেন? প্রত্যেক মতানৈক্যই যদি অসন্তোষ সৃষ্টি করে তবে যেহেতু দুজন মানুষ সমস্ত বিষয়ে ঠিক একমত হতে পারে না সেই হেতু জীবন অপ্রীতিকর ভাবাবেগের সমষ্টি হয়ে উঠবে। আর সেজন্য জীবন হবে এক সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা। পক্ষান্তরে স্পষ্ট সমালোচনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। কেননা আমাদের মতানৈক্য আমাদের বন্ধুত্বকে আরও মূলবান করে দিয়েছে। প্রকৃত বন্ধু হতে হলে সকল বিষয়ে একমত হবার দরকার করে না। কেবল মতানৈক্যের মধ্যে যেন কোন রকম ঝাঁজ না থাকে, তিক্ততা যেন একেবারেই না থাকে। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি যে, কবির সমালোচনার মধ্যে সে রকম কিছু নেই।

ভূমিকায় এই মন্তব্য আমি এইজন্য করলাম যে, কানাঘুষায় একটি বিশ্রী গুজব প্রচারিত হচ্ছে যে ঐ সমালোচনার মূলে রয়েছে ঈর্ষা। এই রকম ভিত্তিহীন সন্দেহ দুর্বলতা ও অসহিষ্ণুতার পরিবেশে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক সমর্পণ করে দেয়। সামান্য চিন্তাও এই প্রকার নিষ্ঠুর আঘাতের কারণ দূর করে দেবে। কবি কোন্ বিষয়ে আমাকে ঈর্ষা করবেন? প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা অনুমান করে হিংসা জাগ্রত হয়। কিন্তু আমি আমার জীবনে কবিতার একটি চরণও লিখিনি। আমার মধ্যে কবির কোন গুণ নেই। তাঁর মহানতা আমি আকাঙ্ক্ষা করতে পারি না। নিঃসন্দেহে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি। পৃথিবীতে তাঁর সমতুল্য কোন কবি আজ নেই। কবির সন্দেহাতীত পদমর্যাদার সঙ্গে আমার

'মহাত্মা'র কোন সম্পর্ক নেই। এখন একথা বোঝার সময় এসেছে যে, আমাদের কাজের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন -কোথাও তাদের আড়াআড়ি নেই। কবি তাঁর নিজের সৃষ্ট মহান জগতে, তাঁর ভাবনার জগতে বাস করেন। আমি আর একজনের সৃষ্ট চরখার দাস মাত্র। কবি তাঁর বাঁশির সুরে গোপীদের নৃত্য করান। আমি আমার প্রিয় চরখারূপী সীতার পিছনে ঘুরে বেড়াই এবং জাপান, ম্যাঞ্চেস্টার, প্যারিস প্রভৃতি থেকে আগত দশানন দৈত্যের হাত থেকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করি। কবি একজন আবিষ্কারক—তিনি সৃষ্টি করেন, ভেঙে ফেলেন আবার গড়ে তোলেন। আমি একজন অনুসন্ধানী এবং কিছু আবিষ্কার করলে তাতেই লেগে থাকি। কবি প্রতিদিন পৃথিবীকে নতুন ও আকর্ষণীয় বস্তু উপহার দেন। আমি কেবল পুরাতন, এমন কি জীর্ণ বস্তুগুলির গুপ্ত সম্ভাবনাই দেখাতে পারি। যে ম্যাজিসিয়ান নতুন ও খত্যুজ্জ্বল জিনিস সৃষ্টি করতে পারে পৃথিবী সহজেই তার জন্য সম্মানজনক স্থান করে দেয়। আমার জীর্ণ জিনিসের জন্য এক কোণে একটু স্থান করে নিতে আমাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নেই। কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমি বলতে পারি যে আমাদের কাজ পরস্পরের পরিপূরক।

আসল কথা, কবির সমালোচনা হল কবিজনোচিত ছাড়-পত্র এবং যিনি এটিকে অক্ষরস গ্রহণ করবেন তিনি নিজেকে একটি বিশ্রী অবস্থার মধ্যে ফেলে দেবার ঝুঁকি নেবেন। একজন প্রাচীন কবি বলেছিলেন যে, সকল ভূষণে সজ্জিত হলেও সলোমন বাগানের লিলি ফুলের মত নন। তিনি স্বভাবতই লিলি ফুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পবিত্রতার উল্লেখ করেছিলেন যার সঙ্গে সলোমনের কৃত্রিম ভূষণ ও বহু ভাল কাজ সত্ত্বেও তাঁর যে পাপাচার তার তুলনা হয় না। অথবা কবিজনোচিত এই ছাড়-পত্রটি লক্ষ্য করুন "স্বর্গরাজ্যে একজন ধনীর প্রবেশ অপেক্ষা একটি সূচের গর্তের ভিতর দিয়ে একটি উটের প্রবেশ সহজতর।" আমরা জানি যে, কোন উট সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেনি, কিন্তু জনক রাজার মত ধনী লোক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অথবা ডালিমের দানার সঙ্গে মানুষের সুন্দর দাঁতের হাসির যে তুলনা করা হয় তার কথা ভাবুন। কবিজনোচিত অতিরঞ্জনকে যে মেয়েরা অক্ষরস গ্রহণ করেছিল তারা তাদের দাঁতকে বিকৃত এবং এমন কি ক্ষতি করেছিল। শিল্পী এবং কবিরা যথার্থ পারম্পর্য বর্ণনার জন্য অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করে

থাকেন। সুতরাং কবিকৃত চরখার দোষারোপ যাঁরা অক্ষরশ গ্রহণ করবেন তাঁরা কবির প্রতি অন্যায় করবেন এবং নিজেদের ক্ষতি করবেন।

কবি ইয়ং ইণ্ডিয়া পড়েন না, তিনি তা পড়বেন এমন প্রত্যাশাও কেউ করে না, আর তাঁর পড়বার প্রয়োজনও নেই। এদিক-ওদিকের কথাবার্তা থেকে আন্দোলন সম্পর্কে তিনি যা জানার তা জেনেছেন। সুতরাং চরখার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে যা তাঁর ধারণা তারই তিনি নিন্দা করেছেন।

সেইজন্য তিনি ভেবেছেন যে, আমি চাই সকলে তাদের সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সমস্ত সময় সুতা কাটুক। অর্থাৎ আমি চাই যে, কবি তাঁর অনুধ্যান ত্যাগ করুন, চাষী তার লাঙ্গল ফেলে দিক, আইনজীবী তাঁর মোকদ্দমা এবং ডাক্তার তাঁর শল্য-চিকিৎসার অস্ত্র সরিয়ে রাখুন। কিন্তু সত্য কথা হল যে, আমি কাউকে তার কাজ পরিত্যাগ করতে বলিনি। বরং এই কথা বলেছি যে, তাঁরা সমগ্র জাতির জন্য আত্মত্যাগের প্রতীকরূপে প্রতিদিন মাত্র ত্রিশ মিনিট করে সুতা কেটে তাঁদের নিজেদের কাজকে ভূষিত করুন। অবশ্য যেসব অনশনক্লিষ্ট পুরুষ অথবা নারী যে-কোন কাজের অভাবে অলস তাদের আমি জীবিকার জন্য সুতা কাটতে বলেছি এবং অর্ধ অনশনে যেসব কৃষক রয়েছে তাদের বলেছি অবসর সময়ে সুতা কেটে পরিপূরক উপার্জনের ব্যবস্থা করতে। কবি যদি দিনে আধ ঘণ্টা করে সুতা কাটেন তবে তাঁর কবিতা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কেননা তাহলে তাঁর কবিতা এখনকার চেয়ে স্পষ্টতররূপে দরিদ্রের প্রয়োজন ও দুঃখের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।*

---

* তুলনীয়: চাষি খেতে চালাইতেছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজে উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।—রবীন্দ্রনাথ
(জন্মদিনে—২১।১।৪১)

কবি মনে করেন যে, চরখা জাতির কাছে মৃত্যুর মত শীতলতা বহন করে নিয়ে আসবে আর তাই একে তিনি পরিহার করতে চান। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, অযুত ভারতবাসীর মধ্যে যে অত্যাবশ্যক এবং জীবন্ত একত্ব রয়েছে চরখা তাকেই উপলব্ধি করতে চায়। জাঁকজমকশালী এবং বহু আকৃতির ও বর্ণের বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি প্রকৃতির উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় এবং আকারের মধ্যে একটি ঐক্য লক্ষ্য করেন তিনিও নির্ভুল। যে কোন দুটি লোক এক রকম হয় না, এমন কি যমজেরাও এক রকম নয়, তবু এমন অনেক জিনিস আছে যা সকল মানুষের পক্ষে অপরিহার্যরূপে সমান। আর আকারের এই সমানত্বের পিছনে রয়েছে একই জীবন যা সর্বব্যাপী। ......আমাদের যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে আমরা যেমন শ্বাস নেবার জন্য ইংলণ্ড থেকে বাতাস আমদানি করতে পারি না, এমন কি খাদ্যদ্রব্যও আমদানি করতে পারি না, তেমনি ইংলণ্ড থেকে কাপড়ও যেন আমরা আমদানি না করি। এই নীতিকে যুক্তির শেষ সীমায় টেনে নিয়ে যেতে এবং এই কথা বলতে আমার মোটেই দ্বিধা নেই যে, বাংলা দেশ যেন বোম্বাই থেকে অথবা বঙ্গলক্ষ্মী থেকে তার কাপড় আমদানি না করে। বাংলা দেশ যদি ভারতবর্ষকে অথবা বহির্বিশ্বকে শোষণ না করে স্বাভাবিক ও মুক্ত জীবন যাপন করতে চায় তবে সে যেমন তার খাদ্যশস্য গ্রামে গ্রামে উৎপাদন করে নেয় তেমনিভাবে কাপড়ও তাকে প্রতি গ্রামে উৎপাদন করে নিতে হবে। যন্ত্রের একটি নিজস্ব স্থান আছে, এ থাকবে বলেই এসেছে। কিন্তু একে প্রয়োজনীয় মানব-শ্রমকে স্থানচ্যুত করতে দেওয়া হবে না। উন্নত ধরনের লাঙ্গল ভাল জিনিস। কিন্তু দৈবাৎ কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কোন একজন মানুষ যদি ভারতবর্ষের সমস্ত জমি চাষ করে এবং সমস্ত কৃষি-উৎপাদনের উপর আপন কর্তৃত্ব বজায় রাখে, তবে অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ কোন কাজ না পেয়ে অনশনে থাকবে অলস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা নির্বোধ ব্যক্তিতে পরিণত হবে এবং অনেকে অলোভনীয় অবস্থায় পতিত হবে। কুটির-শিল্পের প্রতিটি উন্নতিকে আমি স্বাগত করি। কিন্তু আমি জানি যে, লক্ষ লক্ষ কৃষকের ঘরে কোন কাজ না দিয়ে বিদ্যুৎ-চালিত ঢেঁকোর দ্বারা মানুষের শ্রমকে স্থানচ্যুত করা অপরাধ। .....

কবির প্রত্যেক যুক্তির বিশদ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মত-পার্থক্য যেখানে মৌলিক নয়—এই কথা দেখাতে আমি চেষ্টা করেছি—সেখানে কবির যুক্তিতে এমন কিছু নেই যাকে সমর্থন করেও আমি চরখা

সম্পর্কে আমার মত বজায় রাখতে পারি। চরখা সম্পর্কে যেসব বিদ্রূপ তিনি করেছেন সেই সব কথা আমি কখনও বলিনি। কবির সুসজ্জিত শস্ত্র সত্ত্বেও চরখার যেসব গুণাবলী আমি দাবি করি তা অক্ষত রয়ে গিয়েছে।

একটি জিনিস, কেবল একটি জিনিসই আমাকে আঘাত করেছে তা হল কবি শোনা কথায় বিশ্বাস করেছেন যে আমি রামমোহন রায়কে 'বামন' বলেছি।* কিন্তু এই বিরাট সংস্কারককে আমি কখন কোথাও বামন বলিনি, তাঁকে সেই রকম মনে করা তো দূরের কথা, কবির কাছে যেমন, আমার কাছেও তেমনি তিনি বিরাট পুরুষ। একবার ছাড়া আর কখনও রামমোহন রায়ের নাম আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। তা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসঙ্গে। চার বছর আগে কটকের বেলাভূমিতে এটি হয়েছিল। সেদিন যা আমি বলেছিলাম বলে আজ আমার মনে পড়ে তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষা ছাড়াও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি লাভ করা সম্ভব। এবং একজন যখন রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বলেছিলাম যে, উপনিষদের অজ্ঞাত প্রণেতাদের তুলনায় তিনি একজন বামন ছিলেন। এই কথা অবশ্যই রামমোহন রায়কে একজন বামনরূপে দেখা বোঝায় না। আমি যদি বলি যে, মিলটন অথবা সেক্সপীয়রের তুলনায় টেনিশন হলেন বামন তবে তাতে তাঁকে ছোট করে দেখা হয় না। এতে উভয়েরই মহত্ত্ব উন্নীত করা হয় বলে আমি মনে করি। আমি যদি কবিকে ভক্তি করি, আর তিনি জানেন যে, আমাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও আমি তাঁকে ভক্তি করি, তবে যিনি বাংলার বিরাট সংস্কার আন্দোলন সম্ভবপর করে তুলেছিলেন এবং যে সংস্কারের ফল হলেন কবি নিজে, তবে তাঁর মহত্ত্বকে আমি ছোট করতে পারি না।[২৩]

অভয় আশ্রমে কবি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি নিজেই তাঁর শারীরিক দুর্বলতার কথা বলেছিলেন। তবু কুমিল্লার অভয় আশ্রমের ম্যানেজার ডঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ডঃ ঠাকুরকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে ভালই করেছেন। পাঠকেরা জানেন যে, খদ্দরের বিকাশের জন্য অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কবি যে এখানকার অভিনন্দন-পত্র এবং এঁদের সঙ্গ গ্রহণ করেছিলেন—যাতে তাঁর খদ্দর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়—তা কবি যে সকল অবস্থাতেই চরখা ও খদ্দর আন্দোলনের

* পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য

বিরোধী এই ধারণা দূর করে দেয়—অবশ্য এর প্রয়োজন যদি কিছু থেকে থাকে।

'সারভেন্টে' তাঁর বক্তৃতার যে চুম্বক প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমি দেখেছি যে, এই আন্দোলনের নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে :

"ঘটনাচক্রে একটি দেশে জন্মেছে বলেই সে দেশ তার নিজের হয়ে যায় না, জীবনের অবদানের দ্বারাই দেশকে নিজের করে নিতে হয়। পশুর গায়ে লোম আছে; কিন্তু মানুষকে সুতা কাটতে এবং কাপড় বুনে নিতে হবে, কেননা পশু চিরকালের জন্য একবারই এবং রেডিমেড জিনিস পেয়ে থাকে। মানুষ তার সামনে যে বস্তু থাকে তা থেকে নতুন করে জিনিস গড়ে তোলে।"

কিন্তু কবি তাঁর বক্তৃতায় আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিলেন যা স্বরাজের কর্মীদের সাহায্য করবে। তিনি আমাদের বলেছিলেন :

"ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্তা যে এতদিন আমাদের বুঝতে দেওয়া হয়নি তার কারণ হল এই যে, প্রতিদিনের প্রচেষ্টায় আমরা ধীরে ধীরে তাকে সুস্থ ও সার্থক করে তুলিনি।"

এইভাবে স্বরাজ অর্জনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে যে প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজ করতে হবে তার কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। ঠিক পরের বাক্যেই তিনি আমাদের বলেছেন, "বাইরের কোন ঘটনার ফলে স্বরাজ আমরা পেয়ে যাব এই রকম স্বপ্ন যেন আমরা লালন না করি" কবি বলেছেন, "আমাদের চেতনাকে সমগ্র দেশে যে পরিমাণ আমরা সেবাময় করতে পারব স্বরাজ সেই পরিমাণ আমরা লাভ করব।"

কিভাবে একতা লাভ করা যাবে সে কথাও তিনি আমাদের বলেছেন। "কেবল কাজের মাধ্যমেই আমরা একতা লাভ করতে পারি।" অভয় আশ্রমের কর্মীরা তো সেই কাজই করছেন। কেননা সুতা কাটার মাধ্যমে তাঁরা হিন্দু, মুসলমান—প্রকৃতপক্ষে এইভাবে যারাই সাহায্য চায় তাদের সকলকেই তাঁরা সহায়তা প্রদান করছেন। তাঁরা তাঁদের বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্য ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন এবং তাদের সেখানে সুতাকাটার শিক্ষাও দিচ্ছেন। তাঁদের ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই তাঁরা সাহায্য করছেন। একতার উপদেশ দেবার তাঁদের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা তাঁদের জীবনে তা অনুসরণ করছেন। এই কাজ কবিকে উৎসাহিত করেছে আর তাই তিনি বলেছেন :

"জীবন হল জৈব বস্তু। আসলে আত্মাই সব কিছু করে থাকে। একথা ঠিক নয় যে, আমাদের দেহে শক্তির অভাব আছে। আসল কথা হল আমাদের মন জাগ্রত হয়নি।..... সুতরাং এখানে আমাদের মানসিক জড়তার সঙ্গেই প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হবে। গ্রামগুলি হল জীবন্ত সত্তা। জীবনের একটি অঙ্গকে অবহেলা করলে অন্য অঙ্গ আঘাত পাবেই। আমাদের আজ উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের দেশের আত্মা একটি বিরাট অবিভাজ্য বস্তু আর তাই আমাদের সকল দুর্বলতা ও দুঃখ সেই বিরাট সত্তার সঙ্গে পরস্পর সম্পৃক্ত।"

আমাদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে কবি ঠিকই বলেছেন :

"মানুষের সৃষ্টি সেই পরিমাণ সুন্দর হয় যে পরিমাণ সে নিজেকে তার কাজের মধ্যে বিলীন করতে পারে। এই দেশে আমাদের প্রচেষ্টাগুলি যে প্রায়ই ব্যর্থ হয় তার কারণ হল এই যে, আমরা আমাদের প্রিয় কাজগুলিতেও আমাদের ব্যক্তি-সত্তার মাত্র একাংশ দিয়ে থাকি। আমরা ডান হাতে দিই আর বাম হাতে টেনে নিই।"[১২৪]

## কবির আশীর্বাদ

শান্তিনিকেতনের চারণ মহাদেব দেশাইকে তার 'বরদোলীর কাহিনী' সম্পর্কে লিখেছেন।

"আমি তোমার বরদোলীর কাহিনী পড়া শেষ করেছি। স্বেচ্ছাচারী শক্তির বিরুদ্ধে নৈতিক অধিকারের বিজয়-কাহিনী, চারিত্র্যে ধর্মসম্মত এবং আধুনিক যুগে অভিনব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যা লাভ করা গিয়েছে তার যে বর্ণনা তুমি দিয়েছ তার মধ্যে মহাকাব্যের স্পর্শ রয়েছে। আমি তোমাকে, সংগ্রামের নেতা ও যোদ্ধাদের এবং তোমাদের মহান পরিচালককে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার আশীর্বাদ নিও।"

কবি আমাদের সকলের উপর যে আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন আমরা যেন অত্যন্ত নম্রতার সঙ্গে তা গ্রহণ করতে পারি এবং যে কাজ আমাদের সামনে রয়েছে তার যেন আমরা যোগ্য হতে পারি। কেননা কোন কাজ সম্পাদনের জন্য যদি কোন মহান ব্যক্তির কাছ থেকে আশীর্বচন উচ্চারিত হয়ে থাকে তবে তা আরও বিরাট কিছু করার সম্ভাবনাও বহন করে আনে।[১২৫]

## সম্বর্ধনার উত্তর

[ ১৯৪০ সালে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলে অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত থেকে গান্ধীজীকে আম্রকুঞ্জে স্বাগত জানান। তার উত্তরে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি বলেছিলেন। ]

এখানে আসার পর থেকে দীনবন্ধুর কথাই আমার অনুভূতিতে প্রবল হয়ে আছে। আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, গতকাল ট্রেন থেকে নেমে সর্বপ্রথম হাসপাতালে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। গুরুদেব হলেন বিশ্বকবি। কিন্তু দীনবন্ধুর মধ্যেও কবির সত্তা ও মেজাজ আছে। আজকের এই উপলক্ষে উপস্থিত থেকে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যেকটি কথা, চলাফেরা এবং অঙ্গভঙ্গী পান করার জন্য এবং স্মৃতির ভাণ্ডারে গ্রহণ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তিনি উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য রকম। এখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় রয়েছেন এবং ভালভাবে কথা বলতেও পারছেন না। আমি চাই যে, আমার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে আপনারা সকলে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি দীনবন্ধুকে তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন। আর যা কিছু ঘটুক, তিনি যেন তাঁর আত্মাকে শান্তি দেন।

আমি এখানে বিদেশীরূপে অথবা অতিথি হিসাবে আসিনি। আমার কাছে শান্তিনিকেতন ঘরের চেয়েও বড়। ১৯১৪ সালে ইংলণ্ড থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের আগে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ আমার পরিবারের লোকেরা এখানে আন্তরিক আতিথেয়তা লাভ করেছিল এবং আমিও এখানে প্রায় এক মাস আশ্রয় পেয়েছিলাম। আমার সামনে আপনাদের যখন আমি সমবেত দেখছি তখন সেই সব দিনের স্মৃতিগুলি আমার মনে ভিড় করে আসছে। আমার দুঃখ যে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি এখানে বেশিদিন থাকতে পারব না। এটি হল কর্তব্যের প্রশ্ন। কিছুদিন আগে এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে আমি শান্তিনিকেতন ও মালিকান্দা যাত্রাকে তীর্থযাত্রা বলে বর্ণনা করেছি। এবারে শান্তিনিকেতন আমার কাছে সত্যই শান্তির নিকেতন বলে সিদ্ধ হয়েছে। রাজনীতির সমস্ত উদ্বেগ ও বোঝা ফেলে রেখে শুধু গুরুদেবের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের জন্যই আমি এখানে এসেছি। আমি প্রায়ই নিজেকে একজন সিদ্ধ ভিক্ষুক বলে দাবি করে থাকি। কিন্তু আমার ভিক্ষার ঝুলিতে আজ গুরুদেবের যে আশীর্বাদ পেলাম তার চেয়ে মূল্যবান কোন জিনিস আমি কখনও পাইনি। আমি জানি যে, সব সময়েই আমার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ আছে। কিন্তু আজ আমার বড়ই

সৌভাগ্য যে, আমি সামনে থেকে তাঁর কাছ হতে তা লাভ করেছি। আর তাই আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে।[১২৬]

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতনে আসা আমার কাছে তীর্থযাত্রার মত। অনেক দিন থেকে সেখানে আমার যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেবল মালিকান্দা যাবার পথেই সেই সুযোগ এসেছে। শান্তিনিকেতন আমার কাছে নতুন নয়। যখন সে রূপ পরিগ্রহ করছিল সেই ১৯১৫ সালে সেখানে আমি প্রথম যাই—অবশ্য আজও যে তার বিকাশ হচ্ছে না তা নয়। গুরুদেব নিজেই বিকশিত হচ্ছেন। বৃদ্ধ বয়স তাঁর মনের স্থিতিস্থাপকতার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। সুতরাং যতক্ষণ গুরুদেবের চেতনা তা দিতে থাকবে ততক্ষণ শান্তিনিকেতনের বিকাশ বন্ধ হবে না। শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকের মধ্যে এবং প্রতিটি জিনিসের মধ্যে তিনি বিরাজিত। সকলে তাঁকে যে গভীর শ্রদ্ধা করে তা খুবই উচ্চমানের, কেননা তা স্বতঃপ্রবৃত্ত। এটি আমাকেও উন্নত করেছে। কৃতজ্ঞ ছাত্র ও শিক্ষকেরা তাঁকে যে উপাধি দিয়েছে তাতে শান্তিনিকেতনে তিনি যে অধিকার বিস্তার করে আছেন তা সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই জায়গার মধ্যে এবং এখানকার জনসমূহের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন বলেই তিনি সেখানে এই রকম অধিকার বিস্তার করতে পেরেছেন। আমি দেখেছি যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি বিশ্বভারতীর জন্য বেঁচে আছেন। তিনি এর উন্নতি চান এবং এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে ইচ্ছা করেন। এ সম্পর্কে তিনি আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটি তাঁর কাছে পর্যাপ্ত ছিল না। তাই যখন আমরা বিদায় নিচ্ছিলাম তখন তিনি এই মহামূল্য পত্রটি আমার হাতে দেন :

"প্রিয় মহাত্মাজি,

আজ সকালে আপনি বিশ্বভারতীতে আমাদের কাজকর্ম মোটামুটিভাবে দেখেছেন। এর গুণাবলী সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হয়েছে তা আমি জানি না। আপনি জানেন যে, প্রত্যক্ষ আকৃতিতে এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় হলেও আত্মিক দৃষ্টিতে এ আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশ্বভারতী তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যমে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আতিথেয়তা পরিবেশন করছে।

এক সঙ্কটময় অবস্থায় আপনি একে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার হাত থেকে

বাঁচিয়েছিলেন এবং একে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। এই বন্ধুকৃত্যের জন্য আপনি আমাদের চিরদিনের ধন্যবাদ'ই।

আর এখন শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার আগে আমি আপনাকে সাগ্রহে আবেদন জানাচ্ছি। প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি আপনার রক্ষণাধীনে গ্রহণ করুন। আর আপনি যদি একে জাতী সম্পদ বলে বিবেচনা করেন তবে একে· স্থায়িত্বের আশ্বাস দিন। বিশ্বভারতী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বহনকারী একটি জাহাজের মত এবং আমি আশা করি যে, একে রক্ষা করার জন্য দেশ-বাস'র কাছ থেকে বিশেষ যত্ন এ দাবি করতে পারে।"

এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষণাধীনে গ্রহণ করার আমি কে? এ ভগবদ্ রক্ষা বহন করছে। কেননা এটি এক আগ্রহশীল হৃদয়ের সৃষ্টি। এ লোক দেখানো জিনিস নয়। গুরুদেব নিজে আন্তর্জাতিক মানুষ, কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানুষও তাই তাঁর সব সৃষ্টিই বিশ্বজন"ন আর বিশ্বভারতী সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এর আর্থিক সমস্যার উদ্বেগ থেকে গুরুদেবকে মুক্ত করা উচিত। তাঁর মর্মস্পর্শী আবেদনের উত্তরে আমি তাঁকে আমার সাধ্যমত সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এই লেখাটি সেই প্রচেষ্টার প্রারম্ভ।[১২৭]

[দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের স্মৃতি তহবিলের জন্য অন্যান্য সহ রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর স্বাক্ষরিত একটি আবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র এক লক্ষ টাকা ওঠার আগেই রবীন্দ্রনাথ গত হন। টাকা অল্প ওঠার জন্য গান্ধীজী বিরক্ত বোধ করছিলেন। এই উদ্দেশ্যে গান্ধীজী বোম্বাই-তে গেলে দাতারা টাকা তোলার এই উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁদের অনীহা প্রকাশ করেন এবং গান্ধীজীকে বলেন যে, তিনি বাজে জিনিসকে সমর্থন করছেন। তাঁদের এই ভুল ধারণা সংশোধনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি বলেন।]

আমি যখন বলি যে, শান্তিনিকেতন বাঙ্গালোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, টাটা যাতে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন তার চেয়েও বেশি সাহায্য পাবার যোগ্য তখন আমি একটুও অতিরঞ্জন করি না। আমি জানি না যে ভারতবর্ষের বাইরে আর কেউ এই রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নাম জানে কিনা! কিন্তু যেখানেই লোকেরা কবির নাম জানে সেখানেই শান্তিনিকেতন পরিচিত এবং এই প্রতিষ্ঠানে কবিকে তাঁর মহৎ কবিতা লেখায় প্রেরণা যুগিয়েছে—এইভাবেই তাঁরা একে জানেন। কবি একে তাঁর খেলার সামগ্রী বলে অভিহিত করতেন, কিন্তু এই খেলনা না থাকলে তাঁর কবিতা অনুর্বর হয়ে যেত। শান্তিনিকেতনের

শিল্প ও সংস্কৃতির বিদ্যালয় বহু দূর দূর থেকে ছাত্রদের আকৃষ্ট করে থাকে এবং এই বিদ্যালয়গুলি অনেক শিল্পী, কবি এবং পণ্ডিত সৃষ্ট করেছে। ক্ষিতিবাবুর মত পণ্ডিত এবং নন্দবাবুর মত শিল্পীরা এই প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত নম্রতার সঙ্গে সেবা করেন - স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এবং ভারতবর্ষে এই জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান এত অল্প অর্থে পরিচালিত হয় না।

যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিন কবির প্রতি আমাদের অনুরাগ অটুট থাকবে। কিন্তু শান্তিনকেতনের প্রতি আমাদের সেই অনুরাগ কত দিন বজায় থাকবে ? এ কত দিন বেঁচে থাকবে ?

এই প্রতিষ্ঠান কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং কবিও তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। আর আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চত থাকতে পারেন যে, সেখানে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা তাঁদের সারাজীবন এর সেবায় নিয়োগ করবেন। শান্তিনিকেতন হল একটি রোমান্স। কবির পিতার শান্তি ও সংস্কৃতির একটি নিকেতন প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ ছিল তা থেকে এর সৃষ্টি। খুবই দুঃখের কথা যে অর্থবান লোক যাঁরা শান্তিনিকেতন থেকে এত কিছু পেয়েছেন তাঁরা এর সম্পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করতে পারেন না। কবি হলেন ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের চিরদিনের সম্পদ। আর এই অর্থবান লোকেদের কর্তব্য হল তাঁর প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।[১২৮]

[ ১৯৪৬ সালের ৮ই মে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার মঞ্চের উপর কবির একটি প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল। প্রার্থনান্তিক ভাষণে ছবিটির প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গান্ধীজী প্রসঙ্গত নিচের কথাগুলি বলেন। ]

গুরুদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যে প্রভা তাঁর ভিতরে ছিল তা পৃথিবীতে যতদিন জীবন থাকবে ততদিন বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। কিন্তু সূর্যের আলো যেমন দেহের জন্য তেমনি তিনি যে আলো দিয়েছেন তা হল আত্মার জন্য। গুরুদেব ছিলেন কবি এবং প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক জ্যোতিষ্ক। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় লিখেছেন এবং সমস্ত বাংলা তাঁর কবিতার প্রস্রবণ থেকে আকণ্ঠ পান করতে পারে। বহু ভাষায় তাঁর লেখার অনুবাদ রয়েছে। ইংরেজীতেও তিনি খুব বড় লেখক ছিলেন, আর বোধ হয় তিনি নিজেও তা জানতেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের

ডিগ্রি তাঁর ছিল না, এই গর্ব তিনি করতে পারতেন। তিনি ছিলেন ঠিক গুরুদেব। একবার ভাইসরয় তাঁকে এশিয়ার কবি বলে অভিহিত করেছিলেন। এই উপাধি তাঁর আগে কেউ পায়নি। তিনি ছিলেন বিশ্বকবি, তাছাড়াও তিনি ছিলেন ঋষি। গুরুদেব আমাদের কাছে তাঁর গীতাঞ্জলি রেখে গিয়েছেন। এর কবতাগুলি তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত করেছিল। মহান তুলসদাস তাঁর অমর রামায়ণ আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন। সুপরিচিত ব্যাসদেব আমাদের মানব জাতির ইতিহাস দিয়েছেন। তাঁরা কেবল কবি ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন শিক্ষক। গুরুদেবও কেবল কবি রূপে লেখেননি, তিনি লিখেছিলেন ঋষিরূপে। অবশ্য কেবল লেখাই তাঁর একমাত্র অবদান নয়। শিল্পের মধ্যে মিষ্টতা ও পবিত্রতার যে সূক্ষ্মতম বোধ রয়েছে সেই সব অর্থে তিনি ছিলেন শিল্পী, নর্তক এবং গায়ক। তাঁর সৃজনী-প্রতিভা আমাদের শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, এবং বিশ্বভারতী দিয়েছে। এই সবগুলিই তাঁর সত্তা থেকে শ্বাস গ্রহণ করেছে এবং সেগুলি কেবল বাংলার কাছে নয় বরং সারা ভারতবর্ষের কাছে তাঁর প্রদত্ত সম্পদ। শান্তিনিকেতন আগেও ছিল এবং এখনও আমাদের সকলের কাছে তীর্থভূমি হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তিনি যা স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তা করে যেতে পারেননি। মানুষ কী করতে পারে। মানুষের ইচ্ছার পূতি ঈশ্বরের হাতে নিহিত। কিন্তু সেগুলি তাঁর প্রচেষ্টার স্মারক। দেশের প্রতি তাঁর যে গভীর ভালবাসা ছিল এবং তিনি তার যা সেবা করেছেন এই প্রতিষ্ঠানগুলি সব সময় আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শ্রোতারা এইমাত্র জাতীয় সংগীত শুনেছেন। এই গান আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্থান করে নিয়েছে। হাজার কণ্ঠে এই গান যখন গীত হয় তখন তা কতই না প্রেরণার সৃষ্টি করে! এ নিছক সংগীত নয়, এ হল ভক্তিমূলক স্তোত্র।[১২৯]

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

### ভীষণ অসন্তোষজনক

আমি মনে করেছিলাম যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বাংলা গভর্নমেণ্টকে অভিনন্দন জানানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে। মুক্তি এইজন্য দেওয়া হয়নি যে, জনমত এর দাবি করেছিল, অথবা গভর্নমেণ্ট কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ অফিসারকে নির্দোষ বলে মনে করেছিলেন, অথবা তাঁরা মনে করেছিলেন যে, যে-দোষ তিনি কিংবা জনসাধারণও জানে না তার জন্য যথেষ্ট শাস্তি তিনি ভোগ করেছেন। মুক্তি এইজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, গভর্নমেণ্টের ডাক্তাররাই মনে করেছিলেন যে, এই বিশিষ্ট বন্দী এত বেশি অসুস্থ যে তার ফলে তাঁর জীবন সঙ্কটাপন্ন। সমাজের পক্ষে অথবা কারও জীবনের পক্ষে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু যদি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়ে থাকেন এবং তাঁর যেমন খ্যাতি আছে সেই রকম একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ যদি তিনি হন, আর তাঁর সম্পর্কে এই কথা গভর্নমেণ্টও বিশ্বাস করেন, তবে তিনি যে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সেটিও কিন্তু কম বিপজ্জনক নয়। তিনি যদি বন্দী অবস্থায় মারা যান তাতে গভর্নমেণ্ট ভীত কেন? যে কোন বন্দীই সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মুক্তি দেওয়া নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্টের সাধারণ রীতি নয়। আর তাঁর অসুস্থতার জন্য যদি তাঁকে মুক্তি দেওয়া উচিত হয়ে থাকে তবে প্রথম যখন তাঁর যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে তখন তাঁকে কেন মুক্তি দেওয়া হয়নি? তাঁর রোগের সাংঘাতিক প্রকৃতির বিবরণ অনেক দিন ধরে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ভাই বন্দীর অসুস্থতা সম্পর্কে গভর্নমেণ্টকে বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আমি এই কথা অবশ্যই বলব যে, একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে নিক্ষেপ করা এবং নিজেকে তার মৃত্যুর দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়। গভর্নমেণ্ট যাকেই সন্দেহ করেন তাকেই বিনাবিচারে বন্দী করে রাখার জন্য অথবা অনির্দিষ্ট

কাল আটক করে রাখার জন্ত যে সমস্যা তার সমাধান এই মুক্তির দ্বারা হচ্ছে না। অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির জন্ত এখনও যে কিছু আন্দোলন চলছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয়দের স্বভাবই হল যে তারা সামান্যতম অনুকম্পাতেই কৃতজ্ঞতা বোধ করে। তারা সহজেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে মুক্তি দেওয়ার ফলে জনসাধারণ অন্যান্য বন্দীদের আটক করে রাখার অপরাধ ক্ষমা করবে। তারা ভুলে যাবে যে, গভর্নমেণ্ট কিছু কোমল হয়েছেন বলে এই মুক্তি দেওয়া হয়নি। তা দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির চূড়ান্ত হস্তক্ষেপের ফলে।

এ কথা শুনতে নিষ্ঠুর মনে হবে, কিন্তু আমি স্বীকার করব যে, মিথ্যা অজুহাতে মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে কোন মুক্তি না দিলেই আমি বেশি খুশী হতাম। কেননা এই ধরনের মুক্তি আসল বিষয়কে জটিল করে দেয় এবং সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনকে কঠিনতর করে দেয়। কারণ রাজবন্দীদের মুক্তির জন্ত পরিচালিত আন্দোলনের পিছনে নাগরিকদের স্বাধীনতার সমস্যা এবং সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক জনগণের উপর অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। এই যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা থেকে একমাত্র যে সান্ত্বনা জনগণ পেতে পারে তা হল এই যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মুক্তির জন্য গভর্নমেণ্ট যেসব অপমানকর শর্ত উপস্থিত করেছিলেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আমাদের আশা এবং প্রার্থনা যে, তিনি শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন এবং ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘ সেবাময় জীবন প্রদান করবেন।[১৩০]

### কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে

প্রশ্ন—সভাপতি নির্বাচনের পরে আপনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা আগে দেননি কেন? তাহলে ত্রিপুরী এবং তার পরিণামকে নিবারণ করা যেত।

উত্তর—সর্দার বল্লবভাই এবং অন্যান্যদের স্বাক্ষরিত বিবৃতিটি যখন বরদৌলী থেকে প্রচারিত হয় তখন আমি সেখানে ছিলাম। এই বিবৃতির একটি বাক্যে অথবা একটি অনুচ্ছেদে আমার মনোভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই-টিকেই যথেষ্ট বলে মনে করা উচিত ছিল। আপনাকে এই কথাও আমি বলব যে, আমার মতামত আমি তারযোগে সুভাষবাবুকে জানিয়েছিলাম।

প্রশ্ন—কিন্তু তখন একটি চিঠিতে আপনি সুভাষবাবুকে জানিয়েছিলেন যে, আপনি পন্থ-প্রস্তাব যতই পড়ছেন ততই সেটিকে অপছন্দ করছেন। কয়েকটি

কাগজের সংবাদ হল যে, নিয়মিতভাবে আপনাকে খবরাখবর দেওয়া হয়েছে, অথচ আপনার চিঠি থেকে মনে হয় যে, আপনি প্রস্তাবটি আগে পড়েননি। কোন্‌টি সত্য ?

উত্তর—প্রস্তাবটি যখন আলেচিত হয় তখন আমি রাজকোটে অনুতাপ-সূচক* শয্যায় শায়িত এবং আমার মন তখন একাগ্রভাবে রাজকোটের ঘটনার প্রতি আবদ্ধ ছিল। আমাকে একজন জানিয়েছিলেন যে, পুরাতন কর্মসূচীর উপর আস্থাসূচক একটি প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যে ভাষায় প্রস্তাবটিকে ব্যক্ত করা হয়েছিল তা আমি দেখিনি। ত্রিপুরীতেই এটি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়েছিল। সুভাষবাবু যখন ওয়ার্ধাতে আমার সঙ্গে দেখা করেন তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম যে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করাই হল সব চেয়ে সহজ পথ, অবশ্য যদি সেই প্রস্তাব ক্রোধ বা তিক্ততা ছাড়া আলোচনা করা যায়। আমি ভেবেছিলাম যে, ত্রিপুরীতে তা করা সম্ভব হয়নি। তাই ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে মন্তব্য এবং ক্রোধ এড়াবার জন্য পন্থজীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। পরে যখন সুভাষবাবু আমাকে পন্থজীর প্রস্তাব সম্পর্কে চিঠি লেখেন তখন তাঁর স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে ব্যক্ত মতামত সহ সেটি আমি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করি এবং আমার প্রতি সেটি কিভাবে প্রযোজ্য হবে তা বিবেচনা করি। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি বলেছিলাম যে, আমি এটি যতই পড়ছি ততই আমি এটিকে অপছন্দ করছি। তার স্পষ্ট কারণ হল এই যে, এই প্রস্তাবে আমার পছন্দমত নাম সুভাষবাবুর উপর চাপিয়ে দেবার কথা রয়েছে। কেননা আমি জানি যে যাঁদের নাম আমি প্রস্তাব করতে পারি তাঁদের সঙ্গে সুভাষবাবুর পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। কলকাতাতে সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল তাতে আমি তাঁকে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম এবং এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে নিজের মতে অবিচল থেকে আমি দেশের সেবা করেছি।

প্রশ্ন—কিন্তু আপনি যে নামগুলি প্রস্তাব করতেন তা মেনে নিতে তো সুভাষবাবু রাজী ছিলেন ?

উত্তর—আমার দেওয়া নাম মেনে নিতে তাঁর তৎপরতার উপর আমি কেমন করে অত্যাচার করতে পারি ? কেউ যদি আমার কাছে এসে বলেন যে তাঁকে

* রাজকোটের ঠাকুর সাহেব শাসন সংস্কার সম্পর্কিত তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে গান্ধীজী অনশন করেন।

অভিশাপ দেবার অথবা তাঁকে আঘাত করার স্বাধীনতা আমার আছে তবে সেই স্বাধীনতার সুযোগ কি আমি গ্রহণ করতে পারি? তবু আমার মনে হয় যে সুভাষবাবুর উপর আমার পছন্দমত নাম চাপিয়ে দেওয়া তাঁকে অভিশাপ দেওয়া অথবা তাঁকে আঘাত করার চেয়েও বেশি খারাপ, তা করলে তাঁর অনুভূতির উপর চূড়ান্ত অত্যাচার করা হত। আপনি কী করবেন আর আপনার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে তার মধ্যে দুস্তর ব্যাবধান আছে।

প্রশ্ন—বলা হয়ে থাকে যে, এই সব কিছুর পিছনে রয়েছে আপনার এবং সুভাষবাবুর মধ্যে একটি মৌলিক মতভেদ। আপনি কি সংক্ষেপে এই মতভেদটি কী তা বলবেন?

উত্তর—তাঁর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে তাতে এই জিনিস ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু আমি তা প্রকাশ করতে পারি না। (সুভাষবাবু কিছুদিন পরে সেগুলি প্রকাশ করেছিলেন) তবে আমার মনে হয় যে, এই মতভেদটি কী তা সবাই জানেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে তিনি যে চরমপত্র দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তার কথাই ধরুন। তিনি মনে করেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে চ্যালেঞ্জ করার উপযুক্ত সময় এসেছে। আমি মনে করি যে, অহিংস অভিযান শুরু করা ও পরিচালনা করা এখন অসম্ভব। যাঁরা হিংসায় বিশ্বাস করেন তাঁদের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। রামপুর, রামদুর্গ, কানপুর হল তার নির্দেশক। কানপুর এবং সংযুক্ত প্রদেশের অন্যান্য শহরের অবস্থার উপর পন্থজীর অহিংস নিয়ন্ত্রণ খুব কমই আছে। আমাদের যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে তার মধ্যে শিয়া-সুন্নীর অসন্তোষ একটি নতুন সংযোজন। কেবল অ-কংগ্রেসীদের উপরেই যে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই তা নয়, কংগ্রেসীদের উপরেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ খুব কম। একটি সময় ছিল যখন দেশের অধিকাংশ লোক আমাদের কথা শুনত। কিন্তু আজ, এমন কি অনেক কংগ্রেসীও আমাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছেন। আজ একটি দাণ্ডি লবণ অভিযান সংগঠনের কথা আমি চিন্তা করতে পারি না। সমগ্র পরিবেশ আজ অমঙ্গল-জনক। সুভাষবাবু অন্য রকম চিন্তা করেন।

আবার কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ব্যভিচার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ধরুন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ যে ব্যভিচার রয়েছে তা সহ্য করার অপেক্ষা তার উপযুক্ত মৃত্যু আমি কামনা করব। আমার

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে আমি রাজী করাতে পারব কিনা, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, এই বিষয়ে বোধ হয় সুভাষবাবুকে আমি আমার সঙ্গীরূপে পাব না।

সংক্ষেপে, আমি বিশ্বাস করি যে হিংসা ও ব্যভিচার আজ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি আমার এই বিশ্বাসের সঙ্গে একমত নন। সুতরাং তাঁর এবং আমার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী স্বভাবতই ভিন্ন হবে।[১৩১]

## অনুচিত অসহিষ্ণুতা

[ ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করতে থাকেন। এই সময় পাটনায় একটি জনসভায় তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়। সেই প্রসঙ্গে গান্ধীজী নিচের কথাগুলি লিখেছিলেন। ]

প্রদর্শকেরা অনুচিত অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। ওয়ার্কিং কমিটির কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার এবং তার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করার সম্পূর্ণ অধিকার সুভাষবাবুর আছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সুভাষবাবুকে সংযত থাকার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছে—সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক কংগ্রেসীকে এই সংযম অনুসরণ করতে বাধ্য করে। এই কাজ তাঁকে জনসাধারণের অধিকতর অসন্তোষ থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির এই কাজ সমর্থন করেন না, সুভাষবাবুর সমর্থনের কোন প্রদর্শনে যোগদান করার অধিকার তাঁদের আছে। এই সাধারণ রীতি যদি আমরা অনুসরণ না করি তবে আমরা কখনই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতে পারব না। আমার মতে কালো পতাকার প্রদর্শন আমাদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টার ক্ষতিসাধন করেছে। আশা করা যাক যে, পাটনার প্রদর্শন কংগ্রেসী-দের এই জাতীয় শেষ কাজ বলে সিদ্ধ হবে। প্রশ্ন হতে পারে 'যাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির কাজ সমর্থন করেন এবং সুভাষবাবুর প্রচার অননুমোদন করেন তাঁরা তাঁদের সেই অননুমোদন প্রদর্শন কিভাবে করবেন?' সুভাষবাবুকে কালো পতাকা দেখিয়ে এবং তাঁর সম্মানের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় গোলমাল সৃষ্টি করে তা নিশ্চয়ই করা যাবে না। তাঁরাও সভা আহ্বান করে তাঁদের সেই অননু-মোদন দেখাতে পারেন, কিন্তু সেই সভা যেন অন্যরা যখন এবং যেখানে সভা করবেন ঠিক সেই জায়গায় এবং ঠিক সেই সময় করা না হয়। হয় আগে,

নয়ত পরে তাঁরা সভা ডাকবেন। পক্ষে এবং বিপক্ষের এই সভাগুলিকে জনতাকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যম বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এই জাতীয় শিক্ষার জন্য শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন। শিক্ষামূলক ও জ্ঞানপ্রদ প্রচারে কালো পতাকা, চীৎকার করে ধ্বনি দেওয়া এবং সভায় জুতা ও পাথর ছোঁড়ার স্থান নেই। এই নোংরা প্রদর্শনের প্রসঙ্গে এই কথাও আমি জানাতে চাই যে, যেসব কংগ্রেসকর্মী সুভাষবাবুর অভ্যর্থনায় যোগদান করবে কংগ্রেস কমিটিগুলি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে বলে ভয় দেখিয়েছেন—এই অভিযোগ আমি শুনেছি। আমি আশা করি যে, এই অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। এই কাজ হল অসহিষ্ণুতার প্রকাশ, এমন কি এ হল হিংসাপরায়ণতার নিদর্শন। যেসব কংগ্রেস কর্মী ওয়ার্কিং কমিটির কাজ সমর্থন করেন না তাঁরা অবশ্যই সুভাষবাবুর অভ্যর্থনায় যোগদান করবেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ভয় দেখিয়ে তাঁদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। সামান্যতম অছিলাতেও যদি এই জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তবু তা তার মূল্য হারিয়ে ফেলে। একথা যদি সত্য হয়—আর একথা সত্য যে, এই জাতীয় ক্ষমতা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকতে পারে না, তবে একথাও সমান সত্য যে, যে প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ করে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তা বেঁচে থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা সে তখন হারিয়ে ফেলে।[১৩২]

## মতান্তর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

[ গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, 'সুভাষবাবু যখন কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডকে, অবশ্য তার মধ্যে আপনিও আছেন, সংশোধনবাদী এবং উদার মতাবলম্বী বলে অভিহিত করেন, তখন কি তিনি ঠিক বলেন না ?' গান্ধীজী নিম্নলিখিত উত্তর দেন ]।

তিনি ঠিকই বলেন। দাদাভাই ছিলেন একজন বিরাট সংস্কারক। গোখেল ছিলেন একজন মহান উদারনৈতিক নেতা, ফিরোজ খান মেহতাও ছিলেন তাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই ছিলেন। তাঁদের সময়ে তাঁরা ছিলেন জাতির স্বার্থ-সংরক্ষক। আমরা হলাম তাঁদের উত্তরাধিকারী। তাঁরা না থাকলে আমরা আজ কিছুই হতে পারতাম না। এগিয়ে যাবার অসহিষ্ণুতায় সুভাষবাবু যেকথা ভুলে যান তা হল আমাদের সংস্কারবাদী ও উদারনৈতিক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও আমার মত লোকেদের

পক্ষে দেশকে ভালবাসায় তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব। কিন্তু আমি তাঁকে বলেছি যে, বয়সে তিনি তরুণ, সুতরাং তারুণ্যের উৎসাহ তাঁর থাকা চাই। আমার দ্বারা অথবা আর কারও দ্বারা তিনি অবদমিত হননি। আর এইভাবে দমিত হয়ে থাকার লোকও তিনি নন। তাঁর নিজের পরিণামদর্শিতাই তাঁকে পিছনে টেনে রেখেছে। আর সেই দিক থেকে আমার মত তিনিও সমান সংস্কারবাদী ও উদারনৈতিক। কেবল আমি আমার বয়সের জন্য তা জানি আর তিনি তাঁর তারুণ্যের জন্য তাঁর মধ্যে যে ভাল গুণ আছে তা জানেন না। পত্রলেখকেরা জেনে রাখুন যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর উপর অর্পিত কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করবেন তখন তাঁরা আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখবেন, যেমন আমি যদি তাঁর নাগাল ধরতে পারি তবে দেখব যে, তিনি আমার অনুসরণ করছেন। কিন্তু আর একটি সংগ্রাম ছাড়াই আমরা আমাদের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হব এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব।[১৩৩]

ওয়ার্ধায় ফেরার সময় নাগপুর স্টেশনে একজন যুবক প্রশ্ন করেন যে, সুভাষবাবুর গ্রেপ্তার সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি কোন কিছু বলেননি কেন? আমি সেদিন মৌন ছিলাম বলে কোন উত্তর দিইনি, কিন্তু এই যুক্তিযুক্ত প্রশ্নটি আমি মনে করে নিয়েছিলাম। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সেই যুবক সেদিন নাগপুরে যে প্রশ্ন করেছিলেন, হাজার হাজার যদি নাও হয় অন্তত শত শত মানুষ তাঁদের মনে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। একথা সত্য যে, সুভাষবাবু কংগ্রেসের একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং সেই পদে তিনি পর পর দুবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ মহান। জন্ম থেকেই তিনি একজন নেতা। এই সব গুণ গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে সমর্থন করে না। এই গ্রেপ্তারের গুণাগুণ বিচার করে তার নিন্দা করা যদি সম্ভব হত তবে ওয়ার্কিং কমিটি অবশ্যই তা করত। সুভাষবাবু কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে আইন অমান্য করেননি। তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি এবং সাহসের সঙ্গে, এমন কি ওয়ার্কিং কমিটিকেও অগ্রাহ্য করেছেন। আমার মনে হয় যে, তিনি যদি এই সন্ধিক্ষণে সংগ্রামের জন্য একটি গৌণ বিষয় উত্থাপনের জন্য অনুমতি চাইতেন তবে কমিটি তা দিতেন না। শত শত বৃহত্তর বিষয় আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের মনোযোগ একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে আছে। উপযুক্ত সময়ে সেই বিষয় নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য এখন প্রস্তুতি চলেছে। সুতরাং

ওয়ার্কিং কমিটি যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন তবে তা হত এই আন্দোলনের প্রতি তাঁদের অসম্মতি জ্ঞাপন করা। কিন্তু কমিটি তা করেননি। আমিও যুবকের মন্তব্যকে উপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু আমি অনুভব করি যে, এই গ্রেপ্তারের বিষয়কে যথাযথভাবে উল্লেখ করলে কোন ক্ষতি হবে না। সুভাষবাবুর মত একজন বড় মানুষের গ্রেপ্তার একটি ছোট ঘটনা নয়। কিন্তু সুভাষবাবু তাঁর সংগ্রামের পরিকল্পনাটি চিন্তাপূর্বক এবং সাহসিকতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। তিনি মনে করেন যে তাঁর পথই শ্রেষ্ঠ। তিনি আন্তরিকভাবে মনে করেন যে ওয়ার্কিং কমিটির পথ ভুল এবং তাঁদের দীর্ঘসূত্রতার দ্বারা ভাল কিছু হবে না। তিনি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাকে বলেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি তা করবেন। বিলম্বের জন্য তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, তাঁর পরিকল্পনার শেষে যদি আমার জীবদ্দশায় স্বরাজ অর্জিত হয় তবে তিনি সর্বপ্রথম যে অভিনন্দনসূচক টেলিগ্রাম পাবেন সেটি হবে আমার। তাঁর অভিযান চলার সময় যদি আমার মত-পরিবর্তন হয় তবে সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁকে আমার নেতা বলে মেনে নেব এবং তাঁর পতাকাতলে আমার নাম লেখাব। কিন্তু আমি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তাঁর পথ ভুল।

অবশ্য আমার মতামতের কোন মূল্য নেই। সুভাষবাবু যতক্ষণ একটি বিশেষ ধরনের কাজকে প্রকৃত বলে মনে করেন ততক্ষণ, কংগ্রেস তা পছন্দ করুক আর নাই করুক, সেটি অনুসরণ করার অধিকার তাঁর আছে এবং তা করা তাঁর কর্তব্য। আমার উপদেশ তাঁর উপর ন্যস্ত হয়নি। তবু যদি তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয় এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তবে তাঁর বিদ্রোহের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে এবং কংগ্রেস তাঁর বিদ্রোহকে কেবল যে নিন্দা করবে না তা নয়, বরং তাঁকে পরিত্রাতা বলে স্বাগত করবে।

সত্যাগ্রহে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে নেওয়ার একটি নিজস্ব মূল্য আছে। দেশে প্রচলিত আইনভঙ্গের জন্য কারাবাসের প্রতিবাদ করা যায় না। পক্ষান্তরে, রীতি হল আইন-ভঙ্গকারীদের অভিনন্দন করা এবং তা অনুকরণ করবার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের আমন্ত্রণ করা। বলা বাহুল্য, সুভাষবাবুর ক্ষেত্রে কমিটি তা করতে পারেন না। প্রসঙ্গত আমি জানাতে চাই যে, কমিটি এমন কি অসংখ্য বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারাবাসের সম্পর্কেও কোন কথা বলেননি। তার মানে এই নয় যে, কমিটি তাঁদের সম্পর্কে কোন কিছু

অনুভব করেন না। জীবনের সংগ্রামে অন্যায়ের প্রতি বশ্যতা কখনো কখনো স্বীকার করে নিতে হয়। এই বশ্যতা ইচ্ছাকৃত হলে শক্তি সৃষ্টি হয় এবং ত' যদি ভালভাবে ভেবেচিন্তে করা হয় তবে সেই শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।[১৩৪]

সুভাষবাবুর কথা আপনারা জানেন। তিনি একজন বিরাট আত্মত্যাগী পুরুষ। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে তিনি বিশিষ্ট জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আজকের এই অসহায় অবস্থা বোধ হয় সহ্য করতে পারেননি বলে এবং ভেবেছিলেন যে, জার্মানী ও জাপানের সাহায্য গ্রহণ করবেন, সেই জন্য আজ জেলে বন্দী হয়ে আছেন।[১৩৫]

প্রশ্ন—একটি অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে যে, আমরা এই শাসন যথেষ্ট ভোগ করেছি এবং এখন সম্ভাব্য সব কিছুই বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল হবে। সুভাষবাবু যখন রেডিয়োতে বলেন যে, আপনার সঙ্গে তাঁর কোন মতভেদ নেই এবং এখন যে-কোন ভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম করতে আপনি প্রস্তুত তখন লোকেরা তা শুনে খুব খুশী হয়।

উত্তর—কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনি জানেন, তিনি এখানে ভুল করছেন এবং আমার প্রতি তাঁর প্রশংসা বোধ হয় আমি গ্রহণ করতে পারি না। 'যে-কোন উপায়ে স্বাধীনতা' কথাটির তাৎপর্য তাঁর কাছে যেভাবে প্রতিভাত হয় আমার কাছে সেভাবে হয় না। আমার অভিধানে 'যে-কোন উপায়ে' বলে কোন কথা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ আমার উপায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এর মানে হল এক ধরনের দাসত্বের বদলে আর এক ধরনের দাসত্ব ডেকে আনা এবং এই পরবর্তী দাসত্ব হয়ত আরও খারাপ। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে এবং তার জন্য যে কোন আত্মত্যাগ প্রয়োজন তাও করতে হবে।

সুভাষবাবু যখন বলেন যে, আমিই ঠিক তখন তাতে আমি পরিতুষ্ট হই না। তিনি যে অর্থে বলেন সেই অর্থে আমি ঠিক নই। কেননা সেখানে তিনি জাপানীদের স্বপক্ষে আমার অনুরাগের কথা আমার উপর আরোপ করেন। আমি যদি আবিষ্কার করি যে, কোন অদ্ভুত ভুল হিসাবের বশবর্তী হয়ে আমি বুঝতে পারছি না যে, আমার কাজের দ্বারা জাপানীদের দেশে প্রবেশ করতে সাহায্য করা হবে তবে আমি পিছিয়ে আসতে 'এতটুকু দ্বিধা করব না। আমি

নিশ্চিত যে, ব্রিটিশদের প্রতিরোধের জন্তও যেমন তেমনি জাপানীদের প্রতিরোধ করার জন্তও আমরা আমাদের প্রাণ বিলিয়ে দেব।[১৩৬]

## নেতাজীর শিক্ষা

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংবেশন ( হিপনটিজম ) আমাদের উপর জাদু সৃষ্টি করেছে। নেতাজীর নাম জাদুকরের মত হয়ে গিয়েছে। তাঁর দেশপ্রেম কারুর চেয়ে কম নয়। (এখানে আমি ইচ্ছা করে বর্তমান কাল ব্যবহার করছি)। তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে তাঁর শৌর্য প্রতিভাত। তাঁর লক্ষ্য ছিল উঁচু, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ কে হয়নি ? আমাদের লক্ষ্য হবে উঁচু এবং ভালর প্রতি। সকলেই যে সফল হবেন তার কোন কথা নেই। আমার প্রশংসা এবং স্তুতি এর বেশি যেতে পারে না। কেননা আমি জানতাম যে তাঁর কাজ ব্যর্থ হবেই। তিনি যদি বিজয়ী হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতেন তবু আমি এই কথা বলতাম। কেননা এইভাবে জনগণ তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না। নেতাজী এবং তাঁর সৈন্য বাহিনী যে শিক্ষা বহন করে এনেছেন তা হল আত্মত্যাগ, জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে একতা এবং শৃঙ্খলা। আমাদের ভক্তি যদি জ্ঞানপূর্বক এবং পার্থক্য নিরূপণক্ষম হয় তবে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই ত্রিবিধ গুণ অনুকরণ করব; কিন্তু সেই সঙ্গে কঠোরভাবে হিংসাকেও পরিত্যাগ করব। আমি চাই না যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা চিন্তা করুন অথবা বলুন যে, তাঁরা তাঁদের অস্ত্রের শক্তিতে ভারতবর্ষের জনগণকে দাসত্ব থেকে কখনো মুক্ত করতে পারবেন। তাঁরা যদি নেতাজীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, অধিকন্তু দেশের প্রকৃত সেবক যদি তাঁরা হন, তবে তাঁরা ভারতবর্ষের জনগণকে—পুরুষ, নারী এবং শিশুদের—সাহস আত্মত্যাগ এবং একতা শিক্ষা দেবেন। তাহলে আমরা সোজা হয়ে পৃথিবীর সামনে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু তাঁরা যদি কেবল সশস্ত্র সৈনিকদের মত ব্যবহার করতে থাকেন তবে তাঁরা জনগণের উপর একাধিপত্য করতে থাকবেন এবং তাঁরা যে সেচ্ছাসেবক এ কথার কোন মূল্য থাকবে না। সুতরাং ক্যাপ্টেন শা' নওয়াজ যে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষের মাটিতে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে অহিংসার একজন দীন সৈনিকরূপে কাজ করবেন তা আমি স্বাগত করছি।[১৩৭]

## নেতাজী কি জীবিত ?

কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি আমি বিশ্বাস করেছিলাম। পরে খবরটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সেই থেকে আমার মনে হয়েছে যে, যতক্ষণ না তাঁর স্বরাজের স্বপ্ন সার্থক হচ্ছে ততক্ষণ নেতাজী আমাদের ছেড়ে যেতে পারেন না। আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের জন্য তাঁর শত্রুদের এবং এমন কি সমগ্র বিশ্বকে প্রতারিত করার নেতাজীর যে দক্ষতা সেই জ্ঞান আমার এই অনুভূতিকে দৃঢ়তর করেছে। কেবল এই কারণেই আমি বিশ্বাস করতাম যে তিনি জীবিত।

ভবিষ্যৎ বলার দক্ষতা আমার নেই। সত্যের আগ্রহ থেকে যা আসে তা ছাড়া আমার আর কোন শক্তি নেই। অহিংসাও সেই আগ্রহ থেকে উদ্ভূত। একমাত্র ভগবানই অবিমিশ্র সত্য জানেন। সেইজন্য আমি প্রায়ই বলে থাকি যে সত্যই হল ভগবান। এর মানে হল মানুষ, যে নাকি সীমাবদ্ধ জীব সে কখনো অবিমিশ্র সত্য জানতে পারে না। সুতরাং নেতাজী জীবিত একথা আমার নিজের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া আর কেউ আমাকে বলেনি। এই রকম অসমর্থিত অনুভূতির উপর আস্থাস্থাপন করা যায় না।

পক্ষান্তরে, এই অনুভূতিকে নিবারিত করার শক্তিশালী সাক্ষ্য রয়েছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেই সাক্ষ্যের একটি পক্ষ। ক্যাপ্টেন হবিবুর রহমন বলেছেন যে, নেতাজীর মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর অর্ধদগ্ধ হাতঘড়ি ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর আর একজন সহকর্মী শ্রীআয়ার আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছেন যে, আমার অনুভূতি ভুল এবং নেতাজী জীবিত এই ধারণা আমি যেন ত্যাগ করি। এই সব প্রমাণ সামনে রেখে আমি সকলকে আবেদন কবব যে, তাঁরা যেন আমি আগে যে কথা বলেছি তা ভুলে যান এবং তাঁদের সামনে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে তা বিশ্বাস করে নেতাজী আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন এই কথা নিজেদের মনে মেনে নেন। ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে আমাদের সকল মানুষের প্রতিভা কিছুই নয়। একমাত্র তিনিই সত্য আর সব কিছুই মিথ্যা।[১৩৮]

## নেতাজীর অবদান

আজ সমস্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন উত্তেজনা এবং নতুন জাগৃতি দেখা

দিচ্ছে। এই সুখময় পরিবর্তনের জন্য নেতাজী বসুর কৃতিত্ব কিছু কম নয়। আমি তাঁর পদ্ধতি সমর্থন করিনি। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটি নতুন আদর্শ দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সেবা করেছেন।[১৩৯]

## আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি

[আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করার পর দিন প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী এই কথাগুলি বলেন।]

কাল থেকে যে চিন্তা আমার মনে ভিড় করে আছে সেগুলি আপনাদের সঙ্গে আমাকে ভাগ করে নিতে দিন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্ত লোকেদের ভারতবর্ষ যথার্থ রাজকীয় অভ্যর্থনা জানিয়েছে। তাদের জাতীয় বীর বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জনপ্রিয় অনুভূতির উত্তাল তরঙ্গে মনে হচ্ছে সকলেই যেন অবগাহন করেছে। আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকার করব যে, এই রকম অনির্বিশেষ বীরপূজায় আমি অংশগ্রহণ করতে পারি না। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং নেতাজী বসুর কর্ম-দক্ষতা, আত্মত্যাগ এবং স্বদেশপ্রেমের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু যে পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তা আমি সমর্থন করতে পারি না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেস যে পদ্ধতি গত পঁচিশ বছর ধরে অনুসরণ করে এসেছেন তার সঙ্গে এই পদ্ধতির কোন মিল নেই। গতকাল আমি আপনাদের স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ সত্যাগ্রহীর কথা বলেছিলাম। সেই আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করি তবে কাউকে আমরা শত্রু বলে গণ্য করতে পারি না; তাহলে সমস্ত শত্রুতা এবং কু-ভাবনা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। সেই আদর্শ যে কেবল সাধু-সন্তের মত মুষ্টিমেয় লোক অনুসরণ করবে তা নয়; সেই আদর্শ সকলের জন্যই অভিপ্রেত। আমি নিজেকে একজন মেথর বলে অভিহিত করেছি। আর তা করেছি নিজে মেথর হয়ে গিয়ে, কেবল নামে নয়, কার্যত; যখন আমি ফোনেক্সে ছিলাম তখন থেকে। নিম্নতম মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবার আন্তরিক আগ্রহে সেখানে আমি ঝাঁটা ও বালতি তুলে নিয়েছিলাম। আপনাদের একজন সহচর মজুররূপে এই সাক্ষ্য আমি বহন করছি যে, যে কোন লোক এমন কি গ্রামের সরলমনা মানুষও যদি চায় এবং চেষ্টা করে তবে গীতায় বর্ণিত মানসিক সাম্য-অবস্থা—যা এখনই প্রার্থনায় আবৃত্তি করা হল, তা অর্জন করতে

পারে। আমরা কখনো কখনো প্রকৃতিস্থ অবস্থা হারিয়ে ফেলি ; কিন্তু তা আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকি না, হয়ত বা তা বুঝতেও পারি না। স্থিত-চেতা মানুষ কখনো ধৈর্য হারান না, এমন কি শিশুর সঙ্গেও না, আবার তিনি ক্রোধ বা গালিগালাজকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। গীতায় যে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা এই জীবনেই অভ্যাস করতে হবে। এইখানে আপনি কী করবেন তা থেকে সম্পর্কশূন্য থেকে কেবল পরজীবনে পুরস্কারলাভের এটি একটি মাধ্যম নয়। তা হল ধর্মের অস্বীকৃতি।

শুদ্ধ কর্তব্যবোধে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারায় আমি পরম সন্তোষ লাভ করেছি এবং তাঁরাও আমাকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এই ভালবাসা আমার চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে। আমাকে তাঁরা যে-স্বাগত জানিয়েছেন তাকে আমি দেশের একজন নিষ্ঠাবান সেবকরূপে আমাকে স্বীকৃতিদানের প্রতীকরূপে গণ্য করেছি।

নেতাজী আমার কাছে আমার পুত্রের মত ছিলেন। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশের অধীনে একজন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ কর্মীরূপে আমি তাঁকে দেখেছিলাম। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি তাঁর অন্তিম বাণী হল এই যে, যখন তাঁরা বিদেশে তখন তাঁরা অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করেছেন বটে কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবং নির্দেশে অহিংস সৈনিকরূপে দেশের সেবা করবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ যে বাণী ভারতবর্ষের কাছে উপস্থাপিত করেছেন তা বিবাদের মীমাংসার জন্য অস্ত্রের পথ গ্রহণ করা নয় ( এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে পারেনি ), বরং তা হল অহিংসা, একতা, সংশক্তি এবং সংগঠন অনুশীলন করা।

যদিও আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের আশু লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছেন তবু তাঁদের কৃতিত্বে অনেক কিছু আছে যার জন্য তাঁরা গর্ববোধ করতে পারেন। তার মধ্যে তাঁদের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মের ও জাতির লোককে একটি পতাকার তলে একত্র করা এবং তাঁদের মধ্যে সব রকমের সাম্প্রদায়িকতা অথবা সঙ্কীর্ণতার মনোভাব ত্যাগ করে সংহতি ও একত্বের চেতনা অনুপ্রবিষ্ট করা। এটি এমন এক দৃষ্টান্ত যা সকলের অনুসরণ করা উচিত। যদি তাঁরা সংগ্রামের জাদু ও রোমাঞ্চের জন্য এটি করে থাকেন তবে তা বড় কিছু নয়! শান্তির মধ্যেও তা তাঁদের বজায় রাখতে হবে। এটি

উচ্চতর এবং কঠিনতর কাজ। আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে কাউকে, হত্যা না করে মৃত্যুবরণ করে নিতে হবে। তার জন্য গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ আমাদের অনুশীলন করতে হবে।

শস্ত্রের শক্তির চেয়ে সত্যাগ্রহের শক্তি বেশি প্রভাবশালী। আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেদের একথা বলেছি এবং আমি যেমন শুনেছি তাঁরা আনন্দের সঙ্গে আমাকে বলেছেন যে, এই কথা তাঁরাও উপলব্ধি করেছেন এবং এখন থেকে তাঁরা কংগ্রেসের পতাকাতলে প্রকৃত অহিংস সৈনিকরূপে ভারতবর্ষের সেবা করবেন।[১৪০]

প্রবীণ সৈনিকেরা রণাঙ্গনে যেমন তাঁদের তেজস্বিতা প্রমাণ করে থাকেন আপনারা সেইভাবে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে কাজ করেছেন। সাফল্য অথবা ব্যর্থতা আমাদের উপর নির্ভর করে না, তা করে ঈশ্বরের উপর। আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় নেতাজী আপনাদের বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করার পর আপনারা অবশ্যই কংগ্রেসের শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের নিয়োগ করবেন এবং তার পদ্ধতি অনুসারে কাজ করবেন। আমি শুনেছি যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল আপনাদের লক্ষ্য, জাপানকে সাহায্য করা আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আপনাদের যে আশু উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ ব্রিটিশদের পরাজিত করা, তাতে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু আপনাদের এই পরিতোষ রয়েছে যে, সমস্ত দেশ জেগে উঠেছে এবং এমন কি নিয়মিত সৈনিকদের মধ্যেও এক রাজনৈকিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে এবং তাঁরা স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। আপনাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খ্রীষ্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং শিখেদের সম্পূর্ণ একতা আপনারা অর্জন করতে পেরেছিলেন। এটি কম কৃতিত্ব নয়। স্বাধীনতার শর্তে ভারতবর্ষের বাইরে আপনারা যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতীয় পরিবেশে আপনাদের সেটিকে প্রতিপালন এবং জীবিত রাখতে হবে। আর সেটিই হবে আপনাদের প্রকৃত পরীক্ষা।

প্রশ্ন—সুভাষবাবু যদি বিজয়ী হয়ে আপনার সামনে আসতেন তাহলে আপনি কী করতেন?

উত্তর—আমি তাঁকে আপনাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমার সামনে সেগুলি জমা করার কথা বলতে অনুরোধ করতাম।[১৪১]

## নেতাজীর বৈশিষ্ট্য

[প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার নিম্নলিখিত বিবরণটি হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।]

বক্তার মতে নেতাজীর বিরাট ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ হল এই যে, তিনি সমস্ত জাতি ও শ্রেণী-বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তিনি শুধু হিন্দু ছিলেন না, শুধু বাঙালী ছিলেন না এবং নিজেকে কখন বর্ণহিন্দু বলে চিন্তা করেননি। তিনি আগাগোড়া ভারতীয় ছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা হল, তাঁর নেতৃত্বাধীনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যে তিনি সেই উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন, যাতে তাঁরা তাঁর কাছে সব রকমের বৈষম্য ভুলে গিয়েছিলেন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছিলেন।

নেতাজীর যে আরও অনেক কৃতিত্ব আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশসেবার জন্য তিনি তাঁর উজ্জ্বল বৃত্তি ত্যাগ করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি বহুবার কারাভোগ করেছেন, দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন এবং শেষে বিরাট চাতুরী প্রয়োগে বাংলা গভর্নমেণ্ট তাঁর উপর যে প্রহরী রেখেছিলেন তার চোখে ধূলা দিয়ে কেবল সাহস ও উদ্ভাবন-ক্ষমতার ভরসায় কাবুলে পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে তিনি ইউরোপীয় দেশগুলিতে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জাপানে গিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায় ও অংশের বিক্ষিপ্ত মানুষগুলিকে একত্র করে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন ও একটি শক্তিশালী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। তাঁর চেয়ে কম শক্তিশালী মানুষ এত কঠিনতার মধ্যে দমে যেত। কিন্তু নেতাজী সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং নিজের জীবনে তুলসীদাসের এই কথা প্রমাণ করেছিলেন যে, 'সাহসী পুরুষের কাছে সব কিছুই সাধ্য হয়ে যায়'।[১৪২]



গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র



নোয়াখালির দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গান্ধীজী

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## বিবিধ

### বন্দেমাতরম

### বাংলা দেশের বীরোচিত সঙ্গীত

প্রত্যেক পাশ্চাত্য জাতির জাতীয় সঙ্গীত আছে। তারা গুরুত্বপূর্ণ সময়-গুলিতে এই গান গেয়ে থাকে। ব্রিটিশ জাতির সঙ্গীত 'গড সেভ দি কিং'-এর কথা সবাই জানেন। কোন ইংরেজ যখন এই গান গায় তখন সে বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। জার্মানদেরও বিখ্যাত গান আছে। ফ্রান্সের 'লা মিজারেবল' গানটি এত উঁচুদরের যে, ফরাসীরা এই গান গাওয়া মাত্র উল্লসিত হয়ে ওঠে। এইটি উপলব্ধি করে বাঙালী কবি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের জনগণের জন্ম একটি সঙ্গীত রচনার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর রচিত 'বন্দেমাতরম' গান সারা বাংলায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশে বড় বড় সভা হয়েছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র জমা হয়ে বঙ্কিমের গান গেয়েছেন। বলা হয়ে থাকে যে, এই গান এত জনপ্রিয় হয়েছে যে, তা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে যাবে। অন্যান্য জাতির গানগুলি অপেক্ষা এই গান ভাবের দিক থেকে মহত্তর এবং বেশি মিষ্টি। অন্য সব গানে অপরের প্রতি অপমানসূচক কথা আছে। কিন্তু বন্দেমাতরম এই জাতীয় ত্রুটিমুক্ত। এর একমাত্র লক্ষ্য হল আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ জাগ্রত করা। এই গানে ভারতবর্ষকে জননীরূপে দেখা হয়েছে এবং তার প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে। আমরা মায়ের ভিতর যতগুলি গুণ দেখি কবি ভারতমাতার প্রতি সেই সব গুণ আরোপ করেছেন। আমরা যেমন মাকে পূজা করি, এই গানটিতেও তেমনি ভারতবর্ষকে গভীরভাবে আরাধনা করা হয়েছে। এতে বেশির ভাগ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তবে তা সবই সহজবোধ্য। এর ভাষা যদিও বাংলা তবু তা সকলের পক্ষেই বোধগম্য, গানটি এত উঁচুদরের যে, আমরা নিজে সেটিকে গুজরাটি লিপিতে এবং হিন্দী বিভাগে দেবনাগরী লিপিতে মুদ্রিত করলাম।[১৪৩]

বন্দেমাতরম হল ভারতমাতার প্রতি প্রার্থনা। বাঙালী ভাইদের এই গানটি এত শক্তিশালী যে, ভারতবর্ষের কোথায়ও তার সমান গান খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৪৪]

মাদ্রাজ ভ্রমণের সময় বেজওয়াদায় আমাদের জাতীয় ধ্বনি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার সুযোগ আমার হয়েছিল। এবং সেখানে আমি বলেছিলাম যে, মানুষের সম্পর্কে ধ্বনি দেওয়ার চেয়ে আদর্শের ধ্বনি দেওয়া ভাল। শ্রোতাদের আমি বলেছিলাম যে, মহাত্মা গান্ধী কী জয় এবং মহম্মদ আলী-সৌকত আলী কী জয় ধ্বনির পরিবর্তে তাঁরা যেন হিন্দু-মুসলমান কী জয় বলেন।

...সুতরাং কেবল তিনটি ধ্বনি স্বীকৃত হতে পারে। প্রথমটি হবে, আল্লা হো আকবর। এর অর্থ একমাত্র ভগবানই শ্রেষ্ঠ আর কেউ নয়, এটি হিন্দু মুসলমান উভয়ে আনন্দের সঙ্গে বলবে। দ্বিতীয়টি হল, বন্দেমাতরম অথবা ভারতমাতা কী জয়। তৃতীয়টি হল, হিন্দু-মুসলমান কী জয়। হিন্দু-মুসলমানের জয় ব্যতীত ভারতবর্ষ বিজয়লাভ করতে পারে না এবং তা না হলে ঈশ্বরের যথার্থ মহত্বও প্রদর্শিত হতে পারে না। প্রথমটি হল প্রার্থনা এবং আমাদের ন্যূনতার স্বীকৃতি এবং তা আমাদের নম্রতার পরিচায়ক। এটি এমন একটি ধ্বনি যাতে সকল হিন্দু এবং মুসলমান শ্রদ্ধা ও প্রার্থনার মনোভাব নিয়ে যোগ দেবে। আরবী শব্দের জন্য হিন্দুদের সঙ্কোচ করার কোন কারণ নেই, বিশেষ করে যখন তার অর্থ আপত্তিজনক তো নয়ই, বরং তা মহত্বাভিমুখী। ঈশ্বর কোন এক ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। বন্দেমাতরমের মধ্যে ভাবধারার এক বিস্ময়কর যোগ রয়েছে। তা ছাড়াও তার মধ্যে এক জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রয়েছে, সেটি হল ভারতবর্ষকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা। আর আমি ভারতমাতা কী জয়ের চেয়ে বন্দেমাতরম বেশি পছন্দ করব। কেননা তাতে বৌদ্ধিক ও ভাবাবেগের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠতার সুন্দর স্বীকৃতি দেওয়া হবে। যেহেতু হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয়ের একত্ব ছাড়া ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব নয়, সেইহেতু হিন্দু-মুসলমান কী জয় ধ্বনিটি আমরা কখনও ভুলতে পারব না।[১৪৫]

জাতীয় পতাকা সম্পর্কে আমি যে কথা বলেছি সে-কথা বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থায় প্রযোজ্য। বন্দেমাতরমের উৎস কী এবং

কখন ও কী ভাবে তা রচিত হয়েছিল তার কোন প্রশ্ন নেই। বঙ্গভঙ্গের সময় বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই এটি এক খুব শক্তিশালী রণসঙ্গীত হয়ে গিয়েছিল। আমার বালক বয়সে, যখন আমি আনন্দমঠ অথবা তার অমর স্রষ্টা বঙ্কিমের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, তখনই বন্দেমাতরম আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং প্রথম যখন আমি এই গান শুনি তা আমাকে অভিভূত করে দেয়। আমার কখনো এই ধারণা হয়নি যে এটি হল হিন্দুসঙ্গীত অথবা কেবল হিন্দুদের জন্য এটি রচিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এখন আমাদের খারাপ সময় এসেছে। আগে যেগুলিকে খাঁটি সোনা বলে মনে হত এখন সেগুলিকে সামান্য ধাতু বলে মনে হচ্ছে। এই রকম অবস্থায় বাজারের খাঁটি সোনা বিক্রয় না করে তাকে সামান্য ধাতু বলে চালানোই বুদ্ধিমানের কাজ। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভায় বন্দেমাতরম গান গেয়ে বিবাদ সৃষ্টির কোন ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। অব্যবহারের জন্য তার কোন ক্ষতি হবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়কে এই গান অভিভূত করতে থাকবে। যতদিন জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন এই জাতীয় পতাকা ও এই সঙ্গীত বেঁচে থাকবে।[১৪৬]

## ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা দেশের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজীর আজ অন্ধ ভক্ত। বলা হয়ে থাকে যে, সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যের প্রগতির কারণ হল প্রধানত বাঙালীদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান। কিন্তু আসল ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোমুগ্ধকর লিখনশৈলী তার উৎকর্ষের জন্য কবির ইংরেজী জ্ঞানের কাছে ঋণী নয়। আসলে নিজের ভাষার প্রতি তাঁর প্রেমই হল এর উৎস। গীতাঞ্জলি বাংলাতে রচিত হয়েছে। এই মহান কবি যখন বাংলা দেশে থাকেন তখন বাংলা ভাষাতে কথাবার্তা বলেন। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্প্রতি কলকাতাতে যে সুন্দর ভাষণটি দিয়েছেন তাও বাংলায়। তাঁর ভাষণ যাঁরা শুনতে গিয়েছিলন তাঁদের মধ্যে তিনি দেশের যে অংশে বাস করেন সেখানকার অনেক বিশিষ্ট পুরুষ ও নারী ছিলেন। যাঁরা এই বক্তৃতা শুনেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে, তিনি ভাষার অমৃত বর্ষণের দ্বারা শ্রোতাদের দেড় ঘণ্টা ধরে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন'। তিনি তাঁর ভাবধারা ইংরেজী সাহিত্য থেকে ধার করেননি।

তিনি বলেন যে, দেশের হাওয়া থেকে তিনি তা গ্রহণ করেছেন। উপনিষদ থেকে তিনি তা পেয়েছেন। ভারতবর্ষের গৌরবময় আকাশ তাঁকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলা দেশের অন্যান্য গ্রন্থকারদের সম্পর্কেও এ কথা সত্য।[১৪৭]

আমি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছি যে, একমাত্র হিন্দীই এই স্থান (জাতীয় ভাষা) গ্রহণ করতে পারে। আর কোন ভাষা পারে না। আমি কি বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বুঝতে পারিনি? আমি তা পেরেছি এবং চৈতন্য, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা বলে বাংলা ভাষা আমার মনে উচ্চস্থান গ্রহণ করে আছে। তবু আমার মনে হয়েছে যে, বাংলা ভাষাকে আমরা আন্তর্প্রাদেশিক ভাষা করতে পারব না।[১৪৮]

## লিপি

বহু লিপি একাধিক কারণে বাধাস্বরূপ। তা জ্ঞান আহরণে কার্যত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আর্য ভাষাগুলির মধ্যে এত বেশি মিল আছে যে, বিভিন্ন লিপি শিখতে যদি যথেষ্ট সময় নষ্ট করতে না হত তবে বেশি কষ্ট না করেই আমরা অনেকগুলি ভাষা শিখে নিতে পারতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপম সৃষ্টিগুলি যদি দেবনাগরী লিপিতে ছাপা হত তবে যাদের সংস্কৃতে অল্প জ্ঞান আছে তারাও তা বুঝতে পারত। কিন্তু বাংলা লিপি যেন অবাঙালীর কাছে 'আমাকে ছুঁয়ো না'-র এক বিজ্ঞাপন।[১৪৯]

## সঙ্গীত

এবারে কলকাতা আমার খুব ভাল লেগেছে। তবে তা কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে নয়, তার বাইরে। কবি এবং তাঁর সম্প্রদায়কৃত 'ডাকঘর' দেখে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। এমন কি এখন এই চিঠিটা মুখে মুখে বলার সময়েও, আমার কানে কবির সুমিষ্ট কণ্ঠ এবং অসুস্থ বালকের অপরূপ সুন্দর অভিনয় আমার কানে বাজছে। বাংলা গান আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে। আমি যে খুব বেশি বাংলা গান শুনেছি তা নয়, তবে যেটুকু শুনেছি তা আমার স্নায়ুর উপর এক শান্ত প্রভাব সৃষ্টি করে। অন্য কারণে আমার স্নায়ু তো সব সময় উত্তেজিত হয়েই থাকে।[১৫০]

## বাংলা ভ্রমণ

আমি আশা করি যে আগামী ২রা মে ফরিদপুরে যে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তাতে আমি যোগদান করতে পারব। আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে, খাদি, চরখা এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণের কাজের লোভই আমাকে এই সম্মেলনে যোগ দিতে উৎসাহ দিয়েছে। এই লোভ আমাকে বাংলা দেশের অন্যত্রও নিয়ে যাবে। সুতরাং যাঁরা আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চান তাঁরা দয়া করে এই ভ্রমণের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। স্বভাবতই দেশবন্ধু দাশ এই সবের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমি এইমাত্র আচার্য রায়ের টেলিগ্রাম থেকে জানতে পারলাম যে, দেশবন্ধু এখন পাটনায় রয়েছেন এবং তিনি আমাকে তাঁর খাদি কেন্দ্রে নিয়ে যেতে চান। সুতরাং আমি আশা করি যে আমার ভ্রমণে যারা উৎসাহী তাঁরা ডঃ পি. সি রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।[১৫১]

বাংলা ভ্রমণের পিছনে এই সাধারণ যুক্তিটি রয়েছে। আমি যেসব টেলিগ্রাম পেয়েছি তা থেকে দেখেছি যে পাঁচ সপ্তাহ ব্যাপী আমার ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি আশা করি যে সংগঠকেরা সোমবারগুলিকেও হিসেবের মধ্যে ধরেছেন। আমার রীতি হল যে এই দিনগুলিতে আমি মৌন থাকি এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা করি না। কিন্তু আমি চাইব যে, সংগঠকেরা বুধবারগুলিকেও আমার মৌন থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন, তাহলে ঐ দিন প্রতি সপ্তাহের লেখা আমি লিখতে পারব। আমার সঙ্গে চরখা নিয়ে যাবার কথাও আমি ভেবেছিলাম। এখন আমি সেই ব্যবস্থা বদলেছি এবং সংগঠকদের অনুরোধ করছি যে, যাঁরা আমার খাবার ব্যবস্থা করবেন তাঁরা আমার জন্য কাজ চলার মত একটি চরখাও এনে দেবেন। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় চরখা আমি পরীক্ষা করতে পারব। আর যেহেতু আমার নিমন্ত্রণকারী আমার জন্য সব চেয়ে ভাল চরখা যোগাড় করতে চেষ্টা করবেন সেইহেতু তা থেকে সেই এলাকায় সুতা উৎপাদনের সম্ভাবনাও আমি দেখে নিতে পারব। কেননা যখনই আমি দেখি যে, সব চেয়ে ভাল চরখাটি এমন এক বস্তু যার প্রতি সবাই উদাসীন তখনই আমি বুঝতে পারি যে, সেখানে সুতা খুব কম উৎপাদন হয়। সুতরাং আমি আশা করি যে, সব জায়গাতেই আমার নিমন্ত্রণকারী একটি ভাল চরখা যোগাড় করে রাখবেন এবং আমার সুতা কাটার সময়ও বার করে

রাখবেন। তৃতীয়ত, আমি আশা করি যে সমবেত জনতাকে এই নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হবে যে তারা যেন চিৎকার বা গোলমাল না করে, বরং মঞ্চে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করে রাখে। বিরাট জনতার মধ্য দিয়ে যেতে বহু ক্ষেত্রে সময়ের ভয়ানক অপচয় হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকদের রাস্তা করে দেবার জন্য হাত ধরাধরি করে দাঁড়ানো থেকে বোঝা যায় যে ভিড় নিয়ন্ত্রণের নিয়ম মানার শৃঙ্খলাবোধ জনসাধারণের হয়নি। আমি জানি যে, আগে থেকে যদি বিশদ বিবরণ দিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হয় এবং সভা আরম্ভ হবার আগে মঞ্চ থেকে তা বার বার ঘোষণা করা হয়, তবে জনতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সম্ভব। জনতাকে নির্দেশ দিতে হবে যে তারা যেন আমার পা স্পর্শ না করে। এই জাতীয় শ্রদ্ধা পাবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। যে শ্রদ্ধা আমি পেতে চাই তা হল, যাঁরা আমাকে সম্মান দেখাতে চান তাঁরা আমার প্রচারিত আদর্শকে জীবনে অনুসরণ করুন। তাঁরা যদি বুক সোজা করে দাঁড়ান এবং হাত জোড় করে নমস্কার করেন তবে তাতেই যথেষ্ট করা হবে। আমার কথা যদি চলত তবে এটিকেও আমি ত্যাগ করতে বলতাম। মুখ দেখে ভালবাসা বোঝা মোটেই কষ্টকর নয়। তার চেয়ে বেশি অঙ্গভঙ্গীর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাংলা দেশে যে জনতা আমি আশা করি তারা যদি সকলে খদ্দর পরিহিত থাকে তা হলেই আমি খুশী হব। এমন কথা নয় যে যিনি খদ্দর পরিহিত থাকবেন না তাঁকে তাড়িয়ে দিতে হবে। যাঁরা খদ্দরে বিশ্বাস করেন না তাঁরা বিলাতী অথবা মিলে প্রস্তুত কাপড় পরে আসতে পারেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোক যাঁরা খদ্দরে বিশ্বাস করেন বলে আমি জানি তাঁরা যেন অন্তত তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ করেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেহে তাঁদের বিশ্বাসকে রূপায়িত করুন। যাই হোক, আমি আশা করব যে সব দলের লোক যেন সভায় যোগদান করেন। সমস্ত মতের এবং সমস্ত জাতির লোকেদের দেখতে আমি ইচ্ছা করব, এ থেকে ইংরেজরাও বাদ যাবেন না। আমি এই কথাও বলে দিতে চাই যে স্থানীয় উদ্যোক্তারা বক্তৃতা দেবার জন্য বড় বড় সভা করার বদলে ব্যক্তিগত ( গোপন নয় ) আলোচনার জন্য অধিক সংখ্যক ছোট ছোট বৈঠকের যদি ব্যবস্থা করেন তবে খুব ভাল হবে। এই রকম দর্শনীয় জিনিসেরও হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাতে এই ন্যূনতম সময় ব্যয় করা উচিত। স্বভাবতই ছাত্রদের সঙ্গে আমি মিলিত হব। সব জায়গাতেই মহিলাদের সভা হয়ে থাকে। এখন থেকে প্রত্যেক জায়গায়

অস্পৃশ্যদের সভাও আমি আশা করব। ভারতবর্ষের এই সব অঞ্চলের মত বাংলা দেশেও যদি তাদের আলাদা বসতি থাকে তবে সেখানেও আমি যেতে চাইব। মোট কথা, এই ভ্রমণ যেন কাজের কাজ হয় এবং তাতে যেন শান্তি ও সদ্ভাবনার মিশন থাকে।[১৫২]

## পতিতা বোনেদের প্রসঙ্গ

বরিশালের আরও অনেক অভিজ্ঞতা বলার মত আছে। কিন্তু সেই সব বর্ণনা করার মত সময় আমার নেই। কিন্তু একটি বিষয় আমি বাদ দিতে পারি না। সেটি হল বরিশালের পতিতা বোনেদের প্রসঙ্গ। এদের মধ্যে কয়েকটি বোন কংগ্রেসের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন এবং এমন কি তিলক স্বরাজ তহবিলে চাঁদা দিয়েছেন। তাঁরা সংখ্যায় প্রায় ৩৫০ জন। আমার সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করতে পারেন কিনা সে কথা তাঁরা আমাকে লিখে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁরা কংগ্রেসের আরও বেশি কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নির্বাচিত হলে পদ অধিকারই বা তাঁরা করবেন না কেন? রাত্রি-বেলায় সভা থেকে ফেরার সময় আমি তাঁদের প্রায় একশ জনকে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ইঙ্গিতটি আমি বুঝতে পারলাম। খুবই সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁদের আমি ছাদে নিয়ে গেলাম। একজন দোভাষীকে আমার কাছে রেখে আর সবাইকে চলে যেতে বললাম। আমি তাঁদের কোন কিছু গোপন না করে কথা বলতে বললাম। তাঁদের মধ্যে মাত্র দশ বছর বয়সেরও চারটি কি পাঁচটি মেয়ে ছিল। কয়েকজন তাঁদের যৌবন অতিক্রম করেছিলেন। বাকি কজন কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়সের ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্তসার আমি এখানে প্রশ্নোত্তরের আকারে উপস্থিত করছি।

প্রশ্ন—বোনেরা, আপনারা এসেছেন বলে আমি খুশী হয়েছি। আপনারা আমার বোন ও মেয়ের মত। আমি আপনাদের দুঃখের ভাগ নিতে চাই। কিন্তু আপনারা যদি আমার কাছে কিছু গোপন করেন তবে আমি আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারব না।

উত্তর—আপনার সকল প্রশ্নের উত্তরে আমরা সত্য কথাই বলব।

প্রঃ—আপনাদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশি বয়স বলে মনে হচ্ছে। তাঁরাও কি এই বৃত্তি অবলম্বন করেন?

উঃ—না। আমাদের মধ্যে যাঁদের বয়স বেশি তাঁরা ভিক্ষা করে জীবন-যাপন করেন।

প্রঃ—তা করতে কি আপনাদের ভাল লাগে?

উঃ—ক্ষুধার জ্বালায় তাঁরা এ কাজ করেন।

প্রঃ—ছোট ছোট মেয়েদেরও কি সেই অবস্থা?

উঃ—আমরা এই আশা নিয়ে এখানে এসেছি যে, আপনি আমাদের কোন পথ দেখাবেন। আমাদের মধ্যে কেউ এই বৃত্তি চালিয়ে যেতে চায় না।

প্রঃ—আপনাদের মধ্যে যাঁরা যুবতী তাঁদের কী ব্যাপার? এই বৃত্তি যে আনন্দ দেয় তার দ্বারা কি তাঁরা প্রলুব্ধ নন?

উঃ—কয়েকজন এমন থাকতে পারেন।

প্রঃ—আপনাদের কারও কি ছেলেমেয়ে হয়ে থাকে?

উঃ—কারও কারও হয়ে থাকে।

প্রঃ—এখানে আপনারা কতজন আছেন?

উঃ—তিনশ পঞ্চাশজন।

প্রঃ—আপনাদের কটি ছেলেমেয়ে আছে?

উঃ—বর্তমানে প্রায় দশজন।

প্রঃ—তারা কি ছেলে, না মেয়ে?

উঃ—ছটি মেয়ে, বাকি কজন ছেলে।

প্রঃ—ছেলেদের নিয়ে আপনারা কী করেন?

উঃ—একটি ছেলে বড়, সে আমাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে।

প্রঃ—আপনাদের মেয়েগুলিকে কি আপনারা আমাকে দিয়ে দেবেন?

উঃ—আপনি যদি তাদের দেখাশুনা করেন তাহলে আমরা তাদের আপনাকে দিয়ে দিতে পারি।

প্রঃ—আপনাদের মধ্যে কতজন এই বৃত্তি ছেড়ে দেবার কথা গুরুতরভাবে চিন্তা করছেন?

উঃ—সবাই।

প্রঃ—আমি যা করতে বলব আপনারা কি তা করবেন?

উঃ—আমরা জানি আপনি কী চান? আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে সুতাকাটা আরম্ভ করেছেন।

প্রঃ—একথা জেনে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু যেসব বোনেরা সুতা কাটা আরম্ভ করেছেন তাঁরা কি এই বৃত্তি ত্যাগ করেছেন?

উঃ—আমাদের কি ঋণ নেই? শুধু এই কাজ করে আমরা কি করে আমাদের জীবন চালাব?

প্রঃ—আপনারা এখন কত রোজগার করেন? উত্তর দিতে আপনারা লজ্জা পাচ্ছেন? আপনাদের দ্বিধা আমি বুঝতে পারি। আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি বটে কিন্তু আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনারা কত রোজগার করেন তাই আমাকে জানতে দিন।

উঃ—আমাদের অনেকে ষাট টাকা রোজগার করেন, তার মানে দিনে দু-টাকা।

প্রঃ—আমি জানি সুতা কেটে এই টাকা আপনারা রোজগার করতে পারবেন না। তাই বর্তমানে যেসব লোভনীয় আনন্দ আপনারা ভোগ করেন তা আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। শুধু আপনাদেরই আমি এই কথা বলছি তা নয়। আমার স্ত্রীও গহনা পরা বন্ধ করেছেন। আমার কাছে অল্প বয়সের মেয়েরাও আছে। তাদের মা-বাবা তাদের গহনা এবং অন্যান্য জিনিস দিতে পারে। তবু তারা ছোট খদ্দরের শাড়ী পরে এবং গহনা পরে না। তাই আপনাদের অলঙ্কার ত্যাগ করার কথা বলতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

উঃ—আমাদের জীবন সরল করতে আমরা চেষ্টা করব। কেউ কেউ এখনই তা করবেন, আর কেউ কেউ ধীরে ধীরে তা করবেন। আমাদের মধ্যে একজন তাঁর সব কিছু রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দিয়েছেন এবং এখন ভিক্ষা করে বেঁচে আছেন।

প্রঃ—ঐ বোনের কাছে আমি মাথা নত করি। তিনি যে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই খুব ভাল। (তাঁর দিকে ফিরে) আমি দেখছি যে আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বেশ শক্ত। সুতরাং সুতা কেটে সরল জীবনযাপন করা আপনার পক্ষে অধিকতর পবিত্র কাজ। আমি চাই যে, অঙ্গহীন নয় এমন প্রত্যেক পুরুষ ও নারী ভিক্ষা করাকে লজ্জাজনক বলে মনে করুক। আমরা চরখা আবিষ্কার করেছি। এটি হল আমাদের কামধেনু। আপনারা শুধু সুতা কাটবেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট নই। তাঁত বোনা এবং তুলা ধুনাও আপনাদের শেখা উচিত। তা যদি করেন, তবে জীবনযাপনের জন্য যা প্রয়োজন তা আপনারা উপার্জন করতে পারবেন।

উঃ—আপনি আমাদের পথ দেখান, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব।

প্রঃ—আপনাদের মধ্যে কতজন কালকেই এই বৃত্তি ত্যাগ করতে প্রস্তুত?

এই আহ্বানে এগারজন বোন তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। আমি তাঁদের চিন্তা করতে বললাম। তাঁরা আমাকে বললেন যে, তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তাঁরা এ সম্পর্কে আগে থেকেই ভেবেছেন। কি করে তা সম্ভব হবে সেইটিই হল সমস্যা। সুতরাং আমি বললাম ঃ

আপনাদের ক্ষেত্রে বিবাহের কোন কথাই ওঠে না। সুতরাং অতীতে আপনারা যেভাবেই জীবনযাপন করে থাকুন না কেন এখন থেকে যদি আপনারা পবিত্র জীবনযাপন করেন তবে আপনাদের পাপ পৃথিবী ভুলে যাবে। উপরন্তু গৃহ ও সংসারের ঘটনাবলী সম্পর্কে আপনারা নিজেদের উদাসীন করে নিতে পারেন, অর্থাৎ আপনারা সন্ন্যাসিনী হয়ে যেতে পারেন। আপনারা ভারতবর্ষের সেবা করতে পারেন। আপনারা অনেকেই যদি ভক্তিমূলক গান গাইতে গাইতে দিনে বারো ঘণ্টা করে সুতা কাটেন এবং তাঁত বোনেন তবে প্রায় সমগ্র বরিশালকে আপনারা কাপড় পরাতে পারবেন। দেশের মধ্যে আপনাদের শ্রেণীর সমস্ত মেয়েরা, যদি এই অনুচিত বৃত্তি ত্যাগ করে সুতা কাটা ও তাঁত বোনার পবিত্র কাজ গ্রহণ করেন তবে অচিরেই দেশ সমৃদ্ধিলাভ করবে। সুতরাং আমি আশা করি যে, আপনারা এই এগারজন বোন আপনাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন। পর্যটন করতে করতে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের কাছে আপনাদের কথা আমি জোরের সঙ্গে বলব এবং এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি সর্ব-প্রকারে আপনাদের সাহায্য করবে। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন।

পাঠক, আপনি পুরুষ হন বা নারী হন, আমি জানি না যে এটি পড়ে আপনি কী ভাববেন অথবা অনুভব করবেন। সব কিছু আমি আপনাদের কাছে বর্ণনা করিনি। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি চিত্রটি উপস্থাপিত করেছি। এটি দেখে বাস্তব সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যাবে। সর্বক্ষণ আমি লজ্জায় অভিভূত ছিলাম এবং মেয়েদের উপর কৃত পুরুষদের অপরাধের গভীরতা অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম। এই জীবন মেয়েরা বেছে নেয়নি, পুরুষরাই তাদের সেই পথে চালিত করেছে। পুরুষ তার ইচ্ছার পরিতুষ্টির জন্য মেয়েদের উপর চরম নিষ্ঠুরতা করেছে। যিনি এ কথা অনুভব করবেন তাঁর উচিত, অন্য কোন কারণে না হলেও অন্তত প্রায়শ্চিত্তের জন্যও এইসব

পতিতা বোনের প্রতি তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দেওয়া। এই বোনেদের চিত্রটি যখন আমার মনে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল তখন এই চিন্তা আমার মনে উদিত হয় যে, যদি এরা আমার বোন অথবা মেয়ে হত তাহলে কী হত! কেন এই 'যদি'? বস্তুত তাঁরা তাই ছিলেন। তাঁদের উন্নত করা আমার এবং প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য। এই জন্যই চরখার সঙ্গীত আমার এত প্রিয়। চরখা মেয়েদের রক্ষা করার একজাতীয় প্রাচীর। ভারতবর্ষের এই জাতীয় বোনেদের অবলম্বন হতে পারে এমন আর কোন জিনিস আমি ভাবতে পারি না। কিন্তু যতক্ষণ না প্রত্যেক শহরের ভাল লোকেরা এগিয়ে আসছেন ততক্ষণ এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। বরিশালে এই বোনেদের মধ্যে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা হলেন উচ্চমনা শ্রীশরৎকুমার ঘোষ এবং তাঁর সহকর্মী শ্রীভূপতিবাবু, যিনি উকিল ছিলেন এবং অসহযোগে যুক্ত হয়েছেন। তাঁরা যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন আমি কেবল তারই সুযোগ নিয়েছিলাম।

বোনেরা, এখন যখন আপনারা জিনিসটি জেনেছেন তখন আপনাদেরও কাজ করতে হবে। পতিতা বোনেদের অন্তরের অন্তস্তলে কেবল আপনারাই প্রবেশ করতে পারেন। এইজাতীয় মেয়েদের বন্ধনমোচনের জন্য যতক্ষণ না আপনারা এগিয়ে আসছেন ততক্ষণ আমার মত পুরুষের কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে।

স্বরাজের অর্থ হল যারা পতিত তাদের বন্ধনমুক্তি।[১৫৩]

এই বোনেদের (বরিশালের পতিতাদের) সঙ্গে আমি যে দু ঘণ্টা কাটিয়েছিলাম তা আমার এক মূল্যবান স্মৃতি। তাঁরা আমাকে বলেন যে, কুড়ি হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা ৩৫০। তাঁরা বরিশালের পুরুষদের লজ্জার চিহ্ন। আর যত তাড়াতাড়ি বরিশাল থেকে এ মুক্ত হবে ততই তার মহান নামের পক্ষে ভাল। আমার ভয় হয় যে, বরিশালের পক্ষে যা সত্য, প্রত্যেক শহরের পক্ষেই তা হয়ত সত্য। এই বোনেদের কিছু সেবা করতে পারার যে চিন্তা তার কৃতিত্ব বরিশালের কয়েক-জন যুবকের। আমি আশা করব যে, বরিশাল শীঘ্রই এই পাপ দূর করতে পারার কৃতিত্বের দাবি করতে সক্ষম হবে।[১৫৪]

পাঠকেরা জেনে আনন্দিত হবেন যে, বরিশালের পতিতা বোনেদের

উদ্ধারের কাজ খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে করা হচ্ছে। ডঃ রায় লিখেছেন যে, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই দেখা করা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে সুতা কাটার প্রচলন হয়েছে। জগদীশবাবু যিনি বহু বছর ধরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের বিদ্যালয়ের কাজ চালাচ্ছেন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যেসব তরুণ কর্মী এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ করছেন তাঁদের তিনি পরিচালনা করবেন। আমি আশা করি যে, যাঁরা এই অতি প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নিয়েছেন তাঁরা এটিকে আধখানা করে ছেড়ে দেবেন না। ব্যর্থতার জন্য তাঁরা প্রস্তুত থাকবেন, ধীর প্রগতিও তাঁরা প্রত্যাশা করবেন। একমাত্র এইজাতীয় কাজই উত্তেজনা থেকে মুক্ত এবং সেবার প্রতি কারও ভালবাসা এই রকম কাজে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বরিশালের দৃষ্টান্ত অন্য সমস্ত শহরের সামনে আমি তুলে ধরেছি। এই শুদ্ধিকরণের কাজ স্বরাজের পরেও চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকেই এই কাজের যোগ্য নয়। যাঁরা এই কাজের আহ্বান নিজেদের অন্তরে অনুভব করবেন এবং যাঁদের প্রয়োজনীয় পবিত্রতা আছে তাঁরা এই ক্রমবর্ধমান পাপ দূরীকরণের কাজে তাঁদের মন দেবেন। স্বভাবতই এই কাজের দুটি দিক আছে, একটি হল পতিতা বোনেদের উদ্ধার করা আর দ্বিতীয়টি হল, এই কলঙ্কজনক পাপাভ্যাস, যার ফলে পুরুষ তার বোনেদের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকায় এবং তাকে তার শিকারে পরিণত করে তা থেকে পুরুষদের মুক্ত করা। দুটি কাজের জন্য সমান যোগ্যতা দরকার এবং কাজটিকে যদি ফলপ্রদ করতে হয় তবে একই সঙ্গে দুই দিকে কাজ করা উচিত।[১৫৫]

নোয়াখালিতে আমাকে বলা হয়েছিল যে, দুজন পতিতা বোন যে কেবল সুতা কাটছেন তা নয় তাঁরা সম্পূর্ণভাবে এর দ্বারাই তাঁদের জীবিকানির্বাহ করছেন। এঁরা যুবতী নন, এঁদের বয়স চল্লিশের উপর। তাঁরা আর তাঁদের লজ্জা বিক্রি করতে পারতেন না, সুতা না কাটলে তাঁদের ভিক্ষা করতে হত। সুতরাং যথার্থভাবে বললে তাঁদের ভিক্ষাবৃত্তি থেকেই মুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের পেশা থেকে সরিয়ে আনা হয়নি। যাই হোক নোয়াখালির পক্ষে এটি খুবই বড় কথা যে, এই সব বোনেদের সংস্পর্শে সে এসেছে এবং তাঁদের কল্যাণের কাজে মন দিয়েছে। আমাকে একথাও বলা হয়েছে যে, এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা তাঁদের বৃত্তি ত্যাগ না করলেও সুতা কাটেন। আমি জানি না যে এই বৃত্তি ত্যাগ করে সুতা কাটা তাঁদের কাছে লাভদায়ক মনে হবে কি

না। তাঁদের লজ্জা ঢাকবার জন্যও একে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে এই বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনযাপনের মাধ্যমরূপে সুতা কাটাকে তাঁদের কাছে সুপারিশ করা যায় না। তাঁরা দিনে এক টাকা, কি দু টাকা, হয়ত বা তার চেয়েও বেশি আয় করে থাকেন। তাঁদের তাঁত বোনা, এমন কি এমব্রয়ডারী অথবা অন্য কোন সূক্ষ্ম কাজ করতে হবে যাতে তাঁরা মোটামুটি ভাল পারিশ্রমিক পেতে পারেন। আর এই সমস্যার সমাধান পুরুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। মেয়েদেরই এগিয়ে এসে এই কাজ করতে হবে। যতক্ষণ না কোন নারী অসামান্য পবিত্রতা এবং চারিত্র্য শক্তি নিয়ে এই পতিত মানবতার উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করছেন ততক্ষণ পতিতা বৃত্তির সমস্যার সমাধান করা যাবে না। অবশ্য পুরুষেরা সেই সব পুরুষদের মধ্যে কাজ করতে পারেন যাঁরা যুবতী মেয়েদের তাঁদের লালসার কাছে বিক্রি করার জন্য প্ররোচিত করে নিজেদেরও অধঃপতিত করেন। পতিতা বৃত্তি পৃথিবীর মত পুরাতন। কিন্তু আজ শহরজীবনে তা যেমন নিত্য ব্যাপার হয়ে গিয়েছে, আগে তা ছিল কি না তা আমার জানা নেই। যাই হোক সময় একদিন আসবে যখন মানবতা এই অভিশাপের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে এবং পতিতা বৃত্তিকে অতীতের জিনিস করে দেব। প্রাচীন হলেও এই রকম অনেক অভ্যাস থেকেই তো আমাদের মুক্ত হতে হবে।[১৫৬]

## সরকারী অত্যাচার

গত ৮ই জানুয়ারী (১৯২২) কলকাতায় যে একশত স্বেচ্ছাসেবক বেরিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে পঁয়ত্রিশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আর বাকি যাঁদের এইভাবে সম্মানিত করা হয়নি তাঁদের নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয় এবং তাঁদের নিজেদের জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদল স্বেচ্ছাসেবক ধর্মতলা স্ট্রীটে মদের দোকানের কাছে তাঁদের কর্তব্য করছিলেন। একজন ইউরোপীয়ান সার্জেন্ট তাঁদেরও গুরুতররূপে প্রহার করে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এত বেশি আঘাত পান যে তাঁরা মাটিতে পড়ে যান। তখন তাঁদের লাথি মারা হয়। তাঁদের একজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আর একদল যাঁরা বৌবাজারে ছিলেন তাঁদের চাঁটি ও ঘুষি মারা হয়।[১৫৭]

## কংগ্রেসীদের মধ্যে বিরোধ

আমি যখন কলকাতার বড়বাজারের গোলমাল যার পরিণামে কংগ্রেসীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছিলেন, তার বিবরণ পড়ি তখন আমি তা বিশ্বাস করতে চাইনি। কিন্তু কংগ্রেসীদের কাছ থেকে তিনটি চিঠি আমি পেয়েছি। তাঁরা প্রায় সকলেই সভায় মারামারি হতে দেখেছেন। আর এই মারামারি কংগ্রেসের কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য হয়নি, তা হয়েছে কমিটি দখল করা নিয়ে। যাঁরা এই তিনটি চিঠি লিখেছেন তাঁরা পরিচিত 'নো-চেঞ্জার্স' (কংগ্রেসের নীতির পরিবর্তন যাঁরা চান না—ভ প্র. চ.)। চিঠিগুলি কোন একটি বিশেষ দলের দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, স্বরাজ্য দলের লোকেদের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে নো-চেঞ্জার্সদের দোষারোপ করত। আমাকে যা বিব্রত করে তা হল অহিংসার দাবি করে এমন এক প্রতিষ্ঠানের গদি দখল করবার জন্য কোন পক্ষ হিংসার আশ্রয় কি করে গ্রহণ করে! চিঠির লেখকেরা নিজেদের 'আমার অনুগামী' বলে জানিয়েছেন। 'আমার অনুগামী' বলে নিজেদের অভিহিত করার মধ্য দিয়ে তাঁরা যদি নিজেদের অহিংসার পূজারী বলে দাবি করেন, তবে তাঁরা সব রকমের সংঘাতকে এড়িয়ে চলবেন। সুতরাং কংগ্রেসের গদিই হোক অথবা তার কোন সমিতিই হোক, তা দখল করার জন্য তাঁরা মারামারির আশ্রয় নিতে পারেন না। আমার পত্রলেখকেরা বলেছেন যে, যদিও নো-চেঞ্জাররা দলে বেশি ছিলেন তবু স্বরাজীরা তাঁদের সভা বন্ধ করে অথবা ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। এই অভিযোগ সত্য বলে ধরে নিলেও এর প্রতিবিধানের জন্য অহিংস পথ নো-চেঞ্জারদের সামনে খোলা ছিল। তাঁরা স্বরাজীদের সভায় যোগদান না করে কর্মসূচী অনুসরণের জন্য নিজেদের প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারতেন—কর্মসূচীই তো তাঁরা অনুসরণ করতে চান, কংগ্রেসের গদি দখল তো তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি যে, নো-চেঞ্জাররা যদি কাজ করেন তবে স্বরাজীদের কাছে তাঁরা নিজেদের অপরিহার্য করে তুলবেন। ঈশ্বর এক, লক্ষ্য এক এবং উপায়ও এক। ব্যাধিগুলির মধ্যে ঐক্য যখন আছে, প্রতিকারের মধ্যেও তাহলে একতা থাকবে। গভর্নমেণ্টই হোক অথবা স্বরাজীই হোক, পরমফলপ্রদ একটিই প্রতিবিধান আছে, তা হল অহিংস অসহযোগ। সুতরাং 'আমার অনুগামীরা' নিজেদের প্রতিষ্ঠান গঠন করবেন, কথা বলবেন না। সেবার মধ্য দিয়ে জাতির অন্তরে তাঁদের

স্থান গ্রহণ করে নিতে হবে। নো-চেঞ্জারদের প্রতি আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি। কেননা তাঁরা বিবাদীপক্ষ এবং তাঁরা 'আমার অনুগামী' বলে নিজেদের অভিহিত করেছেন। স্বরাজীদের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ আমি বিশ্বাসও করছি না, অবিশ্বাসও করছি না। স্বরাজীদেরও আমি আমার অনুগামী বলে গণ্য করি, কেননা নো-চেঞ্জারদের মত তাঁরাও কংগ্রেসের নীতির পূজারী বলে সমান দাবি করেন। তাঁরা যদি নিশ্চয় করে বলেন যে, তাঁরা অন্যায় করেননি—আর এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সেকথা বলবেন—তবে 'আমার নো-চেঞ্জার অনুগামীদের' যে প্রতিবিধানের পরামর্শ আমি দিয়েছি তাঁদেরও সেই কথা আমি বলব। 'আমার অনুগামীরা' অপর পক্ষের সাড়ার অপেক্ষা রাখেন না, কেননা তাঁরা প্রতিশোধ নেন না। যাঁরা তা করেন না তাঁরা কোন প্রতিদানও পান না। সুতরাং তাঁরা কখনো আঘাত পান না। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যিনি সুতা কাটেন অথবা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য যিনি কাজ করতে চান অথবা হিন্দু হলে যিনি অস্পৃশ্যতা দূর করতে চান, তাঁর কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। প্রতিষ্ঠান তাঁকে চাইতে পারে এবং যেখানে তাঁকে চাওয়া হবে সেখানেই তিনি আনন্দের সঙ্গে তাঁর সেবা দেবেন। একজন স্বরাজী বন্ধু আমাকে বলেছেন যে, মহারাষ্ট্রে নো-চেঞ্জার স্রেফ গায়ের জোরে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখেছেন এবং বেরারে তাঁরাই ঘুষোঘুষি শুরু করেন। তা যদি হয় তবে নো-চেঞ্জারদের আমি ক্ষমা চাইতে এবং যেখানে তাঁরা গায়ের জোরে অথবা অন্যায়ভাবে অফিস দখল করে আছেন সেইগুলি ছেড়ে দিতে বলব। সেই সঙ্গে তাঁদের কাজ করে যেতেও আমি বলব। পিছনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা না থাকলে কেউ ভালভাবে কাজ করতে পারে না, এ কথা বিশ্বাস করা কুসংস্কার মাত্র।[১৫৮]

## তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ

তারকেশ্বরের অবস্থা সম্পর্কে আমি অনেকগুলি টেলিগ্রাম পেয়েছি। ছুটিতে আমাকে সেখানে গিয়ে উপদেশ দেবার কথা বলা হয়েছে। কেবল কষ্টকর যাত্রার পক্ষে আমি খুবই দুর্বল বলেও আমার যাওয়ার এখন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভাইকমের সম্পর্কে আমি যা বলেছি সাধারণভাবে তারকেশ্বরের সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। দখল নেবার জন্য কোনরকম শক্তিপ্রয়োগ, এমন কি শক্তির প্রদর্শনও থাকা উচিত নয়। রেলের লোকদের দৌড়ানো এবং

ট্রেনের গতিকে আটকানো ( ঘটনাগুলি যদি সত্য হয় ) যে কেবল সত্যাগ্রহ নয় তা নয়, এইভাবে প্রতিরোধ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কোন মহন্ত যদি অনৈতিক হয়েও থাকেন তবু তাঁকে তাঁর দখল থেকে সরাসরি এবং জোর করে বরখাস্ত করা যায় না।[১৫৯]

## গঠনকর্মীদের প্রতি

[ বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষিত গঠনকর্মীরা আছেন। তাঁদের ত্যাগ ও নিষ্ঠা প্রচণ্ড। তবু বাংলা দেশ বিচ্ছিন্ন কেন? এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে মালিকান্দায় গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশনে গান্ধীজী বলেছিলেন। ]

সমস্ত বিরোধী চরিত্রে মিশ্রণের বিস্ফোরণ হতে বাধ্য। মিলিতভাবে কাজ করার মনস্থির আপনাদের করতেই হবে। মৌল সত্য নয় এমন বিষয়গুলিতে যেমন আপস করার জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকা উচিত তেমনি সত্যের সঙ্গে আপস করার অসন্তোষজনক পরিস্থিতিতে আপনাদের কখনই পড়া উচিত নয়। এই রকম অবস্থা থেকে আপনাদের সরে দাঁড়ানো উচিত। এইটিই হল আপসের সার তত্ত্ব। কাছের অথবা দূরের কোন লক্ষ্য ছাড়াই সেবা করে যাওয়া আপনাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। চারিদিকের দারিদ্র্যের দ্বারা আপনারা পরিবেষ্টিত। ব্যথায় যারা উৎপীড়িত, তারা মুসলমান হোক, নমশূদ্র হোক অথবা আর কিছু হোক তাদের আপনারা সেবা করুন। সত্যাগ্রহ দল এবং জাতি ও ধর্মের বিভেদকে অতিক্রম করে যায়। সত্যাগ্রহ আমাদের সমগ্র সত্তা ও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে। কংগ্রেসের সদস্যভুক্তি করার সমস্যা আপনাদের নেই। আপনাদের তালিকাবৃদ্ধির জন্য সদস্য গ্রহণের চিন্তা আপনারা দূর করুন। একেই দলাদলির রাজনীতি বলা হয়। ভূয়ো সদস্যদের দ্বারা তালিকাকে কলুষিত করার চেয়ে কোন তালিকা না থাকাই আমি পছন্দ করি। এইভাবে আপনারা যদি নীরব কর্মী হয়ে যান তবে কংগ্রেসের মধ্যে না থেকেও আপনাদের যে কোন একজন প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করবেন।

আশা করি একথা এখন আপনারা বলবেন না যে, বিরোধীরা যদি কংগ্রেস দখল করে নেয় তবে কী হবে? উপনিষদের শিক্ষা আপনরা জানেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। কংগ্রেসকে উপভোগ করার জন্য অথবা তাকে পাবার জন্য তাকে এখন আপনারা ত্যাগ করুন। এই

মুহূর্তে এক ধরনের অধিকারের কথা আমার মনে রয়েছে। কংগ্রেসের উপর অধিকার বজায় রাখার জন্ত কোন রণকৌশল রচনার প্রয়োজন আপনাদের নেই, সত্য পথ থেকে নেমে আসার প্রয়োজনও আপনাদের নেই, তা হলেই আপনারা বিরোধীদের নিরস্ত করে দেবেন। কাগজের নৌকা যেমন পদ্মা পার করতে আপনাদের সাহায্য করে না, তেমনি কংগ্রেসের ভুয়ো তালিকা আপনাদের স্বরাজের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।[১৬০]

## স্মারক-ভ্রমণ

বাংলা দেশে এখন আমি যে ভ্রমণ করছি তা স্মারক-ভ্রমণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান মুহূর্তে এবং যতক্ষণ না দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হচ্ছে ততক্ষণ কলকাতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে আমি রাজী নই। কিন্তু যেসব জেলায় যাবার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম তাঁদের আমি নিরাশ করতে চাই না। তবে লোকেদের আমি সাবধান করে দিয়েছি যে, এইবার আমার ভ্রমণ হবে দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে টাকা তোলা এবং তাঁর বাণী প্রচার করার উদ্দেশ্যে। তবু স্মৃতির উদ্দেশ্যে হলেও এই ভ্রমণ করতে পারার জন্ত আমার আনন্দ হচ্ছে। প্রত্যেক জায়গাতেই গরীব লোকেরা—পুরুষ ও নারী—অদ্ভুত-ভাবে সাড়া দিয়েছেন। তাঁদের খোশামোদ করার দরকার হয়নি। চাওয়া মাত্রই তাঁরা সবটা দিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় বয়স্কা বিধবাদের তাঁদের কাপড়ের কোণ থেকে গিঁট খুলে সর্বস্ব দিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে। আমার প্রায়ই এই দান ফিরিয়ে দেবার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বার চিন্তা করে আমি নিজেকে এই বিষয়ে কেবল শান্তই করিনি উপরন্তু আমার মনে হয়েছে যে, এই দান গ্রহণ করা আমার আনন্দদায়ক কর্তব্য। দেশবন্ধু কি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে দেননি ? এবং হাসপাতালটি কি দুঃস্থা মেয়েদের জন্ত হবে না ? যে প্রতিষ্ঠানটি শীঘ্রই স্থাপিত হবে তাতে কি কয়েক-জন গরীব বিধবা নার্সিং শিক্ষা পাবেন না ? ভাল কাজের জন্ত যিনি সর্বস্ব দান করেন ভগবান তাঁকে দশগুণ পুরস্কৃত করেন—এই ঈশ্বরীয় বিধানের প্রতি কেন আমি সন্দেহ প্রকাশ করব ? মফস্বলে মেয়েদের সভায় গহনা পাবার জন্ত আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু কোন জায়গাতেই আমার বোনেরা গহনা দিতে বিমুখ হননি। সিরাজগঞ্জে দুজন তো ভারী ভারী হার দিয়েছিলেন।…

## দারিদ্র্যের চিহ্ন

বিভিন্ন দিক থেকে এই সংগ্রহ অধ্যয়ন করার জিনিস। এ হল জনগণের দারিদ্র্যের প্রদর্শন। হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে আমি দান সংগ্রহ করছি। প্রত্যেক সভায় তামার পয়সা স্তূপীকৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও তাঁরা আধ পয়সাও দিয়েছেন। এর কারণ এই নয় যে, তাঁরা বেশি দিতে ইচ্ছুক নন, বরং আমি যতটা জানি, তাঁদের অন্য কোন মুদ্রাই নেই। তাঁরা আমার সামনে তাঁদের কাপড়ের গিঁট অথবা পকেট উজাড় করে দিয়েছেন।

## নীরব কর্মী

সিরাজগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদি আমরা একটি ধীরগতির ট্রেনে যাচ্ছিলাম। এটি শাখা লাইন। প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর স্টেশন। প্রত্যেক স্টেশনে গ্রামবাসী শত শত সংখ্যায়, কোন কোন জায়গায় হাজারে হাজারে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাদের পয়সা দিয়েছিল। বাংলার নীরব স্বার্থত্যাগী যুবকেরা এই মহান প্রদর্শনগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের নাম কোনদিন কাগজে উঠবে না। তাঁরা নিজেরাও বোধ হয় বিজ্ঞাপিত হতে চান না। তাঁদের মূল্যবান কাজই তাঁদের বিজ্ঞাপন। তাঁরা না থাকলে গ্রামবাসীরা কিছুই জানত না। এই যুবকেরা গ্রামবাসীদের চলন্ত সংবাদপত্র। কেননা তারা লিখতে পড়তে জানে না। আর যারা পড়তে জানে তারাও এত গরীব যে, খবরের কাগজ কিনতে পারে না। ভারতবর্ষের এই বীর, স্বার্থত্যাগী সেবকেরা সম্মানের অধিকারী। এই সব স্টেশনের প্রত্যেকটি সভা খুবই শৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবে, কোলাহলহীন, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ব্যবসায়ী ঢঙ্গে হয়েছিল। এই যুবক দেশপ্রেমিকদের মাধ্যমে স্বরাজ অবশ্যই আসবে।......

## উৎসাহজনক নয়?

এই স্মারকের উদ্দেশ্য উৎসাহজনক নয়, এই অভিযোগের উত্তর আমি স্থানে স্থানে দিয়েছি। সংশয়ীদের কথা থেকে বোঝা যায় যে, এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু তাঁদের আমি মনে করিয়ে দেব যে, স্বাক্ষরকারীদের কাছে নির্বাচনের কোন প্রশ্ন ছিল না। যাঁরা দেশবন্ধুর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করতে চান তাঁদের দেশবন্ধুর ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা না করে

উপায় নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের কাছে দেশবন্ধুর স্মৃতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হলে তাঁর ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই প্রাথমিক কর্তব্য। দেশবন্ধু যখন তাঁর সম্পত্তি একটি ট্রাস্টের হাতে দিয়ে দেন তখন তিনি কী করছেন তা জানতেন। তিনি ইচ্ছা করেই এটিকে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দান না করে দাতব্য কাজে দিয়েছিলেন। সুতরাং উত্তরজীবীরা জাতির পক্ষে এই বাড়িটিকে কেবল সংগ্রহ করে নিতেই বাধ্য ছিলেন না উপরন্তু দাতার ইচ্ছাকে কার্যান্বিত করতেও তাঁরা বাধ্য ছিলেন। অতএব আমার মতে এই বাড়িটিকে মেয়েদের হাসপাতাল এবং নার্সিং শেখার কাজে ব্যবহার করাই হল বাংলা দেশের পক্ষে সম্মানজনক কর্তব্য। আমি শুনেছি যে বাঙালীরা স্থানীয় স্মারকের জন্য টাকা সংগ্রহ করছেন। আমি আশা করি যে প্রত্যেক শহরে এই মহান দেশসেবকের উপযুক্ত স্মারক থাকবে। কিন্তু এখন সে সময় নয়। আমার বিনীত মত হল এই যে, যেসব বাঙালী দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁদের কর্তব্য হল স্মারকের জন্য এক পয়সাও না রেখে নিখিল বঙ্গ স্মারকের জন্য তাঁদের প্রতিশ্রুত দশ লক্ষ টাকার তহবিল পূর্ণ করা। বাংলা দেশের বাইরের বাঙালীরা সাবধান হন। তাঁরা তাঁদের দেয় এখনো পর্যন্ত দেননি। সমস্ত বাঙালী যাঁরা দেশবন্ধুকে জানতেন তাঁরা যদি চেষ্টা না করেন তবে এই অর্থসংগ্রহ অহেতুক বিলম্বিত হবে। সুতরাং আমি আশা করি যে, যেসব বাঙালী এই লেখা পড়বেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে অধিকতম চাঁদা সংগ্রহে সম্পূর্ণ চেষ্টা করবেন।[১৬১]

## স্মারক তহবিল

[ একজন সমালোচক প্রশ্ন করেছিলেন: আমার অভিজ্ঞতায় দেখছি যে, আপনি অনেকগুলি তহবিলের চাঁদা সংগ্রহের জন্য দায়ী; যেমন, জালিয়ানওয়ালা বাগ, সত্যাগ্রহ সভা, স্বদেশী, স্বরাজ, আর এখন আপনি দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলের জন্য বাংলা দেশে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। আগের তহবিলগুলি সুব্যবস্থিত হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন, এবং দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলও ভালভাবে ব্যবস্থিত হবে বলে কি আপনার বিশ্বাস?—উত্তরে গান্ধীজী প্রসঙ্গত নিচের কথাগুলি বলেন। ]

এখন দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলের কথায় আসা যাক। এই তহবিলের কোষাধ্যক্ষ নিজে একজন অতিথিসেবক। তবে তিনি চিরকাল এটি ধরে রাখবেন না। শেষ পর্যন্ত এটি ট্রাস্টিদের হাতে যাবে। মূল যে পাঁচজন ট্রাস্টি

তাঁদের লোকান্তরিত দেশসেবক নিজে মনোনীত করেছিলেন, সমাজে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিষ্ঠা আছে, হারাবার মত খ্যাতিও আছে। তাঁদের কয়েকজন অর্থশালী ব্যক্তি। এই মূল পাঁচজন ট্রাষ্টি আরও দুজন নতুন ট্রাষ্টি নিয়েছেন। এই ব্যক্তিরাও একটি নয়, অনেক পাবলিক ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের এক জন স্যার নীলরতন সরকার, কলকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক এবং অন্য জন মিঃ এস আর. দাশ, যিনি দেশবন্ধুর নিকট-সম্পর্কিত ভাই, বাংলা দেশের এডভোকেট জেনারেল। এই সাতজন ট্রাষ্টি যদি ভালভাবে কাজ করার যোগ্য না হন এবং যে ট্রাস্টের দায়িত্ব তাঁদের উপর দেওয়া হয়েছে তার প্রতি ন্যায়-বিধান করতে না পারেন তবে ভারতবর্ষে কোন ট্রাস্ট সফল হবে বলে আমার ভরসা হয় না। বাড়িটি রয়েছে এবং আমি জানি যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, যিনি অন্যতম চিকিৎসক—ট্রাষ্টি এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার, তিনি এটিকে অভিপ্রেত কাজে লাগাতে যাচ্ছেন। আমাকে চুপিচুপি বলা হয়েছে যে, বাংলার এডভোকেট জেনারেল হওয়ার ফলে মিঃ এস আর. দাশ বোধ হয় এর ট্রাষ্টি হতে পারবেন না। এই ব্যাপারে আইন কী বলে তা আমার জানা নেই। আমি জানি যে, যখন তাঁকে ট্রাস্টে নেওয়া হয় তখনই তিনি এডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তবে ভুলক্রমে যদি তা হয়ে থাকে তবে তাঁর স্থানে আর একজন ট্রাষ্টি নিতে হবে যাঁর খ্যাতি তাঁর অনুরূপ হবে। মিঃ এস. আর দাশ যদি ট্রাষ্টি থাকেন তবে তাঁকে জানার এতটা সৌভাগ্য আমার হয়েছে যে, পাঠকদের এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যে ট্রাস্টের পরিচালনাকে সম্পূর্ণ সফল করতে তিনি কিছুমাত্র অবহেলা করবেন না। সম্প্রতি ইংলণ্ডে যাবার আগে পর্যন্ত ট্রাস্ট তাঁর মন অধিকার করেছিল। কিন্তু আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, মূল ট্রাষ্টির প্রত্যেকে পরলোকগত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সমানভাবে সতর্ক এবং তাঁরা প্রস্তাবিত হাসপাতাল ও নার্সিং শিক্ষণ-কেন্দ্রকে তাঁর স্মৃতির উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন।[১৬২]

## মেদিনীপুর জাতীয় সরকার

এই কথা আমি বলতে পারি না যে, যা কিছু করা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে অথবা তা করা উচিত ছিল। পক্ষান্তরে, এর অনেক কিছুই করা উচিত ছিল না। লোকেরা যে নিষ্ক্রিয় ছিল না সেটি সন্তোষের কথা, কিন্তু এত বছর

পরেও কংগ্রেস কী চায় তারা তা জানত না এই ঘটনাটি খুবই দুঃখের। তারা যা করেছিল তা অবিবেচনাপ্রসূত। এর প্রকৃতির জন্যই একে সমর্থন করা যায় না।

আপনারা আপনাদের বিবরণে কিভাবে রেলের লাইন উপড়ে ফেলেছিলেন, রাস্তা ব্যবহারের অযোগ্য করেছিলেন, কাছারী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, থানা দখল করেছিলেন, সমান্তরাল গভর্নমেণ্ট গঠন করেছিলেন প্রভৃতির কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অহিংস কাজের এটি কৌশল নয়। লোকেরা এই ভুল করেছিল যে, যাতে হত্যা করা হয় না তাই বুঝি অহিংসা। কখনো কখনো হত্যা হিংসার পরিচ্ছন্নতম অংশ হয়ে যায়। কোন অন্যায়কারীকে যদি আপনারা সোজাসুজি মেরে ফেলেন তবে অন্তত তার ব্যাপারে সেইখানেই ঘটনার অবসান হয়ে যায়, কিন্তু তাকে বিরক্ত করা আরও খারাপ। এতে অন্যায় বন্ধ হয় না বরং এর দ্বারা অন্যায়কে আমরা নিজেদের দিকে টেনে নিই। কর্তৃপক্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যায়। আপনারা হয়ত বলবেন যে তাঁরা যে-কোন কারণেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যেতেন। কিন্তু আমরা তা চাইব না, অথবা আমাদের লক্ষ্যও তা হবে না। তাঁদের আতঙ্কগ্রস্ত করে আমাদের কোন লাভ হয় না।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কর্তৃপক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা তাদের সেই অজুহাত দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা হলেন সেই লোক যাঁরা পরাজয় জানেন না, তাঁদের ভীরুতা মৌলিক ছিল না। সেজন্য তাঁরা থানা, কাছারী, পঞ্চায়েত, কোর্ট প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য খেলনার মত আপনাদের হাতে থাকতে দিয়েছিল এবং যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের মেজাজ ঠিক করে নিয়েছিলেন সেই মুহূর্তেই তাঁরা প্রতিহিংসার সমস্ত যন্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন! ভারতবর্ষ এই পথে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না। এই জিনিসের পুনরাবৃত্তি আমরা করতে পারি না।

আজ আপনাদের কেবল ব্রিটিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে না, করতে হবে বৃহৎ ত্রি-শক্তির সঙ্গে। তাদের অস্ত্র দিয়ে তাদের সঙ্গেই আপনারা সংগ্রাম করতে পারেন না। এটম বোমকে ছাড়িয়ে তো আর আপনারা যেতে পারবেন না। সব রকমের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য হিংস্র অভ্যুত্থানের মত জীর্ণ অস্ত্রের পরিবর্তে নতুন কোন অস্ত্র যদি আমাদের না থাকে তবে পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির কোন আশা নেই।[১৬৩]

**শঙ্খধ্বনি**

বাংলা দেশে এই প্রথা আছে যে, যখন কোন লোককে অভ্যর্থনা করা হয় অথবা কোন শুভক্ষণে কাউকে বিদায় দেওয়া হয় তখন শঙ্খধ্বনি করা। এটিকে এক শুভ লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হয়। যখন স্ত্রীলোকেরা তাঁদের স্বামী, পুত্র বা পিতাকে গ্রেপ্তার করা হলে কান্না ত্যাগ করেন এবং তার পরিবর্তে সেই ঘটনায় আনন্দধ্বনি করেন এই কথা জেনে যে, তাঁদের কারাবাস দেশের ও ধর্মের সেবা করবে তখন তার মধ্যে আমরা ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ দেখতে পাই। সুতরাং এই শঙ্খধ্বনির মধ্যে আমি ভারতবর্ষের বিজয় দেখতে পাচ্ছি।[১৬৪]

# পরিশিষ্ট—ক

## পত্রগুচ্ছ

১

আগস্ট ১০, ১৯১৮

প্রিয় মিঃ ব্যানার্জী,

আমেদাবাদ থেকে ঘুরে আসা আপনার টেলিগ্রাম আমি পেয়েছি। বর্তমানে আমি এখানে সৈন্য ভর্তি করার কাজে ব্যস্ত রয়েছি। কলকাতায় যাওয়ার মানে হল যেতে আসতেই কমপক্ষে সাত দিন ব্যয় করা। আমাকে যদি ভালভাবে কাজ করতে হয় তবে এই দীর্ঘ সময় আমার পক্ষে অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। আর এখন তো আমি তা করতে পারি না, কেননা এইমাত্র আমি শুনলাম যে, গভর্নমেণ্ট গুজরাটে একটি শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলার এবং একটি গুজরাট বাহিনী খোলার আমার প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েছেন। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, এই কাজ আমি ছাড়তে পারি না।

তবু, আমি যেতে পারলেও বেশি সহায়তা আমি করতে পারতাম বলে আমার মনে হয় না। আমার যা দৃঢ় এবং বিচিত্র অভিমত তার সঙ্গে অনেক নেতাই একমত নন। আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছি যে, আমরা যদি অনন্যমনে সৈন্য ভর্তির কাজে মনোনিবেশ করি তবে আগে না হলেও অন্তত এক বছরের মধ্যে আমরা পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট লাভ করব। এবং আমাদের একেবারে অজ্ঞ দেশবাসীকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সৈন্য-বাহিনীতে নাম লেখাতে না দিয়ে আমরা স্বাধীন দেশের বাহিনী পাব, যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করছে এই জ্ঞান নিয়ে ইচ্ছুক সৈন্য হতে পারবে। এই কথাও আমি বিশ্বাস করি যে, মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের মতামত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদের ঘোষণা করা উচিত। আমাদের ন্যূনতম দাবি আমরা ঠিক করে নেব এবং তা পাবার জন্য সর্বপ্রযত্নে আমরা চেষ্টা করব। আমি মনে করি যে, পরিকল্পনাটি মোটামুটিভাবে ভাল। তার যথেষ্ট সংস্কারের প্রয়োজন। একটি সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের কোন অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। আমি চাই যে, দেশে শুধু এই দুটি প্রস্তাব নিয়ে কাজ

করতে অঙ্গীকৃত একটিমাত্র দল থাকবে যে একদিকে যুদ্ধের কাজে গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করবে এবং অন্যদিকে জাতীয় দাবিগুলিকে জোরদার করে তুলবে।

এখনকার মত সঙ্কটকালে তথাকথিত চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা একে অপরের স্বার্থে কিছু ছেড়ে দিয়ে ভাসাভাসা সন্ধি করবেন এবং তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত হবে, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমি চাই যে প্রত্যেক গোষ্ঠী বা দল তাঁদের নীতি স্পষ্ট করে ঘোষণা করুন। স্বভাবতই যাঁরা তাঁদের নীতির যথার্থ গুণের দ্বারা এবং অবিরাম আন্দোলনের দ্বারা নিজেদের শক্তিশালী করে তুলবেন তাঁরা হাউস অফ কমন্সের সামনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।

ভবদীয়

এম. কে. গান্ধী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Collected Works, Vol. XV. p.14

২

আশ্রম

সবরমতী

মার্চ ১১, ১৯২৩

প্রিয় গুরুদেব,

আপনার দুটি টেলিগ্রামের—একটি বারাণসীর ঠিকানায় যেটি সেখান থেকে ঘুরে এখানে এসেছে এবং অন্যটি এখানকার ঠিকানায়—প্রাপ্তি স্বীকার এর আগে করতে আমি সক্ষম হইনি। আপনি আমন্ত্রণ* গ্রহণ করায় আমরা সকলে খুবই কৃতজ্ঞ। দেখাশোনা অথবা তামাশার দ্বারা আপনাকে ভারাক্রান্ত না করার সমস্ত চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনি কি দয়া করে জানাবেন, প্রয়োজন হলে টেলিগ্রাম করে যে, কতদিন আপনি গুজরাটে সময় দিতে পারবেন এবং দু-একটি বড় শহরে আপনি যেতে পারবেন কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল আপনার আবাস সম্পর্কে। আপনি কি আশ্রমে থাকবেন? আপনার আশ্রমে থাকার চেয়ে আমাকে আর কোন জিনিস বেশি আনন্দ দেবে না। আপনার অবস্থানের সময় আশ্রমটি কী এবং কিসের জন্য তা স্থাপিত তা আপনি জানুন, এই বিষয়ে আমি খুবই আগ্রহী। আশ্রমের যারা আপনার ছাত্র বলে দাবি করে তাদের আপনি আপনার উপস্থিতির দ্বারা উপকৃত করবেন, সে-বিষয়েও আমি আগ্রহশীল। গুজরাটী ছেলেমেয়ে এবং সিন্ধি বালক গিরিধারী, যাদের আপনি মনে করতে পারবেন তারা ছাড়াও মণীন্দ্র এখনও এখানে রয়েছে এবং সরলা দেবীর ছেলে দীপকও আশ্রমে আছে। আশ্রমটি আমেদাবাদের কেন্দ্রস্থল থেকে চার মাইল দূরে সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত।

সুতরাং আপনি আশ্রমে অথবা আধুনিক উপকরণ সম্বলিত একটি পৃথক বাংলোতেও থাকতে পারেন। আমার এ কথা বলার দরকার নেই যে, আপনার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রথম বিবেচনার বিষয় এবং আপনার ইচ্ছা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালিত হবে। কোন বিশেষ ব্যবস্থা অথবা জিনিস আপনি চান কিনা তা কি দয়া করে আমাকে জানাবেন?

ভবদীয়

এম. কে. গান্ধী

পুনশ্চ—পরিষদ ২রা এপ্রিল থেকে ৪ঠা এপ্রিল এই তিন দিন চলবে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* ১৯২০ সালের ২-৪ এপ্রিল আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ গুজরাটী সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ দেবার জন্য।

Collected Works, Vol XVII p. 86

৩

১০০।২ হ্যারিসন রোড
ডিসেম্বর ২৭, ১৯১৭

প্রিয় ডাঃ মৈত্র,

আমার মনে হয় শিবির ইতিমধ্যে ভরে গিয়েছে এবং সহস্রাধিক লোক বাইরে অপেক্ষা করছে। সুতরাং আমি খোলা জায়গায় সভা করার পরামর্শ দিচ্ছি। তাতে জনসাধারণ চারিদিকে বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকবে আর সভাপতি থাকবেন মাঝখানে এবং একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবেন। আমার মনে হয় এইটিই একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমরা জনতাকে সন্তুষ্ট করতে পারব এবং নিজেরা কাজে নামতে পারব। সেই অবস্থায় কাগজ পড়ে নেওয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এটি কেবল আমার পরামর্শ। আপনি যেমন ভাল বুঝবেন করবেন।

সাবজেক্ট কমিটির অধিবেশন এখনও চলছে এবং তারা স্বরাজ-প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করছেন। যাই হোক আমি সময়মত পৌঁছতে চেষ্টা করব।

ভবদীয়
এম. কে. গান্ধী

ডাঃ ডি এন. মৈত্র

১৪৮ রসা রোড
কলিকাতা
১৫ই আগস্ট ১৯২৫

প্রিয় বন্ধু,

আপনার ব্যবসায়ী ঢঙে লেখা চিঠি আমার ভাল লেগেছে। চরখার মধ্যে আপনি যথেষ্ট কাজ দেখতে পাবেন। এখনই সব শ্রেণীর লোককে আকৃষ্ট করার কথা আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। অন্তত এখনই আমি হিন্দুসভা আরম্ভ করব না। বিদ্যালয় পরিচালনা করা এবং ওষুধ-পত্রাদি দিয়ে সাহায্য করা কোন খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজ ভালভাবেই হতে পারে, অবশ্য যতক্ষণ তা সুতাকাটার সহায়তা করে। আপনি যদি কর্মীদের এমন শিল্পে নিযুক্ত করেন যাতে পয়সা আসে তবে তারা সুতাকাটায় অনন্য মনোযোগ দিতে পারবে না। কিন্তু সুতাকাটার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যদি তাঁত বোনাকেও যুক্ত করেন তবে অন্তিমে আপনি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক স্বাবলম্বী করতে পারেন। মধ্যবর্তীকালে, যারা সুতাকাটার বিকাশের জন্য সমস্ত সময় দেয় তাদের ভরণপোষণের জন্য দেশের কাছে আশা করতে পারেন। এমন সম্পত্তির কথা আপনি কিছুতেই চিন্তা করবেন না যা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেবে।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আপনি কী বলতে চেয়েছেন তা আমি জানি না। আপনারা নিজেরাই তো গ্রামে স্বরাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে জনগণকে আত্মনির্ভরশীল, নির্ভয়ী, স্বাবলম্বী, সম্পদশালী এবং স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলার কাজ করছেন। আমি যে গুণগুলির উল্লেখ করেছি স্বরাজের অর্থ এ ছাড়া আর কিছু নয়। মানব-হিতৈষী সমাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বর্জন করে থাকে। আপনি এটি পরিত্যাগ করবেন না, আবার মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করার জন্য এর কোন রকম আড়ম্বরও প্রদর্শন করবেন না।

যতক্ষণ না আপনার স্বাধীনতা বর্জন করতে হচ্ছে ততক্ষণ আপনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারেন। যতদূর সম্ভব গভর্নমেণ্ট-নিরপেক্ষভাবে নিজেদের জীবন গঠন করার মধ্যেই গ্রামবাসীদের অসহযোগ নিহিত। তারা যদি বিবাদ না করে এবং সালিশী

মেনে নেয় তবে তাদের আদালতে যেতে হবে না। সরকারী বিদ্যালয়েও তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

কর্মীদের মধ্যে যদি প্রকৃত অহিংস অসহযোগের চেতনা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের কথার দ্বারা নয়, বরং তাঁদের আচরণের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনে সেই মনোভাব সঞ্চারিত করতে পারবেন।

আমি স্বেচ্ছায় আমার ছেলেদের সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠাবার পক্ষপাতী নই। জাতীয় বিদ্যালয়গুলি যদি অসম্পূর্ণ হয় তবু সেগুলিকে উৎসাহিত করতেই হবে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ছেলেদের কোন যান্ত্রিক কৌশলের দ্বারা সরকারী বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে বিরত করার প্রয়োজন নেই। ছেলেরা নিজেরা যদি অপমানিত বোধ না করে তবে তাদের বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না।

অর্ধশিক্ষিত বলতে আপনি যদি সেই সব ভারতীয়দের কথা মনে করে থাকেন যারা শুদ্ধভাবে ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না তবে আমি বলব যে, আমি এই রকম অনেক লোক জানি যাদের মধ্যে উচ্চতম আদর্শ রয়েছে। এমন অনেক গ্রাজুয়েট আছে যাদের মধ্যে যত পারে পয়সা রোজগার করা ছাড়া কোন উচ্চতর আদর্শ নেই এবং তারা জনজীবন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পেরেছি কিনা জানি না।

ভবদীয়
এম. কে. গান্ধী

শ্রীযুক্ত জিতেন কুশারী
সত্যাশ্রম
পোঃ বাহেরক
ঢাকা

৫

সবরমতী থেকে

মে ২৪, ১৯৩১

প্রিয় সতীশবাবু,

ভোলানাথ সেন সম্পর্কে লিখিত আপনার দুঃখপূর্ণ চিঠি আমি পেয়েছি। হত্যার বিষয়ে আমি সব কিছু পড়েছি। আমি জানি যে, ছবি এবং লেখা দুটিই অনাক্রমণাত্মক ছিল। কিন্তু অভিযোগ ছিল এই যে, সেখানে পয়গম্বরের একটি প্রতিমূর্তি মুদ্রিত হয়েছিল। অবশ্য এটি ছিল এক নির্বোধ অভিযোগ, কিন্তু সরলমনা পাঠানদের তাতিয়ে দেবার পক্ষে সব কিছুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। এই রকম বিয়োগান্তক ঘটনায় সম্ভাব্য কোন প্রতিবিধান যখন আমরা উপস্থিত করতে পারি না তখন প্রার্থনা এবং একেবারে চুপ করে থাকা ছাড়া কোন ফলপ্রদ বিষয় আমার জানা নেই। হিন্দুদের হৃদয় যদি বিগলিত হয় তবে কাজ সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু তা বিগলিত হবার আগে তোমাকে এবং আমাকে এবং হয়ত আমাদের মত হাজার হাজার লোককে জীবন দিতে হবে। আর যাতে সেই জীবনদান পবিত্র আত্মত্যাগে পরিণত হতে পারে তাই দিনের পর দিন পবিত্রতর হবার জন্য বা সঠিকভাবে বললে প্রতি দিন কম অপবিত্র হবার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা করতে হবে। বাংলার অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা বর্ণনা করেছেন তাও দুঃখপূর্ণ। আমি আজ মুথারে ছিলাম, এখন ফ্রনটিয়ার মেলের জন্য অপেক্ষা করছি, যা আমাকে সুরাটে নিয়ে যাবে। খুব সম্ভব সুভাষবাবুও সুরাট পর্যন্ত যাবেন। আমি এখন পর্যন্ত তাঁকে দেখিনি। এই চিঠিটি স্টেশনে আমি মুখে মুখে বলে যাচ্ছি। সরদারের আদেশে আমি বরদৌলি যাচ্ছি। আমার গন্তব্যস্থান হল বরসাদ। কিন্তু কখন সেখানে আমি যেতে পারব তা আমি জানি না।

সুভাষ আমার সঙ্গে ট্রেনে রয়েছে।

ভবদীয়

বাপু

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

খাদি প্রতিষ্ঠান

সোদপুর ( কলিকাতার কাছে )

৬

নতুন দিল্লী

মার্চ ৩০, ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

আমার টেলিগ্রামের উত্তর পাবার জন্য আমি তোমার ২৫ তারিখের চিঠির উত্তর দিতে দেরি করেছি। গত রাত্রে সুনীলের টেলিগ্রাম পেয়েছি। এই উত্তরটি লেখার জন্য ভোর বেলার প্রার্থনার আগে আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি।

যখন তুমি মনে করছ যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি বাজে এবং ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি বিধিবহির্ভূত ও তার অধিকারের বাইরে তখন তোমার করণীয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কমিটি সম্পর্কে তোমার নির্বাচন অপরিস্কৃত হওয়া উচিত।

সুতরাং এই বিষয়ে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আর কোন প্রয়োজন নেই।

গত ফেব্রুয়ারীতে আমাদের সাক্ষাৎ হবার পর আমার এই মত আরও দৃঢ় হয়েছে যে, যেখানে মৌল বিষয়ে মতপার্থক্য সেখানে সবাইকে নিয়ে একটি কমিটি করলে ক্ষতি হবে, এই মতপার্থক্য যে আছে এ বিষয়ে আমরা এক মত হয়েছিলাম। সুতরাং তোমার নীতির প্রতি এ. আই. সি. সি.-র অধিকাংশের সমর্থন আছে ধরে নিয়ে যারা তোমার নীতিতে বিশ্বাসবান কেবল তাদের নিয়েই তোমার ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত।

হ্যাঁ, সেবাগ্রামে ফেব্রুয়ারী মাসে সাক্ষাতের সময় যে মত আমি ব্যক্ত করেছিলাম তা আমি সমর্থন করি যে স্বেচ্ছায় আত্মবিলুপ্তি থেকে ভিন্ন যে আত্মদমন, তোমাকে দিয়ে সেরকম কিছু করানোর অপরাধে আমি অপরাধী হবো না। দেশের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য যে নীতিকে তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর তার কোন রকম ন্যূনতা করলে তা তোমার পক্ষে আত্মদমন হয়ে উঠবে। সুতরাং সভাপতিরূপে যদি তোমাকে কাজ করতে হয় তবে তোমার পথে কোন রকম বাধা যেন না থাকে। দেশের যা অবস্থা তাতে কোন রকম মধ্য-পন্থার স্থান নেই।

গান্ধীবাদীরা (কথাটি ভুলভাবে ব্যবহৃত) তোমাকে বাধা দেবে না।

যেখানে পারবে সেখানে তারা তোমাকে সাহায্য করবে। যেখানে পারবে না সেখানে তারা বিরত থাকবে। তারা যদি অল্পসংখ্যক হয় তবে কোন রকম অসুবিধা হবে না। তারা যদি স্পষ্টতই অধিকসংখ্যক হয় তবে তারা চুপ করে নাও থাকতে পারে।

আমাকে যা দুঃখ দেয় তা হল এই যে, কংগ্রেসের ভোটার তালিকাটি বাজে। সুতরাং সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু কথার কোন মানেই নেই। যাই হোক যতক্ষণ না কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি পরিচ্ছন্ন হচ্ছে ততক্ষণ যা আমাদের এখন রয়েছে তাতেই কাজ চালাতে হবে। আর একটি বিষয় যা আমাকে দুঃখ দেয় তা হল আমাদের পরস্পরের প্রতি ভীষণ অবিশ্বাস। যেখানে কর্মীরা একে অন্যকে বিশ্বাস করে না সেখানে কাজ করা অসম্ভব।

আমার মনে হয় তোমার চিঠিতে উল্লেখিত আর কোন বিষয়ের উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।

তুমি যা কিছু কর ঈশ্বর যেন তোমাকে পরিচালিত করেন। ডাক্তারদের কথা শুনে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ।

ভালবাসা

বাপু

আমার দিক থেকে এই সব চিঠি প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তুমি যদি মনে কর প্রকাশ করতে পার।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

From A bunch of old letters written mostly to Jawaharlal Nehru, p. 367

৭

পাটনা

১৮-৪-৪৭

প্রিয় বন্ধু,

আপনার ৯ তারিখের চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ।

আমি আপনার বক্রোক্তি সমর্থন করতে পারি না। আমি কখনই সত্যকে চেপে যাওয়ার নীতিতে সম্মতি প্রদান করিনি। মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করাকে আমি মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য করি। প্রকৃত সংবাদ যদি অগ্নি-কাণ্ডের সৃষ্টি করে তবে বুঝতে হবে যে, সমাজের মধ্যে এবং তার নেতাদের ভিতর কোথাও গলদ আছে।

আমি যখন আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে পারার ব্যাপারে নিরাশ হয়েছি এবং নিজেও নোয়াখালির বাইরে অবস্থান করার ফলে অসহায় বোধ করেছি তখনই নোয়াখালি থেকে প্রাপ্ত তারগুলি আমি প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছি। নোয়াখালিতে আমার অবস্থান বোধহয় পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন করতে পারত না। কেবল এই সন্তোষ আমি লাভ করতাম যে, আমি নোয়াখালিতে রয়েছি এবং জনগণের ও আমার সহকর্মীদের কষ্টের অংশ গ্রহণ করছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত যে সব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন অতিরঞ্জন বলে তা আপনি বাদ দেবেন এতে আমি আশ্চর্য বোধ করেছি। অপরাধীরা হয়ত কোন দিনই ধরা পড়বে না। কিন্তু গৃহদাহ ও লুণ্ঠনের ঘটনা সম্পর্কে মতান্তর হবে না, যে সম্প্রদায় থেকে অপরাধীরা এসেছে তা নিয়েও মতবিরোধ হবে না। শাসকেরা গণতান্ত্রিক হোন অথবা স্বৈরতন্ত্রী হোন, বিদেশী হোন অথবা স্বদেশী হোন—তাঁরা যখন অপরাধ সম্পর্কে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না, এমন কি যখন অপরাধীরা ধরা পড়াকেও এড়িয়ে যেতে পারে তখন শাসন করার অধিকার তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।

ভবদীয়

এম. কে. গান্ধী

মিঃ এইচ. এস. সুরাবর্দী

চীফ মিনিস্টার, কলিকাতা

কলিকাতা

আগস্ট ১৯৪৭

প্রিয় অমিয়,

তোমার ক্ষতির জন্য আমি দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন ক্ষতি নয়। 'মৃত্যু হল শুধু নিদ্রা আর ভুলে যাওয়া'। এটি এত মধুর নিদ্রা যে, দেহ আর জেগে ওঠে না এবং স্মৃতির মৃত্যু-ভার অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হয়। যত দূর আমি জানি এখানে আমরা যেভাবে মিলিত হই পরজন্মে মিলনের সেই আনন্দ নেই। বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলি যখন বিলীন হয় তখন সেগুলি সমুদ্রের মহিমার অংশ গ্রহণ করে—এই সাগরেরই তো তারা অঙ্গ। বিচ্ছিন্নভাবে তারা মারা যায়, কিন্তু সেই মৃত্যু সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। জানি না তোমাকে কিছু সান্ত্বনা দেবার পক্ষে আমি নিজেকে যথেষ্ট পরিষ্কার করতে পেরেছি কিনা। ভালবাসা।

বাপু

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী

Life of Mahatma—Louis Fischer. p. 367

# পরিশিষ্ট—খ

## ব্রজেন্দ্রনাথ—গান্ধী : একটি মহান সাক্ষাৎ

১৯২৭ সালের কথা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন মহীশূরে থাকেন। গান্ধীজী সেই বছর ঠিক করলেন যে, চরখা ও দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের বাণী নিয়ে কয়েকটি প্রদেশ ঘুরে বেড়াবেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারেরা বললেন যে, ভাগ্যক্রমে তিনি অল্পের জন্য সন্ন্যাস রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হল। নন্দী পাহাড়ে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর গান্ধীজী জুন মাসের মাঝামাঝি বাঙ্গালোর শহরে নেমে এলেন। গান্ধীজীর বয়স তখন আটান্ন আর ব্রজেন্দ্রনাথের তেষট্টি।

কলকাতা থেকে মহীশূরে ফেরার পথে ব্রজেন্দ্রনাথ বাঙ্গালোরে নেমে পড়লেন। উদ্দেশ্য গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। গান্ধীজী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি, অত্যন্ত দুর্বল তিনি। বাঙ্গালোরে মহীশূর রাজের অতিথি নিবাসে তিনি তখন অবস্থান করছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে হঠাৎ এসে পড়বেন এ যেন তাঁর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম স্তব্ধতা ভাঙ্গলেন : আপনি যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আপনাকে বিরক্ত করা আমি পছন্দ করিনি। কিন্তু এখন আমার মনে হল যে, আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই হবে।

গান্ধীজী উত্তর করলেন : আমিও ভাবছিলাম যে, আপনার সঙ্গে দেখা করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই আমাকে মহীশূর ত্যাগ করতে হবে কিনা! আপনি এসেছেন দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

দুজনেই চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথের বিনম্রতা বোধ হয় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের গভীরতাকেও অতিক্রম করেছিল। আর দন্তহীন গান্ধীজী তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার সঙ্গে কৌতুহলের সুন্দর সমন্বয় সাধন করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথকে তিনি প্রশ্ন করলেন : স্যার সুরেন্দ্রনাথকে আমি যখন মৃত্যুর আগে দেখেছিলাম তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর। তিনি

একানব্বই বছর বেঁচে থাকার আশা করেছিলেন। আপনি আমাকে কত বছর দেবেন ?

যিনি অমর, অমরতার যিনি আস্বাদ লাভ করেছেন তাঁকে আমি কী দিতে পারি ?—ব্রজেন্দ্রনাথ উত্তর করলেন।

অপূর্ব! দুজনের মধ্যে বিনয়ের অঘোষিত প্রতিযোগিতা ছিল নাকি! নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল কিছুক্ষণ।

ছাত্রের কৌতূহল নিয়ে এবার প্রশ্ন করলেন গান্ধীজী : এই সব অঞ্চলের যুবকদের সঙ্গে বাংলার যুবকদের কী তফাৎ দেখতে পাচ্ছেন ?

ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যকার শিক্ষক এবার জাগ্রত হলেন। এক মুহূর্ত স্থির ভাবে চিন্তা করলেন তিনি। তারপর বললেন : বাংলার যুবকেরা হল ভাবপ্রবণ ও আদর্শবাদী। বলা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে কল্পনামূলক বোধশক্তি অথবা কিছু পরিমাণ সংবেদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত কল্পনাশক্তি। চরিত্রবলের অভাবে আদর্শবাদিতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। অপর পক্ষে দক্ষিণ ভারতের যুবকেরা বেশী ব্যবহারিক। তারা সব কিছু জানতে এবং ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে দক্ষ হতে আগ্রহশীল।

আপনার কি তাই মনে হয় ?—গান্ধীজী বোধ হয় একটু খুঁচিয়ে দিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের চিন্তাকে উৎসারিত করতে।

হ্যাঁ, তার একটা কারণও আছে। বাংলা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অর্থাৎ এখানে এক হাজার বছরেরও বেশী সময় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। বাংলার মানসিকতায় সে তার ছাপ রেখে গিয়েছে। ঔদার্যের প্রতিষ্ঠা এখানে রয়েছে। এই সব অঞ্চলে যে ধরনের অস্পৃশ্যতা অনুসৃত হয় বাংলায় তা দেখা যায় না। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব বাংলার যুবকদের আত্মকেন্দ্রিকও করে দিয়েছে। আমি যা বললাম তা হল সাধারণ প্রকারের কথা। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম হয় এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা আসেন। কিন্তু গড়ে বাংলার যুবকেরা অন্য অঞ্চলের যুবকদের চেয়ে সামান্য নীচে।

ব্রজেন্দ্রনাথ নিজে কোন দলের! না, সন্দেহের অবকাশ তিনি রাখলেন না : আমি যখন সাধারণ যুবকদের কথা বলছি তখন মনে মনে আমি নিজেকেও তার মধ্যে গণ্য করছি। কেন না আমি জানি যে, এই ত্রুটিগুলির

ভোগ আমাকেও ভুগতে হচ্ছে। আর আমি তো মনে করি যে অন্যে আমাকে যতটা জানে তার চেয়ে বেশি আমি জানি।

ব্রজেন্দ্রনাথের এ কথা কি পাঠক মানবেন? মনে হয় না। কিন্তু তিনি বলে চললেন: দক্ষিণ ভারতের যুবকদের সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবল এবং বড় বড় সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা আছে। ঘরেতে তারা অঙ্ক বা আইনের বই নিয়ে বসে থাকে। খানিকটা একগুঁয়েমি ও সাহস তাদের আছে যা অন্যত্র বড় দেখা যায় না। এটা তাদের মধ্যে যুদ্ধং দেহি মনোভাব গড়ে তুলেছে। দেখুন না, দক্ষিণ ভারতের ছাত্রদের ভিন্নমতের বিরোধ করার ধরনটা। না-না-টা তারা অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বলবে। এখানে আমরা যে তীব্র মতানৈক্য দেখি—উদাহরণস্বরূপ বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন শাখায়—তা ওরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

না, গান্ধীজী বোধ হয় একথা মানতে পারেন না। দু'বছর আগে তিনি বাংলা দেশে এসেছিলেন। দূর গ্রামাঞ্চলেও তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলার চমৎকার বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি দেখেছেন। এখানকার ত্রুটিগুলি অবশ্য তাঁর নজর এড়ায়নি। ২৮।৫।২৫ তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় তিনি লিখেছিলেন: "বাংলা দেশের জীবনকে আমি যত দেখছি ততই বিভিন্ন দিকে তার বিশাল সম্ভাবনা উপলব্ধি করছি। বাংলা দেশ বর্তমানকালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকে দিয়েছে। পৃথিবীর মহান বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুজনকে দিয়েছে এই বাংলা দেশ। এদেশে গায়ক আছে। তাদের অতিক্রম করা শক্ত। এখানে চিত্রকর আছে। তাদের শিল্প ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে আছে। আত্মত্যাগেরও এমন ঝুলি এর রয়েছে যার কাছাকাছি এমন কি মহারাষ্ট্রও যেতে পারে না।"

সুতরাং গান্ধীজী জিজ্ঞেস করলেন: আপনি দক্ষিণ ভারতীয়দের সাহসের কথা বলছেন? কিন্তু বাংলার তো মহান ত্যাগ আর সাহস রয়েছে।

আপনি মরণের সাহসের কথা বলছেন?—দার্শনিকপ্রবর পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন প্রশ্নটিকে।

হ্যাঁ।

কিন্তু বাঁচার সাহস কোথায় বাংলা দেশে!

গান্ধীজীর তর্কজাল এবার তাঁর পক্ষে এসে গিয়েছে: আপনার এই অবাধ শ্মশ্রু নিয়ে একথা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ

প্রচণ্ড শক্তির আধার স্যার সুরেন্দ্রনাথ এবং কবি রয়েছেন। কবি তো এই বয়সেও ( কবি রবীন্দ্রনাথ তখন ছেষট্টি ) সতের বছরের যুবকের মত প্রাণ-প্রাচুর্যে ও উৎসাহে নৃত্য করতে পারেন। তা ছাড়া বড়দাদা!

বড়দাদা! কবির ঋষিপ্রতিম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অসীম, তাঁর ব্যবহার ছিল বিনম্র। তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষ। ১৯২২ সালে গান্ধীজী তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—"আমি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন থেকে বড়দাদা-প্রেরিত আধ্যাত্মিক আলোক পেয়ে থাকি। তিনি নিরন্তর আমাকে লক্ষ্য করছেন এবং আমার মিশনের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছেন।" আর দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার গান্ধীজীকে বলেছিলেন, "তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস শুধু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পরেই।"—বড়দাদা ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে নব্বই বছর বয়সে চিরবিশ্রাম লাভ করেন। তখনও তিনি ছিলেন আনন্দে প্রোজ্জ্বল।

বড়দাদার কথা উঠতেই ব্রজেন্দ্রনাথ বুঝি ভুলে গেলেন আলোচনার বিষয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাই বললেন কিছুক্ষণ। তারপর মনে পড়ে গেল আগের কথা। কিন্তু প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন না তিনি: ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁর এত বেশী অভিজ্ঞতা আছে তাঁর কাছে এসব কথা বলবার আমি কে?

যাবার সময় হয়েছে। গান্ধীজী বিছানায় শায়িত। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হল বলে ব্রজেন্দ্রনাথ আবার আনন্দ প্রকাশ করলেন। উঠে পড়লেন তিনি। তার পরেই গান্ধীজীর পদস্পর্শ করে নম্রভরে প্রণাম করলেন।

ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন গান্ধীজী: দোহাই, আমাকে অপদস্থ করবেন না।

তারপরেই তিনি গভীর শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করলেন বয়োবৃদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথকে।

# পরিশিষ্ট—গ

## রামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী সমসাময়িক পুরুষ। চিন্তার দ্বারা এবং কর্মের দ্বারা তাঁরা দুজনেই ভারতবর্ষের পরম্পরাগত সংস্কৃতির ধারাকে উন্নত করেছেন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং গভীর বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল। তবু সমসাময়িক কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের মতান্তর ঘটেছিল কয়েকবার। এমনই ঘটনা ছিল অসহযোগ আন্দোলন এবং চরখার ধারণা নিয়ে। অসহযোগ আন্দোলন এবং চরখার মধ্যে গান্ধীজী যে জনজাগৃতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন সেই জাগৃতি ও ব্যবস্থার মৌল প্রত্যয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শগত বিরোধ তেমন না থাকলেও তিনি এই কর্মপন্থার দ্বারা সংকীর্ণতার বীজ পুষ্ট হবে বলে ভয় করতেন। সেজন্য তিনি এই কর্মপন্থা দুটির প্রতি ছিলেন মনে মনে বিরূপ। প্রকাশ্যেও এর সমালোচনা তিনি যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে করেছিলেন। আর সেজন্য গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে 'গ্রেট সেন্টিনাল' অথবা মহান প্রহরী বলে অভিহিত করেছিলেন। আর গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' নামে অভিষিক্ত করেছিলেন তো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

অবশ্য অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ ধারণা হয়তো প্রথম থেকেই ছিল না। কেন না সুভাষচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একই জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন অসহযোগের আদর্শের বিরোধী বলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর মনে হয়নি। সুভাষচন্দ্রের মনে হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। (পৃঃ ৫৯) সে যাই হোক, অসহযোগ ও চরখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত ছিল স্পষ্ট। এবং তা ছিল গান্ধী-মতের প্রতিকূল।

এ হল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রের কথা। কিন্তু মৌল প্রত্যয়ে কোন ভিন্নতা না থাকা সত্ত্বেও যে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে মতান্তর নয়, ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তা হল রাজা রামমোহনকে নিয়ে। সেজন্য চরখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার উল্লেখ করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যখন একটি বক্তৃতায়

অনুযোগ প্রকাশ করেছিলেন তখন এক দীর্ঘ প্রবন্ধে চরখার প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে রামমোহনের প্রসঙ্গও উত্থাপন করতে ভোলেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তাঁর (গান্ধীজীর) মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপ্যমান দুর্জয় দিব্যশক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক, তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক—এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকাতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড় মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হননি—অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগে মহত্তম লোক বলেই মানি—সেই আভ্যন্তরিক মনঃপ্রকৃতিগত কারণই মহাত্মাজীর কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্য আমার খেদ রয়ে গেল।" (চরখা, কালান্তর)

চরখার এই দীর্ঘ সমালোচনার প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে একটি চিঠি লেখেন। গান্ধীজীও প্রত্যুত্তরে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন 'কবি ও চরখা' শিরোনাম দিয়ে। কবিকৃত চরখার সলালোচনা তাঁকে দুঃখ দেয়নি এর স্পষ্ট উল্লেখ করে গান্ধীজী লিখলেন, "কেবল মতের অমিল আমাকে ক্ষুণ্ণ করবে কেন? প্রত্যেক মতানৈক্যই যদি অসন্তোষ সৃষ্টি করে তবে যেহেতু দুজন মানুষ সমস্ত বিষয়ে ঠিক একমত হতে পারে না সেই হেতু জীবন অপ্রীতিকর ভাবাবেগের সমষ্টি হয়ে উঠবে। আর সেজন্য জীবন হবে এক সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা। পক্ষান্তরে স্পষ্ট সমালোচনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ৫-১১-২৫)

কিন্তু চরখার বিরুদ্ধ যুক্তিজালগুলিতে গান্ধীজী দুঃখবোধ না করলেও রামমোহন সম্পর্কে গান্ধীজী যে কথা বলেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন তাতে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গান্ধীজী ঐ প্রবন্ধে লেখেন, "একটি জিনিস, কেবল একটি জিনিসই আমাকে আঘাত দিয়েছে। তা হল কবি শোনা কথায় বিশ্বাস করেছেন যে, আমি রামমোহন রায়কে 'বামন' মনে করি। কিন্তু আমি কখনো কোথাও এই বিরাট সংস্কারককে বামন বলে অভিহিত করিনি, আর নিজে বামন তো মনে করিই না। কবির কাছে যেমন আমার কাছেও তেমনি

তিনি এক বিরাট পুরুষ। একবার ছাড়া আর কখনও রামমোহনের নাম আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। তা ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসঙ্গে। চার বছর আগে কটকের বেলাভূমিতে এটি হয়েছিল। সেদিন যা আমি বলেছিলাম বলে আজ আমার মনে পড়ে তা হল পাশ্চাত্য শিক্ষা ছাড়াও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি লাভ করা সম্ভব। এবং একজন যখন রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করেন তখন আমি বলেছিলাম যে, উপনিষদের অজ্ঞাত প্রণেতাদের তুলনায় তিনি একজন বামন ছিলেন। এই কথা অবশ্যই রামমোহন রায়কে একজন বামনরূপে দেখা বোঝায় না। আমি যদি বলি মিলটন অথবা সেক্সপীয়রের সামনে টেনিশন হলেন বামন তবে তাতে তাঁকে ছোট করে দেখা হয় না। এতে উভয়েরই মহত্ত্ব উন্নীত করা হল বলে আমি মনে করি। আমি যদি কবিকে ভক্তি করি, আর তিনি জানেন যে, আমাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও আমি তাঁকে ভক্তি করি, তবে যিনি বাংলার বিরাট সংস্কার আন্দোলন সম্ভবপর করে তুলেছিলেন এবং যে-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ ফল হলেন কবি নিজে তাহলে তাঁর মহত্ত্বকে আমি ছোট করতে পারি না।"

কটকে দেওয়া এই বক্তৃতার খবর রবীন্দ্রনাথ কিভাবে শুনেছিলেন তা জানা নেই। কিন্তু কথাটি যেভাবেই তাঁর কানে গিয়ে থাক না কেন তা যে তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই জন্যই চার বছর পরেও অন্য প্রসঙ্গের আলোচনায় কথাটির উল্লেখ তিনি করেছিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তাতে তাঁর ভাবপ্রবণ মনে রামমোহন সম্পর্কিত কোন রকম বিরূপ উক্তি যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড় ঘটনা।

রামমোহন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই নূতন যুগধর্মের উদ্বোধন বহন করে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন…।" ( ভারত-পথিক রামমোহন রায় ) রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন, "রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার

উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানবলোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য, মানুষের পরম সত্য হচ্ছে মানুষ এক, এই সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। রামমোহন আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছিলেন এবং আত্মার যোগে সকল মানুষকে ধর্ম সম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।" (ঐ)

রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই যে প্রত্যয় কর্মক্ষেত্রে গান্ধীজী তো সেই পথেরই পথিক। গান্ধীজীর সাধনা আত্মার যোগে শুধু মানুষে মানুষে নয়, সকল প্রাণীর সঙ্গেও মানুষকে এক করার সাধনা। সেইটিই তাঁর অহিংসা বা প্রেম। গান্ধীজীর এই সাধনাকেও রবীন্দ্রনাথ সঠিক মূল্যে দেখেছিলেন। কিন্তু ভুল বোঝা হয়েছিল রামমোহনের গুণ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তবে গান্ধীজীর লেখা ঐ প্রবন্ধ ভুল বোঝার অবসান ঘটিয়েছিল বলে বিশ্বাস করা যায়। কেন না ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার কয়েক দিন পরে জনৈক ব্রাহ্ম বন্ধু একটি চিঠিতে গান্ধীজীকে লেখেন, "আমি আশা করি এবং আমার বিশ্বাস যে, এখন যখন ভুল বোঝাবুঝি আপনি দূর করে দিয়েছেন তখন ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দেশমাতৃকার পুনরুত্থানের জন্য আপনার প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৯-১১-২৫)

এই চিঠির উল্লেখ করে গান্ধীজী আবার লেখেন যে, তিনি কখনই প্রকৃত অর্থে 'মহান রাজাকে' বামন বলেননি। কথাটি সত্য। গান্ধীজী মধ্যযুগের ধর্মনেতাদের সঙ্গে তুলনা করেই তাঁকে বামন বলেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল এই রকম।

উড়িষ্যার এক জনসভায় গান্ধীজী যখন ইংরেজী শিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করছিলেন তখন এক প্রশ্নকর্তা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, ইংরেজী শিক্ষা কি ভাল-মন্দর মেশানো জিনিস নয়, বিশেষ করে যখন লোকমান্য তিলক, রামমোহন রায় এবং গান্ধীজী নিজে ইংরেজী শিক্ষার উৎপন্ন? উত্তরে গান্ধীজী তাঁর কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কেন না তিনি বামন মাত্র এই উল্লেখ করে বলেন, "ইংরেজী শেখার স্পর্শজনিত সংক্রমণ যদি না থাকত তবে তিলক এবং রামমোহন আরও মহান হতে পারতেন।...আমি ইংরেজী শিক্ষাকে ঘৃণা করি না, তাকে মিথ্যা দেবতার আসনে বসাতেই আমার আপত্তি। আমি যখন সরকারের বিনাশ চাই তখন ইংরেজী ভাষার ধ্বংস আমি চাই না, আমি

চাই একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর যেমন উচিত তেমনি ভাবেই ইংরেজী ভাষা শেখা হোক। আমার কথা বাদ দিন, কিন্তু রামমোহন, তিলক বামন ছিলেন, চৈতন্য, শঙ্কর, কবীর এবং নানকের তুলনায় জনগণের উপর সেরূপ প্রভাব তাঁদের ছিল না। এই বিরাট পুরুষদের সামনে রামমোহন এবং তিলক ছিলেন বামন। শঙ্কর একা যা করেছিলেন সমস্ত ইংরেজী জানা মানুষ এক সঙ্গেও তা করতে পারবে না। আমি উদাহরণ বাড়িয়ে যেতে পারি। গুরুগোবিন্দ কি ইংরেজী শিক্ষা থেকে উৎপন্ন? নানক—যিনি এমন এক ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা যার শৌর্য ও ত্যাগের কাছে কেউ লাগে না—তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন একজনও ইংরেজী জানা লোক কি আছেন? দিলীপ সিংএর মত একজন শহীদও কি রামমোহন সৃষ্টি করতে পেরেছেন? তিলক এবং রামমোহনকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, রামমোহন এবং তিলক যদি এ শিক্ষা না পেতেন, বরং স্বাভাবিক শিক্ষা লাভ করতেন তবে তাঁরা চৈতন্যের মত আরও বড় কাজ করতে পারতেন।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৩-৮-২১)

কিছু দিন পরে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে বললে গান্ধীজী এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে আবার বলেন, "রামমোহন রায় আরও বড় সংস্কারক এবং লোকমান্য তিলক আরও বড় পণ্ডিত হতে পারতেন যদি না তাঁদের ইংরেজীতে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাগুলিকে প্রধানত ইংরেজীতে পরিবেশন করার অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করতে হত। নিজেদের লোকদের উপর তাঁদের প্রভাব বিস্ময়কর হলেও তা আরও মহান হতে পারত যদি তাঁরা কম অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করতে পারতেন।…আমি বিশ্বাস করি যে, চৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিং, শিবাজী এবং প্রতাপ —রামমোহন রায় ও তিলকের চেয়ে মহত্তর ছিলেন। আমি জানি যে তুলনাগুলি বিরক্তির জিনিস। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্থানে বড়। কিন্তু ফল দেখে বিচার করলে দেখা যায় যে, জনগণের উপর রামমোহন রায় এবং তিলকের কাজের ফল, যাঁরা বেশী সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলেন তাঁদের কাজের ফলের মত স্থায়ী বা দূরপ্রসারী নয়। যে বাধা তাঁদের অতিক্রম করতে হয়েছিল সেই দিক থেকে বিচার করলে তাঁরা বিরাট পুরুষ এবং ফললাভে তাঁরা আরও বড় হতে পারতেন যদি যে পদ্ধতিতে তাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন তার দ্বারা তাঁরা বাধাগ্রস্ত না হতেন।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৭-৪-২১)

এই দুটি প্রবন্ধে এবং ভুল বোঝার অবসানকল্পে লিখিত প্রবন্ধে গান্ধীজী রামমোহন সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যাত করেছিলেন। কোথাও তাঁকে ছোট করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। রামমোহনের কর্মক্ষমতার প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথাই তাতে ব্যক্ত হয়েছে। রামমোহনের মহত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করেননি, তাঁর আরও মহৎ না হবার অসুবিধার কথাগুলিরই তিনি শুধু উল্লেখ করেছিলেন। পক্ষান্তরে কী হতে পারতেন এবং কী করতে পারেননি, রামমোহন সম্পর্কে সে বিচার রবীন্দ্রনাথ করেননি। তিনি যা করেছেন তার প্রতিই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ প্রত্যয়: "Rammohon Roy inaugurated the Modern Age in India"—রামমোহন রায় ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের উদ্ঘাটন করেছিলেন।

# তথ্যপঞ্জী

১। Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XIV p. 121
২। Young India, 22. 12. 20
৩। Mahatma—D. G. Tendulkar, Vol. II p. 242
৫ Ibid, Vol VII p. 285
৫। Gandhiji's Autobiography, p. 130
৬। .bid, p. 169
৭। Ibi.l, p. 171
৮। Ibid, p. 171-2
৯। Young India, 20. 12. 28
১০। Stray Glimpses of Bapu-Kakakalelkar, 120-1
১১। Autobiography p. 285
১২। Stray Glimpses of Bapu, p. 25
১৩। Indian Opinion, 28. 10. 05. ( Collected Works, Vol. V p. 114 )
১৪। Young India, 19. 1. 12
১৫। Ibid, 26. 1. 21
১৬। Ibid, 2. 2. 21
১৭। Idid, 2. 2. 21
১৮। Navajivan, 11. 9. 21 ( Collected Works Vol. XXI p. 90-91
১৯। Amrita Bazar Patrika 15, 9. 21 ( Ibid p. 97 )
২০। Young India 22. 9. 21 ( Ibid p. 161-63 )
২১। Ibid 15. 12. 21 ( Ibid Vol. XXII p. 9 )
২২। Ibid 15. 12. 21 ( Ibid p. 82 )
২৩। Ibid 26. 1. 22
২৪। Ibid 2. 2. 22
২৫। Ibid 23. 4. 25
২৬। Idid 14. 5. 25
২৭। Ibid 28 5. 25
২৮। Ibid 28. 5. 25

২৯। Ibid 4. 6. 25
৩০। Ibid 4. 6. 25
৩১। Ibid 30. 8. 28
৩২। Ibid 24. 4. 30
৩৩। Ibid 11. 6. 31
৩৪। Ibid 6. 8. 31
৩৫। Ibid 17. 12. 31
৩৬। Ibid 24. 12. 31
৩৭। Harijan 7. 4. 46
৩৮। Idid 1. 12. 46
৩৯। Mahatma, Vol. VI p. 285
৪০। Young India 30. 1. 30
৪১। Idid 22. 4. 26
৪২। Harijan 27. 11. 37
৪৩। Ibid 24. 6. 39
৪৪। Ibid 3. 7. 39
৪৫। Ibid 22. 7. 39
৪৬। Ibid 5. 8. 39
৪৭। Idid 12. 8. 39
৪৮। Ibid 19. 4. 42
৪৯। Young India 17. 4. 30
৫০। Ibid 3. 9. 25
৫১। Ibid 2. 2. 22
৫২। Ibid 9. 3. 22
৫৩। Ibid 21. 8. 24
৫৪। Ibid 15. 1. 25
৫৫। Ibid 14. 5. 25
৫৬। Ibid 28. 5. 25
৫৭। Ibid 4. 6. 25
৫৮। Ibid 4. 6. 25
৫৯। Ibid 4. 6. 25
৬০। Ibid 2. 7. 25
৬১। Ibid 10. 12. 25
৬২। Ibid 22. 4. 26
৬৩। Ibid 16. 12. 26

৬৪। Ibid 30. 12. 26
৬৫। Idid 27. 9. 28
৬৬। Ibid 10. 3. 27
৬৭। Ibid 1. 4. 26
৬৮। Ibid 6. 1. 27
৬৯। Harijan 2. 8. 42
৭০। Mahatma Vol. II p. 243
৭১। Harijan 5. 10. 35
৭২। Homage To The Departed p. 85
৭৩। Indian Opinion 19. 11. 03 (Collected Works Vol. IV p. 51
৭৪। Ibid 3. 6. 05 ( Ibid p. 456 )
৭৫। Ibid I6. 9. 05 ( Collected Works Vol. V p. 62-68 )
৭৬। Ibid 25. 8.06 ( Ibid p. 398 )
৭৭। Navajivan 29. 2. 20 ( Ibid Vol. XVII p. 62-63 )
৭৮। The Hindu 16. 3. 21 ( Ibid Vol. XIX p. 436-7 )
৭৯। Young India 22. 9. 21 ( Ibid Vol. XXI p. 168 )
৮০। Amrita Bazar Patrika 14. 1. 22 ( Ibid XXII p. 112-13 )
৮১। Young India 14. 5. 25
৮২। Ibid 13. 8 .25
৮৩। Ibid 12. 1. 22 (Collected Works Vol. XXII p. 169-70)
৮৪। Ibid 9. 3. 22
৮৫। Ibid 21. 2. 26
৮৬। Ibid 31. 11. 24
৮৭। Ibid 15. 1. 25
৮৮। Ibid 14. 5. 25
৮৯। Ibid 18. 6. 25
৯০। Ibid 18. 6. 25
৯১। Ibid 25. 6. 25
৯২। Ibid 25. 6. 25
৯৩। Homage To The Departed p. 25-26
৯৪। Young India 2. 7. 25
৯৫। Ibid 16. 7. 25
৯৬। Ibid 17. 6. 25

৯৭। Ibid 20. 1. 27
৯৮। Ibid 4. 6. 25
৯৯। Harijan 12. 10. 35
১০০। Ibid 2. 11. 35
১০১। Young India 9. 7. 25
১০২। Ibid 26. 11. 22
১০৩। Ibid 28. 1. 26
১০৪। Young India 17. 2. 27
১০৫। Ibid 8. 3. 28
১০৬। Ibid 1. 11. 28
১০৭। Ibid 16. 1. 29
১০৮। Ibid 15. 8. 29
১০৯। Ibid 29. 8. 29
১১০। Harijan 13. 4. 35
১১১। মহাদেব ভাই-এর ডায়রী ( হিন্দী ) ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৩৫
১১২। Harijan 3. 8. 35
১১৩। Mahatma Vol. IV p. 110-11
১১৪। Harijan 2. 4. 38
১১৫। Ibid 1. 3. 42
১১৬। Ibid 28. 6. 42
১১৭। Ibid 14. 9. 47
১১৮। Navajivan 28. 3. 20 ( Collected Works Vol. XVII p. 294 )
১১৯। Ibid 11. 7. 20 ( Ibid Vol. XVIII p. 34-35 )
১২০। Young India 1. 6. 21
১২১। Idid 22. 9. 21 ( Collected Works Vol. XXI p. 165-6 )
১২২। Ibid 9. 2. 22
১২৩। Ibid 5. 11. 25
১২৪। Ibid 11. 3. 26
১২৫। Ibid 6. 2. 30
১২৬। Harijan 9. 3. 40
১২৭। Ibid 2. 3. 40
১২৮। Ibid 24. 5. 42
১২৯। Ibid 19. 5. 46 ( Mahatma Vol. VII p. 111
১৩০। Young India 26. 5. 27

১৩১। Harijan 27. 5. 39
১৩২। Mahatma Vol. V p. 159
১৩৩। Ibid p. 229-230
১৩৪। Harijan 17. 4. 40
১৩৫। Ibid 26. 7. 42
১৩৬। Ibid 2. 8. 42
১৩৭। Ibid 21. 2. 46
১৩৮। Ibid 7. 4. 46
১৩৯। Ibid 7. 4. 46
১৪০। Ibid 14. 4. 46
১৪১। Ibid 9. 6. 46
১৪২। Ibid 9. 2. 47
১৪৩। Indian Opinion 2. 12. 05 ( Collected Works Vol. IV p. 156)
১৪৪। Collected Works Vol. XIX p. 121
১৪৫। Young India 8. 9. 20
১৪৬। Mahatma Vol. V p. 141
১৪৭। Collected Works Vol XIV. p. 10
১৪৮। Mahatma Vol. IV 149
১৪৯। Young India 27. 8. 25
১৫০। From a letter 16. 1. 28 (Collected Works Vol. XIV p. 153 )
১৫১। Young India 2. 4. 25
১৫২। Ibid 16. 4. 25
১৫৩। Navajivan 11. 9. 21 ( Collected Works Vol. XXI p. 92-5 )
১৫৪। Young India 15. 9. 21 ( Ibid p. 104-05 )
১৫৫। Ibid 17. 11. 21 ( Ibid p. 440-1 )
১৫৬। Ibid 28. 5. 25
১৫৭। Ibid 19. 1. 22
১৫৮। Ibid 17. 7. 29
১৫৯। Ibid 5. 2. 29
১৬০। Harijan 9. 3. 40
১৬১। Young India 16. 7. 25
১৬২। Ibid 20. 8. 25
১৬৩। Harijan 17. 2. 46
১৬৪। Collected Works Vol. XXII p. 52